প্র ম থ চৌ ধু রী

অগ্রন্থিত রচনা

প্র ম থ চৌ ধু রী

অগ্রন্থিত রচনা

ম ন ফ কি রা
www.monfakira.com

প্র ম থ চৌ ধু রী

অগ্রন্থিত রচনা

সংকলন ও সম্পাদনা। মলয়েন্দু দিন্দা

প্রথম প্রকাশ। জানুয়ারি ২০০০

প্রকাশক। মনফকিরা-র পক্ষে সন্দীপন ভট্টাচার্য
মন্দিরপাড়া, জগাছা, হাওড়া ৭১১ ১১১
বইপাড়ায় ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন (০৩৩) ২৪২৬ ০৯২৮/৯১ ৯৪৩৩৩ ০১০৭৯/
৯১ ৯৪৩৩৪ ১২৬৮২/ ৯১ ৯৪৩৩১ ২৮৫৫৫
ই-মেল। monfakirabooks@yahoo.co.in/ monfakirabooks@gmail.com
ওয়েবসাইট। www.monfakira com

প্রাক্‌মুদ্রণ কারিগরি। মাইন্ডস্কেপ
১/৮ নবোদিত, নয়াবাদ, ডাক মুকুন্দপুর, কলকাতা ৭০০ ০৯৯
মুদ্রণ। জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড,
কলকাতা ৭০০ ০০৯, ফোন (০৩৩) ২৩৫১ ৪৩৭৮

সূচি

ভূ মি কা

প্রমথ চৌধুরী (৭ আগস্ট ১৮৬৮-২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬) বাংলা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট নাম। কিন্তু এখনকার গড়পড়তা শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে ক-জন তাঁর নাম জানে, তাদের কাছে প্রমথ চৌধুরীর পরিচয়টাই বা কী? মনে হয়, সাধারণ বাঙালির কাছে প্রমথ চৌধুরীর পরিচয় মূলত তিনটি : এক, বীরবল তাঁর ছদ্মনাম; দুই, তিনি 'সবুজ পত্র'-র সম্পাদক তিন, তিনিই প্রথম চলিত গদ্যর হয়ে জোরালো সওয়াল করেন ও রবীন্দ্রনাথকে সাধু কোড ছেড়ে চলিত কোড-এ সব ধরনের লেখা লিখতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু এর বাইরে তাঁর আরও বড় পরিচয় হল : তিনি একই সঙ্গে কবি (বিশেষত সনেট-কার), ছোটগল্পকার, পত্রলেখক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর মতো বাক্‌চতুর ও রীতিকুশল গদ্যশিল্পী বাংলা সাহিত্যে খুব কমই আছেন। সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গনে তাঁর অবদান বাঙালিরা ভুলে গেলেও প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরীকে তারা ভুলতে পারবে না, কারণ ভোলার যোগ্য তিনি নন।

সাহিত্যিক হিশেবে বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রমথ চৌধুরীর আসন বেশ উঁচুতে। রবীন্দ্রনাথও তাঁকে বঙ্গসাহিত্যের চালকের আসনে দেখতে চেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও বাঙালির কাছে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা তিনি পাননি— না তাঁর জীবদ্দশায়, না তাঁর মৃত্যুর পরে। এ জন্য অবশ্য এখনকার পাঠককে শুধু দোষ দেওয়া যায় না। প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর 'কবিতা'য় বুদ্ধদেব বসু যে-সম্পাদকীয় লেখেন, তাতে তিনি বলেন : ...এই অসামান্য প্রতিভার প্রতি বাঙালি সমাজের দায়িত্ববোধ জেগে ওঠেনি; তাঁর গ্রন্থরাজি বিলুপ্তির প্রান্তে পৌঁছতে পেরেছে, কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা অধ্যাপকের পদপ্রার্থী হয়েও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, এবং ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনতিপরে তাঁর সম্বর্ধনা নিরুৎসুক পাংশুতার উদাহরণরূপেই স্মরণীয়। সেই সম্পাদকীয়তে তিনি আরও যোগ করেন : "প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যুতে সমস্ত বাঙলাদেশ যে আজ নির্বিকার, যে বাস্তবের বিবেচনায় এটা বিস্ময়কর নয়, সেই বাস্তবই আমাদের অধঃপাতের পরিমাপ।" অধঃপতনের সেই রেশ এখনও সমান ভাবে অব্যাহত। কী বাঙলার পাঠকসমাজ, কী বাঙলার প্রকাশক কিংবা বাংলার বিদ্বজ্জন, তাঁর প্রতি সমান উদাসীন। সেই জন্যই বোধ হয় তাঁর মৃত্যুর ষাট বছর পরেও তাঁর রচনা-সমগ্র প্রকাশের কোন উদ্যোগ নেওয়া হল না— না সরকারি ভাবে, না বেসরকারি ভাবে। জীবদ্দশায় লেখক নিজে কমপক্ষে ছোট-বড় তিরিশ-বত্রিশটি বই ছেপে বের করেছিলেন।

তার অধিকাংশই এখন আর পাওয়া যায় না। বিশ্বভারতী তাঁর একটি 'প্রবন্ধসংগ্রহ' (দুটি খণ্ডে) ও একটি 'গল্পসংগ্রহ' বের করেছে। গল্পসংগ্রহটির মধ্যে তাঁর বেশির ভাগ গল্প স্থান পেলেও প্রবন্ধসংগ্রহে অন্তর্ভূত হয়েছে মাত্র গোটা-পঞ্চাশেক নির্বাচিত প্রবন্ধ। এর বাইরে যে তাঁর কত প্রবন্ধ/নিবন্ধ, রাজনৈতিক ভাষ্য, টীকা-টিপ্পনী রয়ে গেছে, তার কোন হদিশ নেই। প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলির একটি বসুমতী সংস্করণও বেরিয়েছিল। সমস্যা হল : এটি কয়েকটি মাত্র কবিতা, মোটে আটটি গল্প ও বাছা-বাছা কিছু প্রবন্ধের সমাহার মাত্র, যা প্রমথ চৌধুরীর রচনার বিশাল ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যর কোন সঠিক ধারণা আজকের পাঠকের কাছে তুলে ধরে না।

প্রমথ চৌধুরী জীবনভর বিদ্যাচর্চা করে গেছেন ও সেই সঙ্গে নানান ছোট-বড় মাঝারি পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ও পত্র (বীরবলের পত্র) লিখে গেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু-কিছু লেখা তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সংকলনের বাইরেও রয়ে গেছে অসংখ্য প্রবন্ধ, যা তৎকালীন পত্র-পত্রিকার ভিতর খুঁজলে পাওয়া যাবে। কালের নিয়মে পত্রিকাগুলিও হয়ে গেছে জীর্ণ ও কীটদষ্ট। সেকালের অনেক পত্রিকা এখনকার সাধারণ পাঠক, এমনকী গবেষকদেরও নাগালের বাইরে। অর্থাৎ সেগুলি এখন দুর্লভ। এই দুর্লভ পত্রিকা— এখনও পর্যন্ত যা বাংলার বিভিন্ন লাইব্রেরিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে— সে সব থেকে প্রমথ চৌধুরীর লেখাগুলিকে চয়ন না-করলে হয়তো সেগুলি চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে।

এ নিয়ে হালে 'অনুষ্টুপ' (শারদীয় ১৪১০)-এ একটি প্রবন্ধ লেখেন আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই ড. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। প্রবন্ধটির নাম : "প্রমথ চৌধুরী, চলিত গদ্য আর রাজনীতি।" এই প্রবন্ধেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে-থাকা প্রমথ চৌধুরীর লেখাগুলি এখনও পর্যন্ত জড়ো না-করার জন্য সখেদে তিনি বলেন, "ভয় হয়ঃ শেষে সব হারিয়ে না যায়!" রামকৃষ্ণবাবুর লেখার একটি বৈশিষ্ট্য হল : তিনি যে-বিষয়েই লিখুন না কেন, সেই বিষয়ে পাঠকের ঔৎসুক্য বাড়িয়ে দেন আর তার সঙ্গে-সঙ্গে ভবিষ্যতে সে বিষয়ে আর কী করা যায়, হদিশ দেন তারও। 'অনুষ্টুপ'-এ লেখা তাঁর প্রবন্ধটি পড়েই আমি প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে যুগপৎ উৎসুক ও উৎসাহী হই, আর তাঁর অগ্রন্থিত লেখাপত্রগুলি সংগ্রহ করার নেশায় মেতে উঠি। কাজে নেমেই অন্য একটি কঠিন সমস্যার সামনে পড়ি। তা হচ্ছে, বাংলার পত্র-পত্রিকা নিয়ে কাজ করার সমস্যা। প্রথম এবং প্রধান সমস্যা হল, কোন্ পত্রিকার কোন্ সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরীর লেখাগুলি বেরিয়েছিল, তার হদিশ করা। এখানে জানিয়ে রাখি, এ ব্যাপারে শ্রীঅশোক উপাধ্যায় আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া এ কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। লেখার হদিশ যদিও বা জানা গেল, তারপর এল অনুলিখনের সমস্যা। অধিকাংশ লাইব্রেরি লেখাগুলির ফটোকপি করতে দেয় না বা কোন-কোন লেখা ফটোকপি করার মতো অবস্থাতেও নেই। অনেক ক্ষেত্রে আবার পত্রিকার পাতাগুলি ল্যামিনেশন করা, যে-কারণে সেখান থেকে কোন ভাবেই

ফটোকপি করা যায় না। এ ক্ষেত্রে সমাধান হল, ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তোলা বা নিজের হাতে লেখা। কিন্তু পাঁচ-ছয় বছর আগে যখন এই সংগ্রহের কাজ শুরু করি, তখন ডিজিটাল ক্যামেরার নামগন্ধ ছিল না। সুতরাং একটিই পথ খোলা ছিল, তা হচ্ছে : নিজের হাতে কপি করা। এর পর এল আরও বড় এক সমস্যা। প্রবন্ধ জোগাড় তো হল, কিন্তু ছাপাবে কে? পাবলিশার পাই কোথায়? দু-একটি বড় হৌসে আপিল যে করিনি তা নয়, কিন্তু সেই আপিল হৌসের কর্মকর্তাদের কান অব্দি পৌঁছয়নি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ষাট বছর পরে যখন তাঁর লেখার কপিরাইট উঠে যেতে প্রকাশকদের মধ্যে যে-উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল, তার ছিটে-ফোঁটা উত্তেজনাও দেখা যায়নি প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রে। ২০০৬-এর সেপ্টেম্বরে প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যুর ষাট বছর পূর্ণ হয়। এ সময়ে প্রমথ চৌধুরীর অসংকলিত বা অগ্রন্থিত লেখাগুলিকে একত্র করার উদ্যোগ কারও মধ্যেই দেখা যায়নি— না কোন ব্যক্তি বা সরকার, না কোন প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়। এ সময়ে আলাপ হল 'মনফকিরা' প্রকাশন সংস্থার শ্রীসন্দীপন ভট্টাচার্যর সঙ্গে। কথা বলে বুঝলুম, প্রমথ চৌধুরীর রচনা সংকলনের ব্যাপারে তাঁরা উৎসাহী। প্রমথ চৌধুরীর 'আত্মকথা' ও ঘরে বাইরে' তাঁরা নতুন করে এর মধ্যে প্রকাশ করেছেন ও তাঁর অন্যান্য লেখাও প্রকাশ করতে তাঁরা রাজি। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর অসংকলিত বা অগ্রন্থিত লেখার পরিমাণ এত বিপুল যে তা একটি খণ্ডে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই ঠিক হল প্রমথ চৌধুরীর লেখাগুলি 'অগ্রন্থিত রচনা' নামে একটি সিরিজ আকারে প্রকাশ করা হবে। এ বার প্রকাশিত হচ্ছে প্রথম খণ্ডটি। এখানে আছে শুধু প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলির মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট বিষয়বৈচিত্র্য। বিষয়গুলি হল : বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ভারতবিদ্যা, ভাষা ও ব্যাকরণ এবং শেষে দর্শন। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও গদ্যশৈলী নিয়ে এখানে আর কোন মন্তব্য করছি না, কারণ প্রথমত, পুঁথি বেড়ে যাবে; দ্বিতীয়ত, আরও অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করা বাকি। পাঠক প্রবন্ধগুলি পড়ে নিজেরাই প্রমথ চৌধুরীর মূল্যায়ন করবেন। নির্বাচিত প্রবন্ধগুলি (কেবল একটি ছাড়া) লেখকের জীবদ্দশায় অন্য কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। হালে দেখলুম, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে যে-পত্রবিতর্ক হয় তা 'পত্রাবলী' নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়, সেখানে 'ফ্রান্সের নব মনোভাব' প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়া 'বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' নাম দিয়ে প্রমথ চৌধুরীর দু-কিস্তির বক্তৃতাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৪-এ পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে। সেটিও এখন আর পাওয়া যায় না। প্রবন্ধগুলি নানা সময়ে লেখা। তাই লেখাগুলিকে বিষয় ধরে প্রকাশের সময় অনুযায়ী, ইংরেজিতে যাকে বলে chronological order-এ সাজানো হয়েছে। প্রবন্ধগুলি প্রমথ চৌধুরী স্বনামে ও ছদ্মনামে লিখেছেন। শুধু যে-প্রবন্ধগুলি ছদ্মনামে লেখা, তা পরে রচনানির্দেশ ও টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর রচনার আস্বাদ, ইংরেজিতে যাকে বলে flavour অটুট রাখার যথাযথ চেষ্টা করা হয়েছে। লেখকের বানান ইত্যাদির বিশেষ পরিবর্তন করা হয়নি, আর যদি বা

পরিবর্তন করা হয়ে থাকে, তা হয়েছে ন্যূনতম। রেফের দ্বিত্ব নিঃশব্দে তুলে দেওয়া হয়েছে। নানা সময়ে লেখার ফলে লেখকের বানানে অনেক রকমফের দেখা যায়। তা ছাড়া যে-সব পত্র-পত্রিকায় লেখাগুলি বেরোয় তাদের সম্পাদনার চিহ্নও পড়েছে বানানের ওপর। তাই এই সংকলনে বানানের সমতা রাখা যায়নি। যেমন 'য়ুরোপীয়'/ 'ইউরোপীয়', 'বাঙ্গালা'/ 'বাঙ্গলা'/ 'বাঙলা'/ 'বাংলা'— এর তেমন কোন পরিবর্তন করা হয়নি, কারণ প্রমথ চৌধুরীর জীবদ্দশায় বাংলা বানানের যে-বিবর্তন ঘটেছে তার নিদর্শন এ সব। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে শব্দার্থের অস্পষ্টতার জন্য দু-একটি শব্দ বা পদবিন্যাস যোগ করা হয়েছে, সেগুলি তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে সম্ভাব্য পাঠ হিশেবে দেওয়া হয়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য যতিচিহ্নের বেশ কিছু পরিবর্তন অবশ্য করা হয়েছে।

বইটি প্রকাশের কাজে অনেকের সাহায্য পেয়েছি, শ্রীসন্দীপন ভট্টাচার্য-এর নাম উল্লেখ না-করলেই নয়। আগেই বলেছি যে, বইটি প্রকাশের ব্যাপারে বরাবর উৎসাহ দিয়েছেন ড. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। সম্পাদনা, শব্দার্থ ও টীকা লিখতেও তাঁর সাহায্য পেয়েছি। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, চন্দননগর পুস্তকাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার ও চৈতন্য লাইব্রেরির কর্মচারীদের, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। বইটি প্রকাশের কাজে আগাগোড়া সাহায্য করেছেন 'মনফকিরা'র আরও দুই সহযোগী বন্ধু, শ্রীশুভাশিস মণ্ডল ও শ্রীচিত্রভানু চক্রবর্তী। প্রমথ চৌধুরীর অগ্রন্থিত লেখাগুলি যে দু-মলাটের মধ্যে এল, তার জন্য মনফকিরা-র সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাই। পাঠক বইটি পড়লে ও অন্যদের পড়ালে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়। প্রমথ চৌধুরীর কাছে বাঙালি তথা বাংলা সাহিত্যের অনেক ঋণ জমে আছে। এই সংকলন প্রকাশ করে সে ঋণের কিছুটা হলেও শোধ করা যাবে— এই আশা রাখি।

অগ্রন্থিত রচনা

র বী ন্দ্র না থে র সা হি ত্য

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট গদ্য সাহিত্যের সমালোচনার ভার আমার হস্তে ন্যস্ত করায় আপনি একটু অন্যমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত সমালোচক বাঙলাদেশে আর যিনিই হউন, বীরবল কখনও হতে পারেন না।

প্রথমেই একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে নিই। যে-ভাষায় আমি লিখি, অনেকে তার নাম দিয়েছেন বীরবলী ভাষা। বলা বাহুল্য, কিন্তু বলা আবশ্যক যে 'বীরবলী ভাষা' নামক কোন সৃষ্টিছাড়া ভাষা নেই। যে-ভাষায় আর-পাঁচ জন লেখেন, সেই ভাষাতেই আমি লিখি, এবং সে ভাষার নাম হচ্ছে বাঙলা ভাষা। অবশ্য আমার ভাষার সঙ্গে অপরের ভাষার অল্পবিস্তর প্রভেদ আছে। সে কারণ যদি আমার ভাষার পৃথক নামকরণ করতে হয়, তা হলে কোন ভাষাকেই আর বাঙলা ভাষা বলা চলে না। লেখার কথা ছেড়ে দিন, যদি মন দিয়ে পাঁচ জন বাঙালির মুখের কথা শোনেন, তা হলে স্পষ্ট দেখতে পাবেন যে এক জন বাঙালির মুখের ভাষা আর-এক জন বাঙালির মুখের ভাষা যমজ নয়। তা সত্ত্বেও বাঙলা ভাষা বলে একটা ভাষা আছে, যেমন দুটি বাঙালির চেহারা ঠিক এক নয়, তা সত্ত্বেও বাঙালি জাতি বলে একটা জাতি আছে।

কেন যে আমার ভাষাকে লোকে বীরবলী ভাষা বলে, তা আমি সম্পূর্ণ জানি। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা একটা নাম না পেলে কোন জিনিসই বুঝতে পারে না। বোঝা তো মাথায় থাক, চিনতেও পারে না। এই শ্রেণীর লোকেরাই সব নতুন জিনিসের নূতন নামকরণ করতে সদাই ব্যস্ত। আর এই নামকরণের ব্যবসা যে সমাজে চলে, তার কারণ ছোট ছেলেরা যেমন চুষিকাঠি পেলে খুশি হয়, লোকসমাজও তেমনি 'নাম' পেলেই খুশি হয়। ঐ নাম চুষেই তারা সাহিত্যরস আস্বাদন করে। ইতিহাসের কাছে জানা যায় যে, কালের গতিকে মানুষের আর যে-ব্যবসাই থাক আর যাক, খেলনার ব্যবসা কখনও যায়নি ও কখনও যাবে না। যা চিরকাল আছে, তা নিশ্চয়ই চিরকাল থাকবে। কাশীর বৌদ্ধধর্ম গত হয়েছে, কিন্তু কাশীর খেলনা আজও বাজারে সমান কাটছে।

আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্র দুটি কথার উপর গড়ে উঠেছে। সে দুটি কথা হচ্ছে 'নাম' ও 'রূপ'। সংস্কৃত ভাষার ও-দুটি শব্দের যা-ই মানে হোক না কেন, বাঙলা ভাষার ও দু-কথার মানে স্পষ্ট। 'নাম' হচ্ছে যা কানে শোনা যায়, আর 'রূপ' হচ্ছে যা চোখে দেখা যায়। এই চক্ষু-কর্ণের বিবাদের নামই হচ্ছে দর্শন-শাস্ত্রের বিচার। আর এ বিবাদ যে কত কাল ধরে কত সরবে চলেছিল। তার পরিচয় যাঁরা নিতে চান, তাঁরা সর্বাস্তিবাদ থেকে শুরু করে সর্বনাস্তিবাদ পর্যন্ত আদ্যোপান্ত দর্শনশাস্ত্র একাগ্রচিত্তে আলোচনা করুন। তারপর তাঁরা দেখতে পাবেন যে তাঁরা গোড়ায় যেখানে ছিলেন, শেষেও সেইখানে আছেন, লাভের মধ্যে এ দীর্ঘ আলোচনার ফলে তাঁদের মাথার কালো চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। এ বিবাদ যে কস্মিনকালে মেটেনি, তার কারণ তা মিটতে পারে না। 'নাম' ও 'রূপ' জিনিস-দুটি শুধু বিভিন্ন নয়, পরস্পর পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী। যাঁরা 'নাম' শুনেই নিশ্চিন্ত হন, তাঁরা 'রূপ' কখনও চোখে দেখতে পান না, কেননা দেখতে চান না। অপর পক্ষে রূপ যাদের চোখে পড়ে না, তাঁরাই হন নামভক্ত। আমার এ মত যদি ঠিক হয়, তা হলে আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে, বীরবলী ভাষা বলে কোন ভাষা নেই, কিন্তু বীরবলী ঢং বলে একটা জিনিস আছে। আমার লেখার যে-গুণে পাঠকরা সে লেখার প্রতি অনুরক্ত ও বিরক্ত— সে গুণ হচ্ছে তার রূপ। ইংরাজি ভাষায় তার নাম হচ্ছে manner অথবা mannerism। আমার কথার ভিতর আর যে-রসই থাক, একটি রস নেই, এবং সে রসের নাম ভক্তিরস। এখন জিজ্ঞাসা করি, যে-লেখকের বাণীকে আমি সকল মন দিয়ে ভক্তি করি— অর্থাৎ যাঁর প্রতিভার প্রতি আমার পরাপ্রীতি আছে,— তাঁর কাব্যের সমালোচনা কি বীরবলী ভঙ্গিতে করা সঙ্গত, না সম্ভব? আর বীরবলী ঢং বাদ দিয়ে বীরবলের লেখার কী সার্থকতা! এ কার্যের ভার আপনার দেওয়া উচিত ছিল আমার alter ego প্রমথ চৌধুরীর উপর। কেননা কোন খ্যাতনামা বঙ্গ-সাহিত্যিক তাঁকে 'রবিকুল ধুরন্ধর', এই উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

কিন্তু তিনিও এ কার্যে ব্রতী হতে সাহসী হতেন কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তাঁর হাতে একখানা পুরনো দলিল আছে, যার থেকে তিনি মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করবার অধিকার তাঁর কোন অনুরক্ত ভক্তের নেই। বত্রিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জনৈক বন্ধুকে লেখেন যে— "আপনার সমালোচনার কথাটা শুনে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে। 'সংক্ষিপ্ত' সমালোচনার একটা ডেফিনিশন তৈরি করেছি,— যে সমালোচনা সম্যক্‌রূপে ক্ষিপ্ত হলে গ্রন্থকারকে সম্যক্‌রূপে ক্ষিপ্ত করে তোলে, তাকেই বলে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।"

রবীন্দ্রনাথের কোন অনুরক্ত ভক্ত যদি তাঁর কাব্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করতে

উদ্যত হন তা হলে উপরোক্ত কথা কটি শুনলে তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হয় কি না, বলুন তো?

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ও-কথা কটি রসিকতাচ্ছলে বলেছেন। কিন্তু রসিকতার ভিতর যে সত্য কথা থাকতে পারে না, এমন কথা আর যার মুখ দিয়েই বেরুক, আমার মুখ দিয়ে কখনও বেরুবে না।

একবার ভেবে দেখুন তো, রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্য বলতে কী বোঝায়? সাহিত্যের কোন বিশেষ অংশ নয়, সমগ্র সাহিত্য তাঁর গদ্যের দখলে রয়েছে। নাটক, নভেল, প্রহসন, ছোটগল্প, জীবনচরিত, ভ্রমণবৃত্তান্ত, খেয়াল সাহিত্য, সমালোচনা, ধর্মনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ তাঁর হাত দিয়ে আজীবন অনর্গল বেরিয়েছে, এমনকী prosody, philology-ও তাঁর হাত এড়িয়ে যায়নি। আর তাঁর প্রতিভা যে-বস্তুকেই স্পর্শ করেছে, তাকেই জীবন্ত করেছে। আমি যখন রবীন্দ্রনাথের এই জগৎজোড়া মনের কথা ভাবি, তখন Faust-এর কথা চুরি করে বলতে ইচ্ছা যায়— 'Infinite Nature, where shall I grasp thee.'

শুনতে পাই যে চীন দেশীয় লেখকেরা একটি পত্রকে একটি ছত্রে, এবং একটি ছত্রকে একটি পদে সংহত করবার কৌশল জানেন। বাঙলা দেশের লেখকদের রচনারীতি ঠিক এর বিপরীত। একটুখানি কথাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে যিনি যত বড় করতে পারেন, তিনি তত বড় লেখক। তাই শকুন্তলা-তত্ত্ব ওজনে শকুন্তলার চাইতে দশ গুণ ভারি— আর সে তত্ত্বের লেখকও সাহিত্যিক হিসেবে মহা ভারিক্কে বলে গণ্য। আমার অবশ্য অন্তরে ততটা সাহিত্যিক গ্যাস নেই, যার কৃপায় মনোজগতে ওরূপ বেলুন ওড়াতে পারি। অপর পক্ষে, কী আমার, কী প্রমথ চৌধুরীর, রচনারীতির চৈনিক হিক্‌মতও জানা নেই। ফলে রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আমাদেরও কারও কলম থেকে বেরুবে না।

আপনি যে আমার স্কন্ধে উক্ত ভার ভুল করে চাপিয়েছেন, সে কথাটা বোধ হয় এত ক্ষণে বুঝতে পেরেছেন। এ ভুল যে আপনি কেন করেছেন তা আমি জানি। আপনি চেয়েছিলেন প্রথমত আমার একটি লেখা এবং দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর-একটি লেখা। এই দুটি ইচ্ছার যোগ দিয়ে যে-ইচ্ছাটি তৈরি হয়েছিল, আপনার অনুরোধটি হচ্ছে সেই যুক্ত ইচ্ছাটিরই বাহ্য প্রকাশ। আপনার মনে এ দুটি স্বতন্ত্র ইচ্ছার কী করে যোগাযোগ ঘটেছে, তা-ও আমি আন্দাজ করতে পারি।

দশ বৎসর পূর্বে বাঙলায় 'বস্তুতন্ত্রতা' কথাটা নিয়ে একটা হুজুগ ওঠে এবং অনেক পণ্ডিত সাহিত্যিক তৎকালে এই বলে গৌড়ীয় রীতিতে চিৎকার করতে আরম্ভ করেন যে, রবীন্দ্রনাথের লেখায় বস্তুতন্ত্রতা নেই। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বোল্লিখিত বন্ধুটিকে লেখেন যে— "আমার পালা ত প্রায় শেষ করিবার সময়

হইল— এখন বকশিষ পাই আর নাই পাই আপনাদের সকলকে সেলাম করিয়া এবারকার সভা হইতে বিদায় লইব। সকল শ্রোতার মধ্যে একটি শ্রোতা অদৃশ্য হইয়া বসিয়া আছেন, তিনি যদি খুসি হইয়া থাকেন ত নিত্যকালের কাছে আমার দাবী রহিয়া গেল— কোনো প্রচণ্ড পণ্ডিত বা কোনো দাম্ভিক মূর্খ তাহা মারিতে পারিবে না।"

'আমার পালা ত প্রায় শেষ করিবার সময় হইল'— রবীন্দ্রনাথের সে কালের এ ধারণাটি যে অলীক তার প্রমাণ, এ চিঠি লেখবার পরেই তিনি পদ্যে 'বলাকা' ও গদ্যে 'ঘরে বাইরে' লিখেছেন। তাঁর পালা শেষ করবার সময় দশ বৎসর পূর্বেও আসেনি, আজও আসেনি, আশা করি আর দশ বৎসর পরেও আসবে না।

তারপর তিনি যে-অদৃশ্য শ্রোতাটির কথা বলেছেন, যিনি খুশি হলে নিত্য কালের কাছে তাঁর দাবি রয়ে যাবে, সে অদৃশ্য শ্রোতাটি ভৌতিক জগতের কোন অজানা দেশে বসে নেই, কিন্তু তিনি বসে আছেন প্রত্যেক যথার্থ শ্রোতার অন্তরে। আর আবহমানকাল শ্রোতা-পরম্পরার অন্তরে সে শ্রোতাটি অদৃশ্য ভাবে অধিষ্ঠান করবেন এবং রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনে তিনি নিত্যকাল খুশি হবেন।

প্রচণ্ড পণ্ডিত ও দাম্ভিক মূর্খেরা যে তাহা মারিতে পারিবে না, এ কথা এতই সত্য যে তা বলাই বাহুল্য। ও-জাতীয় বীরপুরুষরা যদিচ কিছুই মারতে পারে না, তা হলেও জীবনে ও মনে যা কিছু সত্য ও সুন্দর, তাকে মারতে তারা নিয়ত ঘোর চেষ্টা করে। বোধ হয় তাদের স্বধর্মমত হচ্চে এই, ফলে তাদের কদাচন অধিকার না থাকলেও কর্মে তো আছে।

মরুকগে ফল, সকলেরই সকল কর্মে যে অধিকার আছে, এমন কথা আর যে-শাস্ত্রেই বলুক, গীতায় বলে না। এ মতটা হচ্চে একেলে ডিমোক্রাটিক এবং এই ডিমোক্রাটিক যুগে এ হেন কথার প্রতিবাদ করা কঠিন। তবে সত্যের খাতিরে এ কথাটা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্চি যে কাউকে প্রচণ্ড ভাবে ও দাম্ভিকতা সহকারে অনধিকারচর্চা করতে দেখলে আমার হাসিও পায়, বিরক্তিও ধরে। এই হাসি, এই বিরক্তিই হচ্চে বীরবলী লেখার প্রাণ। এই বিরক্ত হাসি হচ্চে এক রকম সাহিত্যিক অস্ত্র। সে অস্ত্র যার গায়ে পড়ে, তার পাণ্ডিত্য ও মূর্খতা অক্ষুণ্ণ থাকলেও তার প্রচণ্ডতা ও দাম্ভিকতা কতক পরিমাণে নিস্তেজ হয়।

আপনার জানা আছে যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আততায়ীদের দেহে এ অস্ত্র নিক্ষেপ করতে আমি কখনও কুণ্ঠিত হই না। আপনার পূর্বোক্ত ইচ্ছাদ্বয়ের সংপ্লবের অন্তর্নিহিত কারণ হচ্চে আপনার এই পূর্বজ্ঞান। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বাণী-যজ্ঞের বিঘ্নকারী, যে-অস্ত্র দিয়ে তাঁদের উপদ্রব শান্ত করা যায়, সেই অস্ত্র কি ইচ্ছামতো বীণাযন্ত্রে পরিণত করা যায়? বীণার তার অবশ্য লোকের গায়ে ফোটানো যায় অর্থাৎ সে তারকে ছুঁচ করা যায়; কিন্তু ছুঁচকে বীণার তার কিছুতেই

করা যায় না। আমার মতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আলোচনা তিনিই করতে পারেন, যিনি সাহিত্যে বীণার আলাপ করতে জানেন। বীরবলের 'অঙ্গুলি বীণাগুণে তরল' নয়।

বীরবলের কথা ছেড়ে দিন, আমার বিশ্বাস প্রচণ্ড পণ্ডিত ও দাম্ভিক মূর্খ ব্যতীত বাঙলার কোন সাহিত্যিকই রবীন্দ্রনাথের সমালোচক হতে পারেন না। কারণ আমরা পদ্যই লিখি আর গদ্যই লিখি, আমরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ না করি, তাঁকে সকলেই অনুসরণ করছি। প্রথমত, ভাষার কথাটাই ধরা যাক। আমি এ যুগের এমন কোন কবিকে জানিনে, যিনি হেম-নবীনের ভাষাতে কবিতা লেখেন। অপর পক্ষে আমি এমন কোন গদ্য-লেখককেও জানিনে, যিনি বিদ্যাসাগরী অথবা বঙ্কিমী ভাষায় গদ্য লেখেন। এর কারণ, ভাষার রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। সে মুক্তিলাভ করে আমরা তার সদ্ব্যবহার করি কি অসদ্ব্যবহার করি, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমাদের মনের শক্তি ও চরিত্রের উপর। সে যা-ই হোক, রবীন্দ্রনাথের দৌলতে আমরা যে বাঙলা ভাষার স্বরাজ্য লাভ করেছি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু তা-ই নয়, বাঙলার নব কবিদের কণ্ঠে নূতন সুর ও নূতন ছন্দ রবীন্দ্রনাথই দান করেছেন। আর আমাদের গদ্য-লেখকদের বুকে ও মুখে নূতন প্রাণ ও নূতন স্ফূর্তি তিনিই এনে দিয়েছেন। আমাদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার অর্থ আত্মবিচার। আমরা যদি মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারি যে, আমাদের মন ও ভাষার উপর রবীন্দ্রনাথের মন ও ভাষার একটা প্রভাব আছে, আর সেই আবিষ্কৃত সত্য স্পষ্ট করে বলতে পারি, তা হলে তা-ই হবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যথার্থ সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় সমালোচনা করবার অধিকার আমার আছে এবং ভবিষ্যতে তা করবার ইচ্ছাও আছে। অবশ্য সে সমালোচনা পড়ে অনেকে বলবেন, এ তো রবীন্দ্রনাথের আলোচনা নয়, বীরবলের আত্মকথা। যে-ব্যক্তি নিজের মন জানে, সে-ই জানে যে মানুষের 'স্ব' পদার্থটি কত পর-পদার্থ দিয়ে গড়া। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সত্য সম্বন্ধে অন্ধতাকেই লোকে 'নিজত্ব' বলে মনে করে।

আর একটি কথা। আমি পূর্বে বলেছি যে, আমরা সকলে তাঁর অনুকরণ না করি, তাঁর অনুসরণ করছি। অনুসরণ করছি বটে, কিন্তু তাঁর কত পিছনে যে পড়ে আছি, সে জ্ঞানও আমাদের থাকা প্রয়োজন, নচেত আমাদের অন্তরে দাম্ভিকতা ঢুকে যাবে। কথাটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সংস্কৃত ভাষায় অলঙ্কারের একখানি গ্রন্থ আছে, যার নাম 'ধ্বন্যালোক'। এই নামের গুণেই আমি ও-গ্রন্থের মহাভক্ত। উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা আনন্দবর্দ্ধনাচার্য ধ্বনি ও আলোক, এ দুটি শব্দ যে-অর্থেই ব্যবহার করুন না কেন, আমি ওদের সোজা মানে বুঝি, sound and light। অলঙ্কারশাস্ত্রকে কলমের এক টানে

Physics-এর ভিতরে এনে ফেলাটা একটি অপূর্ব কীর্তি। জড় বৈজ্ঞানিক ইউরোপও কখনও এমন কাজ করতে সাহসী হয়নি।

এখন আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের মতো লেখকদের পদ্যে যদি 'ধ্বনি' থাকে আর গদ্যে যদি 'আলোক' থাকে, তা হলেই আমরা পরম কৃতার্থ হই। রবীন্দ্রনাথের লেখায় যুগপৎ দুটি জিনিসই সমান থাকে।

এখন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, heat গেল কোথায়? আমি বলব, সে বস্তু গেছে তার স্বস্থানে অর্থাৎ পলিটিকসের ভিতর, অতএব সাহিত্যের বহির্ভূত লেখায় অর্থাৎ সংবাদপত্রের ভিতর। বলা বাহুল্য যে, যার নাম পলিটিকস, তার নামই সংবাদপত্র। ওর একটির বিরহে অপরটি বাঁচে না। ওর একটি অপরটির সহমরণে যায়।

Physics আর দুটি শক্তির সন্ধান দেয়, যা আনন্দবর্দ্ধনের সময় আবিষ্কৃত হয়নি, যথা Electricity ও Magnetism। এ দুটি শক্তিও রবীন্দ্রনাথের লেখায় একসঙ্গে বিরাজ করছে। তাঁর গদ্য ও পদ্যের ভিতর প্রভেদ এই যে, তাঁর পদ্যে magnetism প্রধান, আর তাঁর গদ্যে Electricity।

স মা লো চ না

আমরা যারা লিখি, আমরা সকলেই চাই যে আমাদের লেখার অপরে সমালোচনা করুক। এর কারণও অতি স্পষ্ট। লেখক মাত্রেই লেখেন পাঠকের জন্য। যদি আমাদের লেখা সম্বন্ধে সকলে নীরব থাকেন তো বুঝতে পারি নে যে, সে লেখা কেউ পড়েছেন কি না। অপর পক্ষে তার সমালোচনার সাক্ষাৎ পেলেই আমরা এই মনে করে কতকটা স্বস্তি অনুভব করি যে, অন্তত একজন পাঠকও তা পড়েছেন।

সমালোচনা মাত্রেই যে স্তুতিবাচক হবে এমন কোন কথা নেই, বরং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তার ঠিক উলটো হয়। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে, তাতে লেখকদের বড় বেশি আসে যায় না।

আমরা সকলেই অবশ্য প্রশংসালোভী। এবং একজন পাঠকও যদি আমাদের রচনার সুখ্যাতি করেন, তা হলেই আমরা হাতে স্বর্গ পাই। কিন্তু সমালোচকের মুখে প্রশংসার মতো নিন্দারও একটা বিশেষ মূল্য আছে। নিন্দার প্রসাদেও আমাদের লেখা জনসমাজে সুপরিচিত হয়ে উঠে। বিজ্ঞাপন হিসেবে কোন বইয়ের নিন্দা ও প্রশংসার মধ্যে কোন্‌টি বেশি মূল্যবান, বলা কঠিন। অনেক সমালোচক-নিন্দিত সাহিত্যও যে সমাজে দিব্যি চলে যায়, তার প্রমাণ দেদার আছে। একখানি সেকেলে কাব্যের নাম করলেই বুঝতে পারবেন যে, আমার কথা ঠিক। বিদ্যাসুন্দরকে অনেক দিন থেকেই লোকে অপাঠ্য বলে আসছে। অথচ আমার বিশ্বাস, বিদ্যাসুন্দরের প্রচলন বাঙালি সমাজে মোটেই কম নয়। ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে ও-কাব্যের নিন্দা তো বহুকালাবধি সকল শিক্ষিত লোকের মুখেই শোনা গিয়েছে, তৎসত্ত্বেও ভারতচন্দ্রকে কবি বলতে আজকের দিনে আমরা ভয় পাইনে। যে-কারণে ভারতচন্দ্র নিন্দিত, সে কারণে আজকের দিনে যদি কোন লেখক নিন্দিত হন, তা হলে সে নিন্দা তাঁর পক্ষে একটা মস্ত বিজ্ঞাপন হবে।

সে যা-ই হোক, এ কথা নির্ভুল যে, আমরা লেখকরা চাই সমালোচকদের কাছ থেকে নিন্দা নয়— প্রশংসা। এ আমাদের জাতিধর্ম। লেখকেরা আবহমান কাল প্রশংসার ভিখারি ছিলেন, আজও আছেন। 'গুণী গুণং বেত্তি', 'মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদা',

এ সকল সংস্কৃত বচন লেখকদের হাত থেকে বেরিয়েছে, সমালোচকদের হাত থেকে নয়।

সাহিত্যিকদের এ প্রবৃত্তির সঙ্গে ঝগড়া করে কোন ফল নেই। এ প্রবৃত্তিকে দুর্বলতা বললেও সে দুর্বলতা আমরা ত্যাগ করতে পারব না, আর যিনি পারেন তাঁর পত্রপাঠ সমালোচকদের দলে গিয়ে ভর্তি হওয়া উচিত।

কে না জানে যে বাহবা না পেলে গাইয়ে-বাজিয়েরা আসর জমাতে পারে না। এবং যে-শ্রোতা যত বেশি বার 'কিয়াবাৎ' 'কিয়াবাৎ' বলে, ওস্তাদেরা তাকেই তত বড় সমঝদার বলে মেনে নেন। এর কারণও স্পষ্টই। সাহিত্যের ফুল অনুকূল জলবায়ু না পেলে স্ব-রূপে ফুটে উঠতে পারে না। এই প্রশংসা জিনিসটে হচ্চে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির একটি প্রধান সহায়। কাব্যের রস উপভোগ করবার অক্ষমতা সমালোচকদের একটা ক্ষমতার মধ্যে গণ্য নয়।

ইংলন্ডের সর্বাগ্রগণ্য মনীষী Bertrand Russell তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে নতুন বইয়ে লিখেছেন যে— "Praise is less harmful. But it should not be given so easily as to lose its value, nor should it be used to over-stimulate a child."

উপরোক্ত child কথা থেকেই বুঝতে পারছেন যে, এ হচ্চে শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা। কিন্তু আমরা সাহিত্যিকরা উকিল-মোক্তার-পলিটিসিয়ান-দোকানদারদের মতে কি সব শিশু নই? অন্তত সমাজ উপরিউক্ত সেয়ানাদের তুলনায় আমাদের কি ছেলেমানুষ হিসেবে দেখেন না? অতএব Russell-এর মতানুসরণ করে সমালোচকদের আমাদের প্রশংসা করাই কর্তব্য।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমালোচকদের একটু বিপদ আছে। তাঁরা যদি রামের প্রশংসা করেন তো শ্যাম মনঃক্ষুণ্ণ হবে এবং এ অবস্থায় শ্যামচন্দ্রকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না যে, রামচন্দ্রের প্রশংসার অর্থ শ্যামচন্দ্রের নিন্দা নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে কথাটা আর একটু পরিষ্কার করছি। গত মাসের কল্লোল-এ শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তিনখানি বইয়ের গুণ গেয়েছেন। তার মধ্যে একখানি হচ্ছে 'গড্ডলিকা'। কিছু দিন পূর্বে আমিও এ বইয়ের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছি। আমার যত দূর মনে পড়ে, ঐ প্রশংসাসূত্রে এক জায়গায় বলেছিলাম যে, বঙ্গসাহিত্যে এর তুলনা নেই। এই কথা শুনে বীরবল যদি ব্যাজার হতেন তো ভেবে দেখুন, কী মুশকিলেই পড়তুম। তখন তাঁকে গিয়ে বলতে হত যে, 'গড্ডলিকার হাস্যরস আর তোমার হাস্যরস এক জাতীয় নয়।' এ কথা শুনে তিনি যদি প্রশ্ন করতেন যে, ও-দুয়ের প্রভেদটা কী? তা হলে উত্তরে আলঙ্কারিকদের এই বচন আওড়াতে বাধ্য হতুম—

ইক্ষুক্ষীর গুড়াদীনাং মাধুর্য্য স্যান্তরং মহৎ।
তথাপি ন তদাখ্যাতুঃ সরস্বতাপি শক্যতে॥

বীরবলের উদাহরণ দিচ্ছি এই কারণে যে, তিনি আমার ঘরের লোক, সুতরাং তাঁর নাম করায় আমার বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু বীরবল না হয়ে যদি কোন নির্বল রসিক আমার উপর নারাজ হতেন, সেটা অবশ্য নিতান্ত আক্ষেপের কারণ হত। শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদের সমালোচনার উপর আপনারা যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তা-ই পড়েই আমার মনে এই কথা উদয় হয়েছে যে, সমালোচকের পক্ষে এ যুগে কারও প্রশংসা করা তার নিন্দা করার চাইতেও বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। এ যুগ তো আর বঙ্গদর্শন-এর যুগ নয়, যখন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে লেখকদের সরাসরি বিচার করতেন ও খুশিমতো তাদের তিরস্কৃত ও পুরস্কৃত করতেন ও পাঠকসমাজ তাঁর কথাই বেদবাক্য বলে মেনে নিত। এ যুগ যে সাহিত্যেরও ডিমোক্রাটিক যুগ। আপনারা জানিয়ে রেখেছেন যে, শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদের প্রবন্ধের সপক্ষে-বিপক্ষে কোন কথাই আপনারা প্রকাশ করবেন না। তবুও আমি যে এ বিষয়ে দু-চার কথা বলছি, তার কারণ উক্ত প্রবন্ধ আমার আলোচ্য বিষয় নয়, শুধু আলোচনার উপলক্ষ্য মাত্র। কোন সমালোচকের কোন মতামতের প্রতিবাদ কিম্বা সমর্থন করবার দিন এখন চলে গিয়েছে। কেননা এ যুগে সাহিত্য সম্বন্ধে শুধু ব্যক্তিগত মতামতেরই অর্থ ও সার্থকতা আছে।

এ যুগে নিজের মন ছাড়া অপর কোন রকম কষ্টিপাথর লোকের হাতে নেই, যার সাহায্যে সে সাহিত্যের দর কষে দেবে। ইংরেজিতে যাকে বলে cannons of critricism— এ যুগে সে সব বিলকুল বাতিল হয়ে গিয়েছে। অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করে কেউ কস্মিন কালেও কাব্যরচনা করতে পারেননি এবং সেকালেও কবিরা সে শাস্ত্রের নিষেধও পদে-পদে লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়েছেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যদেহের দোষের একটা লম্বা ফর্দ আছে, অথচ আলঙ্কারিকরাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, দোষ হয়ে গুণ হল কবির বিদ্যায়। 'দৈব বিধান' যে 'শাস্ত্রবিধানে'র চাইতে প্রবল, এ কথাও তাঁরা স্পষ্টাক্ষরে বলে গিয়েছেন।

এ যুগে আমরা এ ক্ষেত্রে কোন রূপ শাস্ত্রবিধান গ্রাহ্য করতে পারিনে, ফলে উক্ত বিধান অনুসারে এ কাব্য, ও নয়, এমন কথাও বলতে অধিকারী নই। কারণ দেখতে পাওয়া যায় যে, নিত্য নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে যা কোন পুরনো নিয়মের অধীন নয়। ফলে সাহিত্য-সমালোচনার জন্য সমালোচকেরা নিজের রুচির উপরই নির্ভর করতে বাধ্য। এক হিসেবে এটি দুঃখের বিষয়, কারণ প্রতি ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র নিজের রুচির উপর নির্ভর করেন, তা হলে সামাজিক রুচি বলে কোন জিনিস জন্মাতে পারে না— ফলে এ ক্ষেত্রে যা জন্মায়, তারা নাম critical anarchism। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ যুগে সমালোচকদের মেনে নিতে হবে যে, সমালোচনা করার অর্থ হচ্ছে আত্মপ্রকাশ করা। এতে যিনি ভয় পান, তাঁর

পক্ষে সমালোচনা ত্যাগ করাই কর্তব্য। লেখকদলকে লালন-পালন শাসন-সংরক্ষণ করবার দায়িত্ব এ যুগের সমালোচকদের নেই।

অ ভি ভা ষ ণ

১

চিঠি লিখতে বসলেই, সর্বাগ্রে তার পাঠ লিখতে হয়। এ পাঠ অবশ্য নিজে রচনা করতে হয় না। তা পূর্ব থেকেই সমাজ কর্তৃক রচিত হয়ে রয়েছে, সেই বিধিবদ্ধ বাক্যসমূহ আমরা নির্বিচারে মুখস্থ করে পত্রস্থ করি। এ পাঠ অবশ্য সকল ভাষায় সকল সমাজে এক নয়। দেশভেদে, কালভেদে, সম্প্রদায়ভেদে, পত্রের মুখপত্র নানা আকার নানা রূপ ধারণ করে।

কিন্তু এ সকলের বাহ্য আকারে যে-প্রভেদই থাকুক না কেন, সকলেরই বক্তব্য এক। সকলেরই উদ্দেশ্য লেখকের হীনতা ও দীনতা প্রকাশ করা। যিনি যে-ভাষাই ব্যবহার করুন, যতই না কেন শ্রুতিমধুর বাক্য প্রয়োগ করুন, সকল পাঠেরই নির্গলিতার্থ হচ্ছে 'সবিনয় নিবেদন'। অর্থাৎ নিবেদনটা আসে পরে, তার আগে আসে বিনয়,— এই আশায় যে, লেখকের নিবেদনটা যদিও পাঠকের মনঃপূত না হয়, বিনয়টুকু তো হবেই। বিনয় ঘুষ দিয়ে পাঠকের মেজাজ খুশ করাই এর ধর্ম।

বক্তৃতা অর্থাৎ লোকসমাজে মৌখিক নিবেদনটাও এই একই নিয়মের অধীন। সভা মাত্রেই সভাপতির পক্ষে প্রথমেই বিনয় প্রকাশ করাটা একটা অবশ্যকর্তব্যের ভিতর দাঁড়িয়ে গিয়েছে এবং এ কর্তব্য পালন করবার উপযুক্ত বাঁধি গতেরও সৃষ্টি হয়েছে।

সভাপতিকে কার্যারম্ভে আগে এই কথা বলে মুখ খুলতে হয় যে, তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করবার যোগ্য পাত্র নন। আমি কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত মামুলি বিনয়ের অভিনয় করতে পরাঙ্মুখ। ও হচ্ছে আসলে বৃথা বাক্যব্যয়। যে-কথা একশো বার শুনেছি, সে কথা আবার শুনলে শ্রোতার তা এক কান দিয়ে ঢুকে আর-এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়, তার মরমে প্রবেশ করে না। যুগ-যুগ ধরে পুনরুক্তির ফলে কথা মাত্রেই কথার কথা হয়ে যায়।

তা ছাড়া এ জ্ঞান আমার আছে যে, আমার মতো সাহিত্যিকের মুখে বিনয় শোভা পায় না, শোভা পায় শুধু সাহিত্যরাজ্যের রাজারাজড়াদের মুখে। এর একটি ক্লাসিক উদাহরণ দিচ্ছি। কালিদাস রঘুবংশ-এর প্রথমেই লিখেছেন—

'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।।'

অর্থাৎ— আমি মন্দ কবিযশঃপ্রার্থী হয়ে হাস্যাস্পদ হব, কেননা আমার পক্ষে এ প্রয়াস বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার মতো।

পূর্বোক্ত উক্তি হচ্ছে সাহিত্যিক বিনয়ের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু এ কথা কালিদাস কখন বলেছিলেন— যখন তিনি সেকালের বিদগ্ধমণ্ডলীর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য হয়েছিলেন। রঘুবংশ কালিদাসের শেষ কাব্য। মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ রচয়িতার মুখে এ বিনয় শোভা পায়। কে না জানে যে, বড়লোক দুটি হেসে কথা কইলেই আমরা মুগ্ধ হই। আভিজাত্যের সঙ্গে সৌজন্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কিম্বদন্তি এই কাল্পনিক ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপর পক্ষে কালিদাস তাঁর প্রথম কাব্যে যে-আত্মপরিচয় দেন, তার ভিতর বিনয় নেই— যদি কিছু থাকে তো আছে স্পর্ধা। মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রথমেই তিনি সূত্রধারের মুখ দিয়ে সভাসদ্‌দের শুনিয়ে দিয়েছেন যে—

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং,
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে,
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।।

অর্থাৎ কাব্য পুরনো বলেই সাধু হয় না, আর নূতন বলেই গর্হিত হয় না। সাধু ব্যক্তিরা কাব্যের নূতনত্ব প্রাচীনত্ব নয়, তার গুণাগুণ পরীক্ষা করেই তার ভজনা করেন। কেবল মূঢ় ব্যক্তিরাই পরের মুখে ঝাল খায়।

কালিদাসের প্রথম বয়েসের ও তার শেষ বয়েসের উক্তি দুটির উল্লেখ করলুম এই সত্যের পরিচয় দেবার জন্যে যে, বড় লেখকের মুখে বিনয় যেমন ভূষণ, নবীন লেখকের মুখে স্পর্ধাও তেমনই অস্ত্র। কিন্তু যে-নবীন লেখকও নয়, বড় লেখকও নয়, তার মুখে ও-দুইয়ের কোনটিই শোভা পায় না। যেহেতু, লেখায় আমার হাতে-খড়ি কাল হয়নি, আর আজও পাকা লেখক হয়ে উঠিনি, সে কারণ, আমার পক্ষে আমার সাহিত্যিক গুণাগুণ সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়। তা ছাড়া যখন ভোটের প্রসাদে এ পদ লাভ করেছি, তখন আমার যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচারসহ নয়। ইলেকশন জিনিসটিই তো যোগ্যতমের উদ্বর্তনের অভ্রান্ত বিলেতি কল।

২

আমি যে আপনাদের কাছ থেকে নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে মহা আনন্দিত হয়েছি তার প্রমাণ, আপনাদের আহ্বানে আমি দ্বিধা না করে একটানা ন'শো মাইল পথ

অতিক্রম করে এ সভায় এসে উপস্থিত হয়েছি। এ রকম দেশভ্রমণ আমার পক্ষে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা নয়। আমি আমার বন্ধু শ্রীমান দিলীপকুমার রায়ের মতো ভ্রাম্যমাণ নই, অপর পক্ষে হচ্ছি বাঙ্গালায় যাকে বলে 'কুনো' লোক। এমনকী, কলকাতা শহরেও, ঘর ছেড়ে সভা-সমিতিতে উপস্থিত হতে আমি স্বতই নারাজ। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকাই আমার বদ্ধমূল অভ্যাস। আর এই একঘরে হয়ে থাকবার যুগসঞ্চিত অভ্যাস এখন স্বভাবে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া আমার এখন দেহের কলকব্জা সব ঢিলে হয়ে এসেছে। আমি যে এই বিকল দেহযন্ত্রটাকে ফিনফিনে গরমের দেশ থেকে কনকনে শীতের দেশে টেনে নিয়ে এসেছি, সে দিল্লির টানে নয়, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের টানে।

এই দিল্লি শহরটার সঙ্গে আমার মনের নাড়ির কোন যোগ নেই। দিল্লি সাহিত্যের রাজধানী নয়। অন্তত যে-সব ভাষার সঙ্গে আমি পরিচিত, সে সব ভাষার সাহিত্যের তো নয়ই। আমি যদি সাহিত্যিক না হয়ে ঐতিহাসিক হতুম, তা হলে অবশ্য এ শহরের মায়ায় চির-আবদ্ধ হয়ে পড়তুম। গত হাজার বৎসরের ইতিহাস নামক ট্রাজেডি এ নগরীর পৃষ্ঠে ক্ষোদিত পাষাণের আরক্ত অক্ষরে লিখিত রয়েছে। এ শহরের আবেদন লোকের কানের কাছে নয়, চোখের কাছে। Archeo-logist-দের কাছে, অর্থাৎ যাঁরা পাষাণের পেটের কথা জানেন, তাঁদের কাছে, দিল্লি শহর একটি বিরাট প্রস্তরলিপি। সে লিপি আমার কাছে আরবি ও ফার্সি হরফের মতোই অপরিচিত। আমি যখনই দিল্লির সম্মুখস্থ হই, তখনই শুনতে পাই যে, এখানকার গম্বুজে, মস্‌জেদে, মিনারে, কবরে শতমুখে একটি মাত্র বাণী ঘোষণা করছে; আর সে বাণী এই— Vanity of vanities, all is vanity.

এ বাণীর উপর এ কালের সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা এ সত্যের প্রতি বিমুখ হয়েই অগ্রসর হতে চাই। তাই মানুষের বিরাট অহঙ্কারের এই স্তূপীকৃত ধ্বংসা-বশেষের সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে আমাদের সরস্বতী ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে! বাঙ্গালা দেশে আমার নিজ হাতে গড়া এবং হাত-ধরা জনৈক সাহিত্যিক আছেন, যিনি এখানে এলে সম্ভবত নানাবিধ পূর্বস্মৃতিতে উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। কিন্তু তাঁকে আমি সঙ্গে আনতে পারিনি— তিনি অনিমন্ত্রিত বলে। তাঁর নাম হচ্ছে বীরবল।

৩

আমি যে আপনাদের ডাক শুনে এখানে ছুটে এসেছি, সে কেবল বিদেশে বঙ্গ-সরস্বতীর পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্য এবং তার উৎসবে যোগদান করবার জন্য। বাঙ্গালা সাহিত্যের লম্বা ইতিহাস আমাদের পিছনে পড়ে নেই— পড়ে আছে আমাদের সুমুখে। এ সাহিত্যের স্মৃতিতে মগ্ন থাকার সুযোগ আমাদের নেই, এর ভবিষ্যৎ নিয়েই আমাদের কারবার। কারণ, বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দির আমাদের নিজ-

হাতে কায়ক্লেশে গড়ে তুলতে হবে— আর তার জন্য চাই বহু শিল্পী এবং এ যুগে বহু স্বেচ্ছাসেবক। যেমন পুরাকালের ধর্মমন্দির সব ভক্তের দল গড়ে তুলেছে, এ যুগের সরস্বতীর মন্দিরও তাঁরাই গড়ে তুলবেন, যাঁদের বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি পরাপ্রীতি অর্থাৎ অহৈতুকী প্রীতি আছে। বঙ্গ-সাহিত্যের ভাবী উন্নতি ও ঐশ্বর্যের উজ্জ্বল রূপ আমি কল্পনার চক্ষুতে বরাবরই দেখে আসছি। এ মন্দির অবশ্য মেঘরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত নয়। এর গোড়াপত্তন বাঙ্গালিরা বঙ্গভাষার জমিতেই করেছে। সুতরাং একে সুগঠিত করে তুলবার কোনই অন্তরায় নেই— একমাত্র আমাদের ঔদাসীন্য ব্যতীত। বহু লোকের মনে যদি এই নবভক্তি স্থান পেয়ে থাকে, তা হলে বঙ্গসাহিত্য যে অচিরে অপূর্ব শ্রী ধারণ করবে, সে বিষয়ে তিল মাত্র সন্দেহ নেই। এত দিন আমরা বাঙ্গালাদেশে জন-কতক মিলে এই সাধনায় ব্যাপৃত ছিলুম। বাঙ্গালার বাহিরেও যে বঙ্গ-সরস্বতীর এত ভক্ত আছে, দু'দিন আগে সে জ্ঞান আমাদের ছিল না। আমার নিজের মনে একটা ধারণা ছিল যে, প্রবাসী বাঙ্গালিরা শুধু দেশ হিসেবে প্রবাসী হননি, মনেও প্রবাসী হয়েছেন। এ ধারণার মূলে একটা ছোট্ট ঘটনা আছে। কত ছোটখাটো ঘটনার বীজ থেকে কত বড়-বড় ভুল ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়, তারই পরিচয় দেবার জন্য এই ভুল ধারণার মূলস্বরূপ একটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনার উল্লেখ করছি।

৪

এ ঘটনা এত দিন পূর্বে ঘটেছিল যে, সেটিকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বললেও অত্যুক্তি হয় না। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলন্ডে এক দিন একটি ভারতবর্ষীয় যুবকের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনিও বিদ্যার্থী হিসেবেই সে দেশে গিয়েছিলেন, আর আমরা দু'জনেই একই বিদ্যা অর্জন করতে সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিলুম। তাঁর নামরূপের পরিচয় থেকে বুঝলুম যে, তিনি আমারই স্বজাতি— অর্থাৎ বাঙ্গালি। তিনি যে বাঙ্গালি নন, এমন ভুল করা কোন বাঙ্গালির পক্ষে অসম্ভব ছিল; কারণ, তাঁর দেহযন্ত্রটি মামুলি বাঙ্গালি ছাঁচেই ঢালাই করা হয়েছিল। সে মূর্তির রেখা ও বর্ণ আমাদের অনুরূপই ছিল। প্রথম-প্রথম আমরা উভয়ে ইংরাজি ভাষায় কথোপ-কথন আরম্ভ করি— কারণ, অপরের কাছে শুনেছিলুম যে, তিনি বাঙ্গালি হলেও একজন প্রবাসী বাঙ্গালি। শেষটা তাঁকে মুখ ফুটে বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করলুম— 'আপনি বাঙ্গালা জানেন?' তিনি হেসে উত্তর দিলেন, 'সে হামি ভাল জানি।' বলা বাহুল্য যে, এ উত্তর শুনে আমি একটু চমকে উঠেছিলুম। তাঁর মুখের 'ভাল জানি' কথাটা আমি অসন্দিগ্ধ চিত্তে গ্রাহ্য করতে অবশ্য পারিনি। আমি শুধু ভাবতে লাগলুম— দন্ত্য 'স' সংস্কৃত রীতিতে উচ্চারণ করলে, আমাদের কানে তা এত বিসদৃশ ঠেকে কেন? শেষটা বুঝলুম, সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালার মতো উচ্চারণ করলে

তা যেমন অসংস্কৃত হয়, বাঙ্গালা শব্দও সংস্কৃতের মতো উচ্চাবণ করলে তাদৃশ অ-বাঙ্গালা হয়। কিন্তু 'আমি' যে কী করে 'হামি'তে রূপান্তরিত হয়, স্বরবর্ণের আদি অক্ষর কী ফিকিরে ব্যঞ্জনবর্ণের শেষ অক্ষরে পরিণত হয়, তার হদিস আমি দু'দিন আগে পাইনি। সে যা-ই হোক, এই নব-পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় আলাপ এক কথাতেই বন্ধ হল। অতঃপর উভয়েই ইংরাজি ভাষার আশ্রয় নিলুম। কারণ, ও-ভাষায় আমাদের উভয়েরই জবান যখন সমান দুরস্ত, দু'জনেই যখন ইংরাজি ব্যাকরণ ও উচ্চারণের শ্রাদ্ধ করছি, তখন কার ভুল কে ধরবে! আমাদের সদ্য-কল্পিত লাট-দরবারের বক্তারা কি কেউ কারও ইংরাজির খুঁত ধরে?

৫

সেই থেকেই আমি ধরে নিই যে, প্রবাসী বাঙ্গালির মুখের বাঙ্গালা আমাদের মুখের হিন্দির অনুরূপ। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, হিন্দি আমরা একদম শিখিনি, অপর পক্ষে প্রবাসী বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা একদম ভেলেননি। ফলে হিন্দি সাহিত্যের আদর আমাদের কাছে যদ্রূপ, বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর তাঁদের কাছেও তদ্রূপ।

উনবিংশ শতাব্দীতে সংগৃহীত আমার উক্ত ধারণা বিংশ শতাব্দীতে যে সম্পূর্ণ অচল, সে সত্যের পরিচয় আমি বছর পাঁচ-ছয় আগে পাই। আমার সেই বিলাত-প্রবাসী বাঙ্গালি বন্ধুটি সে যুগের প্রবাসী বাঙ্গালির একটি খাঁটি নমুনা কি না, জানিনে; যদি হন, তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে, গত ৩০ বৎসরের মধ্যে এ বিষয়ে প্রবাসী বাঙ্গালিদের মনোরাজ্যে যুগান্তর ঘটেছে। এমনকী, আমার সময়ে-সময়ে এ সন্দেহ হয় যে, আপনাদের কাছে বঙ্গ-সাহিত্যের যতটা আদর আছে, বাঙ্গালা দেশে ততটা নেই। জানিনে, এ কথা ঠিক কি না। কিন্তু এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, আপনারা যে-উৎসাহের সঙ্গে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করছেন, তা যথার্থই অপূর্ব। আর এক কথা, আপনারা এ যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যকে যতটা আমল দিতে প্রস্তুত, বাঙ্গালার লোক সম্ভবত ততটা নয়। এর জলজ্যান্ত প্রমাণ এই যে, মাদৃশ লেখককেও আপনারা সাহিত্যিক বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি।

৬

অবশ্য আজ থেকে বোধ হয় ১০/১২ বৎসর আগে আমি উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির উচ্চ পদ লাভ করি। কিন্তু সে আসন গ্রহণ করে আমি নিজেকে তাদৃশ ধন্য মনে করিনি, আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করে যত দূর করছি। কারণ, উত্তরবঙ্গ আমাকে যে এতাদৃশ সম্মানিত করেন, আমার বিশ্বাস, তার ভিতর একটু অসাহিত্যিক কারণ ছিল।

উত্তরবঙ্গ হচ্ছে আমার স্বদেশ। সুতরাং সে সভার কর্মকর্তারা 'দেশকো ভাই' বলে আমার প্রতি একটু পক্ষপাত যে দেখাননি, এমন কথা আমি জোর করে বলতে পারিনে। তৎসত্ত্বেও তাঁদের নিমন্ত্রণের ভিতর একটু কিন্তু ছিল।

আমাকে তাঁরা আমার অভিভাষণের গায়ে পোষাকি ভাষা পরিয়ে নিযে যেতে অনুরোধ করেন। আমি অবশ্য তাতে স্বীকৃত হই— এই ভয়ে যে, অসাধু ভাষায় লিখলে উত্তরবঙ্গ পাছে আমার প্রতি অদক্ষিণ হয়ে ওঠেন। লোক-লাঞ্ছনা মেরে-কেটে এক রকম সওয়া যায়, কিন্তু ঘরে গুরুগঞ্জনা অসহ্য। কাজেই সে অভি-ভাষণ লিখে আমি নিয়ে যেতে পারিনি, 'তাহা আমাকে লিখিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল।' ফলে আমার বক্তব্য তাঁদের মনোমতো হয়েছিল কি না, জানিনে, কিন্তু তা তাঁদের কর্ণশূল হয়নি। সে যা-ই হোক, আপনারা যে আমাকে এখানে ভাষার সাধুবেশ ধারণ করে আসতে আদেশ করেননি. এর জন্য আমি আপনাদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কারণ, সাহিত্যরাজ্যেও বার-বার বহুরূপী সাজাটা কষ্টকর না হলেও লজ্জাকর।

এ পুরাকাহিনী শোনাবার উদ্দেশ্য আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, আমরা যাকে নব-সাহিত্য বলি, তার ভাষারও একটু নবীনতা আছে। সাহিত্যের ভাষার এই মোড়-ফেরানোর ব্যাপারে আমার কতকটা হাত আছে। আর প্রধানত সেই হিসেবেই সাহিত্য সমাজে আমি নিন্দিত ও প্রশংসিত অর্থাৎ বিখ্যাত। আমাদের এ ভাষা চলতি ভাষা বলেই পরিচিত। যখন এ ভাষাকে আমরা প্রথমে সাহিত্যে প্রমোশন দিই, তখন জন-কতক বাঙ্গালা সাহিত্যের দলপতি এবং তাঁদের দলবল মহা হৈ-চৈ শুরু করেন এই বলে যে, সাহিত্য গেল, সমাজ গেল, ধর্ম গেল। 'করিয়া' 'করে' রূপ ধারণ করলেই, ক্রিয়াপদের লেজ কিঞ্চিৎ খর্ব হলেই, সে লেজুড়ের শক্তি যে এত দূর প্রলয়ঙ্করী হয়ে উঠে, এ কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। কোন জিনিসেরই সৃষ্টি ও প্রলয় অত তড়িঘড়ি হয় না। কিন্তু সমালোচকের তাড়নায় আমরা পাঠকের মহামান্য উচ্চ আদালতে সাধু ভাষা বনাম চলতি ভাষার মামলা রুজু করতে বাধ্য হই। তার পর বছর-পাঁচেক ধরে নানা রূপ বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অদার্শনিক সওয়াল-জবাবের ফলে এ ফেরা আমরা সে মামলায় জয়লাভ করেছি। তথাকথিত চলতি বাঙ্গালা এখন সাধু ভাষার সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে এক পঙ্ক্তিতে বসবার অধিকার লাভ করেছে। যা আজ হয়েছে, তাকে ভাষার dyarchy বলা যেতে পারে। এতেই আমরা কৃতার্থ, কারণ, সাধু ভাষার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মামলা আমরা আনিনি; শুধু চলতি বাঙ্গালারও যে সাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার আছে, তা-ই প্রমাণ করতে চেয়েছিলুম।

৭

আমাদের ভাষার অন্তরে যে নবীনতা আছে, তার প্রমাণ, নবীনের দলই ছিলেন আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আপনাদের ঘাড়ে গতানুগতিক মতামতের চাপ ততটা নেই, যতটা আছে আমাদের উপরে; কারণ, বাইরে যেতে হলেই অনেক পৈতৃক আসবাবপত্র ঘরে ফেলে আসতে হয়, মনের আসবাবপত্রও। সুতরাং আশা করছি যে— 'পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং', কালিদাসের এ উক্তির সত্যতা আপনারা যত সহজে হৃদয়ঙ্গম করবেন, যে-সব বাঙ্গালির কাছে 'ঘর থেকে আঙিনা বিদেশ', তারা তত সহজে করবে না।

ভাষার গুণাগুণ প্রয়োগসাপেক্ষ। একটি উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোক বলে যে— 'বীণা বাণী অসি ও নারী'র নিজস্ব কোন গুণ নেই; যার হাতে তা পড়ে, তার উপরই তার গুণাগুণ নির্ভর করে। ও-শ্লোকের অন্তর থেকে নারীকে সসম্মানে মুক্তি প্রদান করলে বাদবাকি কথা আমরাও নির্ভয়ে গ্রাহ্য করতে পারি, বিশেষত বাণী সম্বন্ধে। কারণ, ভাষা জিনিসটি অসি হিসাবেও ব্যবহার করা যায়, বীণা হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। তা যে যায়, তা তিনিই জানেন, যাঁর রবীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথের পদ্য যাঁদের হৃদয় স্পর্শ করতে না পারে, তাঁর গদ্য হেলায় তাঁদের হৃদয় বিদ্ধ করতে পারে।

আসল কথা এই যে, সাধু ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তাঁরাও যে সর্গম নিয়ে করবার করেন, আমরাও সেই সর্গম নিয়ে কারবার করি। প্রভেদ এই যে, সাধু ভাষার অচল ঠাটের পরিবর্তে আমরা সচল ঠাটে সাধনা করছি। তবে এ তর্ক যে বাঙ্গালা দেশে উঠেছিল, সেটি এক হিসেবে আমাদের সৌভাগ্যের কথা। কারণ, এ আলোচনার ফলে সকলেরই বঙ্গভাষার উপর দৃষ্টি পড়েছে; এবং ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁদের মাতৃভাষার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়েছেন। যেমন বাঙ্গালা দেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়েছেন।

৮

মাতৃভাষার মাহাত্ম্যের বিষয়ে আপনাদের কাছে বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, আপনাদের সঙ্গে আমাদের মানসিক ঐক্যের প্রধান বন্ধনই তো এই ভাষার বন্ধন। ভাষাই হচ্ছে একটি জাতির পরস্পরের মনপ্রাণের অপৌরুষেয় যোগসূত্র। আমি অপৌরুষেয় বিশেষণটি ব্যবহার করছি এই কারণে যে, কোন বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক পৃথিবীর কোন ভাষাই সৃষ্ট হয়নি, আমাদের ভাষাও হয়নি। একটা সমগ্র মানব সমাজ যুগ-যুগ ধরে অলক্ষিতে একটা ভাষা গড়ে তোলে। সামাজিক মন যে-ভাবে দিনের পর দিন গড়ে উঠেছে, সঙ্গে-সঙ্গে তার ভাষাও তেমনই গড়ে

উঠেছে। একটা জাতির মন যে-কারণে যে-উপায়ে সাকার হয়ে উঠেছে, সে জাতির ভাষাও সেই কারণে সেই উপায়ে সাকার হয়ে উঠেছে। জাতির মন যখন একটি বিশিষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন মূর্তি ধারণ করে, তখনই তা সাহিত্যে বিকশিত হয়। সাহিত্যে দীক্ষিত হয়েই ভাষা তার দ্বিজন্ম লাভ করে, অর্থাৎ দ্বিজ হয়। সাহিত্যের মূল উপাদান কী? মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, বেদনা, কল্পনা, কামনার চিত্রই তো সাহিত্য। যখনই একটি জাতির ভিতর সাহিত্যের দর্শন লাভ করা যায়, তখনই বুঝতে হবে, সে জাতির মন আলোকে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে ও তার অন্তরে আত্মজ্ঞান প্রবুদ্ধ হয়েছে। কারণ, সাহিত্য প্রবুদ্ধ জ্ঞানেরই সৃষ্টি। মানুষের মন ও ভাষাকে দেশ ও কাল, দু'জনে দু'হাত মিলিয়ে তৈরি করেছে। আমরা যদি কোন কারণে দেশের বন্ধন কাটাই, তা হলেও কালের বন্ধন ছিন্ন করতে পারিনে। মানুষ উদ্ভিদের মতো জিওগ্রাফির অধীন নয়; তার মন নামক জিনিস আছে বলে সে মুখ্যত হিস্টরির অধীন। সে অধীনতা-পাশ সম্পূর্ণ ছিন্ন করলে সে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা যাকে জাতীয়তা বলি, তার মূল ভিত্তি ইতিহাসের গর্ভে নিহিত।

৯

রবীন্দ্রনাথ বহু কাল পূর্বে এই বলে আক্ষেপ করেন যে,— "আমাদের দেশের পুরাবৃত্ত, ভাষাতত্ত্ব, লোক-বিবরণ প্রভৃতি সমস্তই এ পর্য্যন্ত বিদেশী পণ্ডিতরা সংগ্রহ এবং আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। দেশে থাকিয়া দেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা একেবারে উদাসীন, এমন লজ্জা আর নাই।" আপনারা শুনে সুখী হবেন, বাঙ্গালিরা তাদের ভাষাব ইতিহাস সম্বন্ধে এখন আর উদাসীন নয়। সম্প্রতি আমার বন্ধু শ্রীমান্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়— 'The Origin and Development of the Bengalee Language' নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেছেন। এই বিরাট গ্রন্থের মালমসলা সংগ্রহ করতে এবং সেই উপাদান দিয়ে এই ইতিহাস রচনা করতে, এক যুগ ধরে তাঁকে কী একান্ত, কী অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা ভাবতে গেলেও আমাদের মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। এখানি ভাষাবিজ্ঞানের একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ। বিজ্ঞানের একটা মস্ত গুণ এই যে, ও-শাস্ত্র অনেক তর্কের একেবারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দেয়। তার একটি চমৎকার প্রমাণ আমি বহু কাল পূর্বে পাই। জনৈক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে— "চৌধুরী মশায়, এ কথা কি সত্য যে, য়ুরোপের পণ্ডিতরা সূর্যের পরিমাণ নির্ণয় করেছে?" আমি উত্তরে বললুম, "হাঁ, এ কথা আমিও শুনেছি।" এ উত্তর শুনে তিনি হেসে বললেন, "মূর্খের অসাধ্য কিছুই নেই, সূর্য যে প্রমেয়, তাই প্রমাণ করবার আগে বেটারা সূর্যকে মেপে সারলে।" আমি মনে-মনে বললুম,— যখন তারা সূর্যকে মেপে সারা করেছে, তখন তা প্রমেয় কি অপ্রমেয়, এ তর্কের আর অবসর নেই। তা ছাড়া সূর্য

প্রমেয় কি অপ্রমেয়, এই তর্কই যদি চালানো হত, তা হলে মাপ আর কখনওই নেওয়া হত না; কেননা, ও-তর্কের আর শেষ নেই, যাবচ্চন্দ্র দিবাকর চলতে পারে।

আমরা পাঁচ জন সাহিত্যিক মিলে যে ভাষার তর্ক করেছি, সে কতকটা ঐ গোছের। চলতি বাঙ্গালা লিখিতব্য কি অলিখিতব্য, তাই নিয়ে আমরা বাগ্‌বিতণ্ডায় ব্যাপৃত ছিলুম। শ্রীমান্ সুনীতি এ তর্ককে খতম করে দিয়েছেন। তিনি বঙ্গভাষার যে-পুরাতত্ত্ব আমাদের শুনিয়েছেন, তা আপনাদের সংক্ষেপে শোনাতে চাই। কারণ, এ আশা আমি করতে পারিনে যে, ঐ দু'হাজার পাতার বই ধৈর্য ধরে আপনারা পড়ে উঠতে পারবেন। ওতে সব আছে। আমার সেই পুরনো সমস্যা 'অ' কী করে 'হ' হয়, তার সন্ধানও এ পুস্তকে পাওয়া যায়। কিন্তু ভয় নেই, সে সব কথা আপনাদের বলতে যাচ্ছিনে। আমি উক্ত গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক খোসা ছাড়িয়ে ও বীচি বেছে আপনাদের কাছে তার শাঁসটুকু ধরে দেব। আশা করি, তা আপনাদের তাদৃশ মুখরোচক না হোক, নিতান্ত কটুকষায় হবে না।

১০

সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে যাঁর চাক্ষুষ পরিচয় আছে, তিনিই লক্ষ করেছেন যে, ও-নাটকের নায়ক-নায়িকা সকলেই সংস্কৃতে কথা কন না, স্ত্রী-শূদ্রের ও-ভাষায় অধিকার নেই। এর কারণ, ও-দেবভাষা আয়ত্ত করতে শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ করতে হত। সে ক্লেশ যাঁরা করতে নারাজ ছিলেন, তাঁরা সে কালের প্রচলিত মৌখিক ভাষাতেই কথোপকথন করতেন। এ কালে স্ত্রী-শূদ্ররা যেমন ইংরাজি ভাষায় গুফ্‌তগু না করে দেশভাষাতেই কথাবার্তা কয়। তবে এ কালে যেমন জন-কতক বিদূষী মহিলা ইংরাজি ভাষাকে মাতৃভাষা করে তুলেছেন, সে কালেও তেমনই জন-কতক বিদূষী মহিলা সংস্কৃত ভাষাকে সমান কণ্ঠস্থ করেছিলেন। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকারা রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করলে সংস্কৃত ছাড়া আর কিছু বলতেন না। মৌখিক ভাষা প্রাকৃত জনের মুখের ভাষা বলে তার নাম হয়েছিল প্রাকৃত।

এই প্রাকৃত মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসবা মাত্র ব্যাকরণের অষ্ট বন্ধনে পড়ে গেল এবং আলঙ্কারিকদের কল্পিত বিধিনিষেধের অধীন হয়ে পড়ল। নাটক-কাররা অলঙ্কারের বিধি অনুসারে গদ্য রচনা করতে বাধ্য হলেন শৌরসেনী প্রাকৃতে, আর পদ্য রচনা করতে বাধ্য হলেন মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে। শৌরসেনী প্রাকৃত ছিল, যে-দেশে এখন আমরা উপস্থিত, সেই দেশের সে কালের লৌকিক ভাষা। আর মহারাষ্ট্র তো অদ্যাবধি স্বনাম রক্ষা করে এসেছে। গদ্য কেন শৌরসেনীর দখলে এল, আর পদ্য মহারাষ্ট্রীর? সম্ভবত দিল্লি বক্তৃতার পীঠস্থান বলে, আর মহারাষ্ট্র গানের দেশ বলে। সে যা-ই হোক, এ দুই ছাড়া সংস্কৃত নাটকে আর একটি প্রাকৃতও আমাদের কর্ণগোচর হয়। চণ্ডাল, জল্লাদ, চোর, ধীবর প্রভৃতি ইতর

শ্রেণীর লোকের মুখে যে-প্রাকৃত শোনা যায়, সে প্রাকৃতের নাম মাগধী প্রাকৃত। এই মাগধী প্রাকৃতই রূপান্তরিত হয়ে কালক্রমে বঙ্গভাষায় পরিণত হয়েছে। বঙ্গভাষার আর যে-গুণই থাকুক, তার বংশমর্যাদা নেই। সে বড়ঘরের সন্তান নয়। আসলে খানদানি ভাষা হচ্ছে 'ব্রজভাখা', কেননা, সে ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃতের বংশ-ধর। 'ব্রজভাখা' যে সাহিত্যে মাথা তুলতে পারেনি, সে বিদেশি ভাষার বাদশাহি চাপে।

১১

প্রাকৃত হচ্ছে মৌখিক ভাষার লিখিত সংস্করণ, অর্থাৎ মুখের ভাষা পুথিগত হলেই তা হয় প্রাকৃত। ও হচ্ছে সে কালের সাধু ভাষা। ভাষা মানুষের মুখে-মুখে বদলে যায়। চলতি ভাষার প্রধান গুণ অথবা দোষ এই যে, তা চলৎশক্তিরহিত নয়। অপর পক্ষে লিখিত ভাষা বাণীর গুরুপুরোহিতদের শাসনে বইয়ের মধ্যে জড়সড় ও আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে। সমাজ বদলায়, মানুষের মন বদলায়, কিন্তু পুথিগত প্রাকৃতের আর বদল নেই। কিছু দিন পরে দেখা যায় যে, যে-প্রাকৃত এক কালে মুখে-মুখে চলত, সে প্রাকৃতও শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ করে শিক্ষা করতে হয়।

মৌখিক প্রাকৃতের স্রোত কালের সঙ্গে বয়ে গিয়ে যখন নব রূপ ধারণ করে, তার নাম হয় তখন অপভ্রংশ। শৌরসেনী প্রাকৃত যেমন কালক্রমে শৌরসেনী অপভ্রংশে পরিণত হয়েছিল, মাগধী প্রাকৃতও তেমনই কালক্রমে মাগধী অপভ্রংশে পরিণত হয়েছিল।

মাগধী প্রাকৃত অবলীলাক্রমে তার রূপ পরিবর্তন করে, কেননা, মাগধী প্রাকৃত কস্মিন্ কালেও লিখিত ভাষা হয়ে ওঠেনি। কেতাবি ভাষার চাপে তার মুক্ত গতি কখনওই রুদ্ধ হয়নি। বৌদ্ধ ধর্ম অবশ্য মগধেই জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু বিপুল বৌদ্ধ শাস্ত্র মাগধী ভাষায় লিখিত নয়। পালি বেহারী ভাষা নয়, মালবের ভাষা। জৈন ধর্মের জন্মস্থানও ঐ অঞ্চলেই। কিন্তু জৈন শাস্ত্র যে-ভাষায় লিখিত হয়েছে, সে ভাষা মাগধী নয়, অর্ধ-মাগধী। অর্থাৎ তা কাশী-কোশলের ভাষা, আজকাল আমরা যাকে আউধের ভাষা বলি। মাগধী প্রাকৃত ও মাগধী অপভ্রংশ যুগ-যুগ ধরে সাহিত্যের পাশ কাটিয়ে গিয়েছে। ফলে বহু কাল ধরে তা দেহাতি বুলি ও জেনানা বুলি রূপেই বিরাজ করছিল; শেষটা বাঙ্গালায় এসে তা সাহিত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১২

এই মাগধী ভাষা বহু কাল যাবত আর্যাবর্তের প্রাচ্য ভাষা অর্থাৎ পূর্ব অঞ্চলের ভাষা বলে পরিচিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্‌ৎ সাং খ্রিস্টীয় সপ্তম

শতাব্দীতে নিজ কানে শুনে গিয়েছেন যে, বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা এই তিন সুবায় একই ভাষা প্রচলিত ছিল।

শ্রীমান্ সুনীতিকুমার পুরনো দলিলপত্র ঘেঁটে আবিষ্কার করেছেন যে, খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে বঙ্গভাষা বেহারী ভাষা থেকে পৃথক হয় এবং সেই শুভক্ষণে সে তার স্বাতন্ত্র্য লাভ করে; আর এত দিনে সে তার স্বরাজ্য লাভ করেছে। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গভাষা সেকেলে মহারাষ্ট্রী ভাষার মতো পদ্যের দখলেই ছিল। মাত্র গত শতাব্দীতে গদ্য তাকে জবর দখল করে নিয়েছে। সংক্ষেপে আমাদের ভাষার বয়েস হাজার বৎসর, আমাদের গদ্যসাহিত্যের বয়েস একশো বছর। এই তো হচ্ছে তার উৎপত্তির বিবরণ।

এখন তার প্রকৃতির পরিচয় নেওয়া যাক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা আবিষ্কার করেছিলেন যে, দেশভাষা মাত্রই মিশ্র ভাষা, কেননা, সে সব ভাষা তিনটি উপাদানে গঠিত। সে তিনটি উপাদান তৎসম শব্দ, তদ্ভব শব্দ ও দেশি শব্দ। যে-সব সংস্কৃত শব্দ আমাদের ভাষায় স্বরূপে বিরাজ করছে, তারাই তৎসম, যথা 'বিবাহ'; যাদের চেহারা ফিরেছে, তারাই তদ্ভব, যথা 'বিয়ে'; আর যাদের কুল-শীল জ্ঞাতিগোত্র জানা নেই, তারাই দেশি। আমরা আজ দেখতে পাই, এ তিন ছাড়া অনেক বিদেশি শব্দও বাঙ্গালার অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে। শ্রীমান্ সুনীতিকুমার গণনা করে দেখেছেন যে, আমাদের ভাষার অন্তরে অন্তত ২ হাজার ৫ শত ফার্সি শব্দ আর শ-দুয়েক য়ুরোপীয় শব্দ বেমালুম ঢুকে গিয়েছে। এতে যদি সে ভাষা যবনদোষে দুষ্ট হয়ে থাকে, তাকে সে দোষ হতে মুক্ত করবার কোন উপায় নেই। ভারতচন্দ্র বলেছেন, 'অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল'; আমাদেরও তাই করতে হচ্ছে এবং হবে। সঙ্গীতের ভাষায় মিশ্র রাগিণীকে বলে জংলা। বঙ্গ-ভাষা যদি জংলা ভাষা হয় তো আমাদের ঐ জংলারই চর্চা করতে হবে।

১৩

আমরা ভাষা নিয়ে পূর্বে যে-বাদানুবাদ করেছি, তা আসলে শব্দঘটিত কলহ। শুদ্ধি-বাতিকগ্রস্ত সাহিত্যিকরা চান যে সাহিত্যের ভাষা থেকে প্রথমত দেশি-বিদেশি শব্দসমূহকে বহিষ্কৃত করা হোক, তারপর যত দূর সম্ভব তদ্ভব শব্দ-গুলিকে তৎসম করা হোক; তা হলেই তার লুপ্ত পবিত্রতা পুনরুদ্ধার করা হবে। কারও পক্ষে 'জুতো-খাওয়া'টা অবশ্য লজ্জার বিষয়, কিন্তু 'বিনামা ভক্ষণ'টি কী হিসাবে সাধুজনোচিত, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। আর তদ্ভবকে তৎসম করা অসাধ্য। এত বড় গুণী কি কেউ আছেন, যিনি 'বামন'কে ব্রাহ্মণ করতে পারেন, আর 'বোষ্টম'কে বৈষ্ণব? আসল কথা এই যে, আমরা যদি এই অসাধ্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করি, তা হলে আমরা বঙ্গ-সরস্বতীকে কাঙাল করব। একটা উদাহরণ

নেওয়া যাক। 'বন্ধু, বঁধু ও ইয়ার', এ তিনের রূঢ়ি অর্থ একই, অথচ এ তিনের অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এর কোনটিকে বাদ দেবার যো নেই, কিংবা এর একটির স্থানে আর-একটি বসাবার যো নেই। শুনতে পাই যে, কোমল গান্ধার সুরটি অতিশয় শ্রুতিমধুর। কিন্তু যেখানে 'পা' লাগানো উচিত, সেখানে কোমল 'গা' লাগালে সুর যাদৃশ সদ্‌গতি লাভ করে, যেখানে 'বন্ধু' বসবে, সেখানে 'ইয়াব' বসালে ভাষাও তেমনই সদ্‌গতি লাভ করে। সুতরাং সাহিত্যিকদের ছুঁতমার্গ পরিহার করবার পরামর্শ আমি নির্ভয়ে দিতে পারি। শুনতে পাই, হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা দূর করতে পারলেই আমরা স্বরাট হয়ে উঠব। এ মত কত দূর সত্য জানিনে, কিন্তু বঙ্গভাষায় অস্পৃশ্যতার চর্চা করলে বঙ্গ-সরস্বতী তার স্বরাজ্য হারিয়ে বসবে, সে বিষয়ে লেশ মাত্র সন্দেহ নেই। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে, শব্দের কুল-বিচার না করে তার অর্থবিচার করাই প্রাচীন পণ্ডিতদের অনুমত। ভারতচন্দ্র বলেছেন যে,

"প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে।
যে হোক্ সে হোক্ ভাষা কাব্য-রস লয়ে।।"

ভারতচন্দ্রের এ কথা যে সত্য, তার প্রমাণ ভোজরাজ বলেছেন,

"সংস্কৃতে নৈব কোঽপ্যর্থঃ প্রাকৃতে নৈব চাপরঃ।
শক্যো বাচয়িতুং কশ্চিদপভ্রংশেন বা পুনঃ।।"

আর ভোজরাজের চাইতেও অনেক প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী বলেছেন,

"তদেতৎ বাঙ্‌ময়ং ভূয়ঃ সংস্কৃতং প্রাকৃতং তথা।
অপভ্রংশশ্চ মিশ্রঞ্চেত্যাহুরার্য্যা চতুর্বিধম্।।"

এ স্থলে আপনাদের আর একটি বার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বঙ্গ-সাহিত্যের, তথা বঙ্গ-ভাষার অতীত এমন লম্বাও নয়, বড়ও নয় যে, সেই অতীত গৌরব-কাহিনী শুনে আর বলে আমরা দিন কাটিয়ে দিতে পারি। আমার বিশ্বাস, আমাদের সাহিত্য তার গৌরব লাভ করবে ভবিষ্যতে। অতীত আমাদের কাছে পড়ে পাওয়া জিনিস— ভবিষ্যৎ কিন্তু আমাদের নিজ-হাতেই গড়ে তুলতে হবে। লেখকরা সমাজের আনুকূল্য লাভ না করলে এ ব্রত উদ্‌যাপন করতে সমর্থ হবেন না। আর সে আনুকূল্য যে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করবার আশা করতে পারি, তাব প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সভা।

১৪

আমি এতক্ষণ ধরে আপনাদের কাছে ভাষার বিষয় যে বক্তৃতা করলুম, তার কারণ মানুষের ভাষা তার মনের পরিচয় দেয়। আমরা যাকে ভাষার উন্নতি-অবনতি বলি, তা মনের উন্নতি-অবনতির বাহ্য নিদর্শন মাত্র। কোন জাতির ভাষা যখন নবরূপ

ধারণ করে, তখন বুঝতে হবে যে, সে জাতির মনও নব কলেবর ধারণ করেছে। তা ছাড়া ভাষার আলোচনা করা সহজ। ভাষা ভাবের স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম শরীর নয়; আর সকলেই জানেন যে, পৃথিবীর সব জিনিসের স্থূল দেহ নিয়েই নাড়াচাড়া করা সহজ, কারণ তা ধরাছোঁয়ার বস্তু। কোন পদার্থের সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, মনোগ্রাহ্য। তাই কাব্যবস্তু কী, তার বিচার করতে হলে দর্শনের রাজ্যে ঢুকতে হয়। এ ক্ষেত্রে সে আলোচনায় হস্তক্ষেপ করা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা হবে; কারণ আমি এ সভার দার্শনিক শাখার সভাপতি নই। আর যদি বিদ্যা দেখাবার লোভে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তা হলেও ধৈর্য ধরে আপনারা তা শুনতে পারবেন না। বাজারে গুজব এই যে, হিন্দু মাত্রেই দার্শনিক। যদি এ কথা সত্য হয়, তা হলে তার অর্থ আমরা জাতকে জাত স্বভাব-দার্শনিক, স-তর্ক দার্শনিক নই। কিন্তু এ যুগের দর্শনের টানা-পড়েন দুই সমান তর্কে বোনা।

আপনারা বোধ হয় জানেন যে, এ কালে আমরা যাকে সাহিত্য বলি, সংস্কৃত ভাষায় তার নাম ছিল কাব্য। এই 'সাহিত্য' শব্দ বাঙ্গালায় কোথা থেকে এল, জানিনে। ও-শব্দ সম্ভবত সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক গ্রন্থ সাহিত্য-দর্পণের মলাট থেকে উড়ে এসে বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তরে জুড়ে বসেছে।

কাব্য ও সাহিত্য, এ দুটি শব্দের যে শুধু নামের প্রভেদ আছে তা-ই নয়, ও-দুয়ের অর্থেরও বিস্তর প্রভেদ আছে। কাব্যের চাইতে সাহিত্যের এলাকা ঢের বেশি বিস্তৃত। কাব্য বলতে বোঝায় শুধু কবিতা ও আখ্যায়িকা। সাহিত্য বলতে আমরা ইতিহাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানা রকমের রচনা বুঝি। অবশ্য গল্প ও কবিতা আজও সাহিত্যের অন্তর্ভূত হয়ে রয়েছে; শুধু যে রয়েছে, তা-ই নয়, কবিতা না হোক, গল্প আজ সাহিত্যরাজ্যের অনেকখানি অংশ অধিকার করেছে। পৃথিবীর সকল লিখিয়ে দেশেই দেখা যায় যে, গল্প-সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার দিন-দিন শুধু বেড়েই চলেছে; সুতরাং খুব সম্ভব, তা বাঙ্গালা দেশেও কালক্রমে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হয়ে উঠবে।

১৫

এই বিপুল পৃথিবী ও নিরবধি কালের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন, দেখতে পাবেন যে, যাঁরা সাহিত্যজগতের মহাপুরুষ বলে মানবসমাজে গণ্য হয়েছেন, তাঁরা সকলেই হয় কবি, নয় গল্প-রচয়িতা; আর সেই ব্যক্তিকেই আমরা মহাকবি বলি, যিনি একাধারে ও-দুই।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, এ যুগে কাব্য সম্বন্ধে একটা কু-সংস্কারের পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায়। যাঁরা নিজেদের কাজের লোক বলে মনে করেন, অথবা তা-ই বলে প্রমাণ করতে চান, তাঁরা ফাঁক পেলেই বলেন

যে—'আমরা কবিতা-ফবিতা বুঝিনে।' সম্ভবত তাঁরা সত্য কথাই বলেন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সকল সত্য প্রচার করা তো মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। মানুষ সেই ভাবেই মানুষের কাছে আত্মপরিচয় দিতে উৎসুক, যাতে তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেওয়া হয়। সুতরাং 'আমি কবিতা বুঝিনে'— এ কথা অহঙ্কারের সুরেই বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বক্তা 'কবিতা বুঝিনে', এই কথার দ্বারা প্রমাণ করতে চান, তিনি কাজ বোঝেন; যেমন অনেকে 'বাঙ্গালা ভালো জানিনে', এ কথা বলেন শুধু এই প্রমাণ করতে যে, তিনি ইংরাজি খুব ভালো জানেন। উভয়েই এরূপ উক্তির দ্বারা সমান সুবিবেচনার পরিচয় দেন। বলা বাহুল্য, কোন বিষয়ে অক্ষমতা অপর কোন বিষয়ে ক্ষমতার পরিচায়ক নয়। উপরি উক্ত কু-সংস্কারের মূলে আছে এই ধারণা যে, কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোন সম্বন্ধ নেই। এ কথা সত্য হত, যদি জীবন মনের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হত। তা যে নয়, তা সকলেই জানেন। আর মন অর্থ যে শুধু ব্যবহারিক মন নয়, তার প্রমাণ, কর্ম দিয়ে আমরা সকল জীবন ভরাট করে দিতে পারি, কিন্তু সমগ্র মন পূর্ণ করতে পারিনে; তার অনেকটা শূন্য থেকে যায়। মানব-মনের সকল ক্রিয়াশক্তি তার সংসার-বাসনার দ্বারা গণ্ডিবদ্ধ নয়। তা যদি হত, তা হলে মানবসমাজে ধর্ম বলেও কোন জিনিসের সৃষ্টি হত না। বিষয়ে নির্লিপ্ত এবং দৈনন্দিন সাংসারিক ভাবনা থেকে মুক্ত মানবী শক্তির লীলাই আর্ট, ধর্ম, কাব্য প্রভৃতি রূপে প্রকাশ পায়। আমরা প্রতি জনেই এ জাতীয় সৃষ্টির কর্তা না হই, ভোক্তা তো বটেই। কাব্য মনের এই অতিরিক্ত ও মুক্ত অংশেরই খোরাক। সে অংশটা অনেক কল্পনা, স্বপ্ন দিয়ে ভরিয়ে রাখতে হয়। যাঁরা মানব-মনের সেই সব অস্পষ্ট ও অনিত্য কল্পনাকে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে পারেন, তাঁরাই কবি।

আর যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, জীবনের সঙ্গে কাব্যের কোনই সম্বন্ধ নেই, তা হলে জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদের দৈনিক কর্মজীবন কি এতই সুন্দর, এতই মনোরম ও এতই প্রিয় যে, আমরা এক দণ্ডের জন্যও তা ভুলে থাকতে পারিনে? কাব্যের আর কোন গুণ না থাকুক, অন্তত এই মহাগুণ আছে যে, তা অন্তত দু'দণ্ডের জন্যও আমাদের কর্মক্লিষ্ট জীবনের ভাবনা ভুলিয়ে দিতে পারে।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা মহা লোকহিতৈষী; সমাজের অর্থাৎ পরের কীসে উপকার হয়, সেই ভাবনাতেই তাঁরা মশগুল। যে-সাহিত্য সমাজের ধরা-ছোঁয়ার মতো কাজে লাগে, তদতিরিক্ত সাহিত্যকে তাঁরা অবজ্ঞার চক্ষুতে দেখেন। সকলেই জানেন যে, তেল নামক পদার্থটা সমাজের বহুতর কাজে লাগে, যথা— খেতে, মাখতে, কল চালাতে, চাকায় দিতে— এমনকী, progress-এর চাকাতেও। তাই এঁরা কবিদের সমাজের ঘানিতে জুড়ে দিতে চান আর তাতে যে গররাজি হয়, তাকে সৌখিন, বিলাসী, অলস, অকর্মণ্য ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্ট

করেন। এঁদের কথার উত্তর দেওয়া বৃথা, কেননা জনগণ সে কথা কানে তুলবে না। কারণ, তেল আমাদের সকলেরই চাই; সুতরাং তা যোগানো যে মহৎ কার্য, সে বিষয়ে তো আর সন্দেহ নেই।

তবে সামাজিক জীবনের উপর কাব্যের প্রভাব যে কী, তা আমাদের জীবনের উপর রামায়ণ ও মহাভারত নামক দু'খানি কাব্যের প্রভাবের বিষয় চিন্তা করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন।

সত্য কথা এই যে, আমাদের স্পষ্ট ইচ্ছা ও ব্যক্ত বাসনাই আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে। মানুষের অসাংসারিক মনই মানুষকে মানুষের সঙ্গে এক সূত্রে আবদ্ধ করে। আমাদের জীবনের মূলে যা আছে, তা তেল নয়— রস। জীবনের এই মূল ধাতু নিয়েই কবির কারবার। বঙ্গসাহিত্য কাব্যে যে অপূর্ব গৌরবান্বিত হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ বাঙ্গালার রবি আজ সমগ্র সভ্য জগৎকে উদ্ভাসিত করেছে।

১৬

আমি এখন বঙ্গ-সাহিত্যের যথার্থ কাব্যাংশের কথা ছেড়ে দিয়ে তার অপরাংশের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। বঙ্গ-সাহিত্য শুধু উঁচু দিকে বাড়ছে না, সেই সঙ্গে তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হচ্ছে। এ ভাষায় বহু লোক আজ ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। আজকের দিনে দেশের ইতিহাসের পরিচয় লাভ করতে হলে আমাদের আর পরের ভাষার দ্বারস্থ হতে হয় না, আমি অবশ্য এ কথা বলতে চাইনে যে, ইতিমধ্যেই আমাদের দেশে হেরোডোটাস, থুসিডিডিস, লিভি, ট্যাসিটাস প্রভৃতির আবির্ভাব হয়েছে। আমার বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালিতে যখন ইতিহাস রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তখন ভবিষ্যতে বাঙ্গালায় নব গিবন-মমসেনের জন্মের আশা আমরা করতে পারি।

য়ুরোপে essay নামক এক শ্রেণীর সাহিত্য আছে, যার বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার ইত্যাদি। এ শ্রেণীর সাহিত্যও বাঙ্গালাভাষায় স্থান পেয়েছে। আমাদের রচিত essay প্রভৃতির মূল্য যে কী, সে প্রশ্নের উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ। যদি কালক্রমে সে সব বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হয়, তা হলেও বলতে হবে যে, সে সব লেখা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। কারণ, এই সব লেখাই এ সত্যের দলিল যে আমাদের মন আজ সজাগ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের মুখও ফুটেছে। বাঙ্গালির আজ অনেক বিষয়ে অনেক কথা বলবার আছে, এবং সে কথা তারা স্পষ্ট করে বলতে শিখেছে। মনের বহু অব্যক্ত ভাব আজ ভাষায় ব্যক্ত হয়ে উঠেছে।

১৭

যাকে মানুষ কাজের কথা বলে, তা-ও সাহিত্যের বিষয়ীভূত হয়। ধরুন, এই পলিটিকসের কথা। আজকের দিনে অনেকের বিশ্বাস এই যে, এর চাইতে বড় কাজের কথা ভূভারতে নেই। বাঢ়ম্! কিন্তু য়ুরোপীয় সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে, দু'খানি সাহিত্যগ্রন্থ যুগ-যুগ ধরে সে দেশের পলিটিকাল মনের উপর প্রভুত্ব করেছে। মাকিয়াভেলির Prince এবং Rousseau's Social Contract হচ্ছে সে ভূভাগের পলিটিকাল চিন্তার পূর্ব-মীমাংসা আর উত্তর-মীমাংসা। গত দু'শো বৎসরেব ভিতর য়ুরোপে কম করেও দু'লক্ষ পলিটিকসের গ্রন্থ জন্ম-গ্রহণ করেছে; কিন্তু সে সব গ্রন্থই ও-দুখানি বইয়ের হয় অনুবাদ, নয় প্রতিবাদ— আর না হয় তো ও-দুই মতবাদের একটা মীমাংসা মাত্র। এর কারণ কী?— কারণ এই যে, মাকিয়াভেলি ও রুশো, উভয়েই মানুষের পলিটিকাল মনের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মর্ম উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং যা আপাতদৃষ্টিতে কাজের কথা মাত্র, তা তাঁদের কাছে মানব-মনের চিরন্তন ভাবের কথা হয়ে উঠেছে। যাঁর কথা কর্মের অন্তর্নিহিত ধর্মের সন্ধান আমাদের দেয়, তাঁর কথাই অমরত্ব লাভ করে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, পলিটিকসের কথা আমাদের মুখের কথাই থেকে যাবে, প্রাণের কথা হবে না, যত দিন না তা বঙ্গ-সাহিত্যের অন্তর্ভূত হয়। কাজের কথা জ্ঞানের দ্বারা, পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির দ্বারা পরিষ্কৃত ও হৃদয়-রাগে রঞ্জিত না হলে তা সাহিত্যে স্থান পায় না। পরের কাছ থেকে ধার করা মনোভাব আমাদের শুধু উত্তেজিত করতে পারবে, কিন্তু আমাদের আত্মশক্তি প্রস্ফুটিত করতে পারবে না, যত দিন না সে ভাবকে অন্তরের বকযন্ত্রে চুঁইয়ে আমরা আমাদের মনের রক্তমাংসে পরিণত করতে পারি। যে-অন্তর্গূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বলে আমরা পর-মনোভাবকে অন্তরঙ্গ করতে পারব, সেই প্রক্রিয়ার ফলে এ বিষয়ে নব সাহিত্যের সৃষ্টি হবে। পলিটিকস যে কবে বঙ্গ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হবে, তা বলা কঠিন। কারণ, তার আগে তা বঙ্গভাষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই। ও-বস্তু আজও সম্পূর্ণ ইংরাজির দখলে। এ দেশের পলিটিকসকে মনের ধনে পরিণত করতে হলে তাকে এই পর-ভাষার অধীনতা থেকে মুক্ত করতে হবে। যত দিন আমরা তা করতে না পারি, তত দিন তা খবরের কাগজের দখলেই থেকে যাবে, অর্থাৎ তা হবে যুগপৎ অনুকরণ ও অনুবাদ। সংক্ষেপে জ্ঞানমার্গের ও কর্মমার্গের সকল বিষয়ই আমাদের ভাষার অন্তর্ভূত করতে হবে, নচেৎ বঙ্গ-সাহিত্য সম্পূর্ণ আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হবে না।

১৮

জর্মান দেশের বর্তমান যুগের সুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ ফ্রয়েড আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষের যথার্থ মনের কথা তার সজ্ঞান মনের কথা নয়; সে কথা তার মনের

গোপন কথা। আর সে কথা ধরা পড়ে তার স্বপ্নে, তার জ্ঞানমূলক কর্মে নয়। কথাটা শুনতে যতটা নতুন শোনায়, আসলে কিন্তু ততটা নতুন নয়। যুগ-যুগ ধরে বহু লোকের মনে এ সত্যের একটা অস্পষ্ট ধারণা যে ছিল, তার পরিচয় বিশ্ব-সাহিত্যে পাওয়া যায়। সে যা-ই হোক, ফ্রয়েডের মত যে মূলত সত্য, সে বিষয়ে য়ুরোপের বর্তমান দার্শনিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই।

যেমন ব্যক্তিবিশেষের, তেমনই জাতিবিশেষেরও যথার্থ মনের কথা তার কাব্য থেকেই জানা যায়; কারণ, কাব্য হচ্ছে তার কল্পনার সৃষ্টি— ভাষান্তরে তার দিবাস্বপ্নের ভাষায় গড়া প্রত্যক্ষ মূর্তি। আমরা প্রত্যেকেই যখন স্বপ্ন দেখি, তখন আমাদের সুষুপ্ত মন কাব্য রচনা করে। সে ক্ষণস্থায়ী ও অস্পষ্ট কাব্যের সঙ্গে সাহিত্যের কাব্যের প্রভেদ এই যে, এ কাব্য সুস্পষ্ট আর চিরস্থায়ী।

বাঙ্গালির মনের বিশেষ প্রকৃতি ও গতির যদি পরিচয় নিতে হয় তো তা নিতে হবে বাঙ্গালির রচিত গল্প ও গান থেকে। আজকের দিনে এলিজাবেথের যুগের ইংরাজি মনের সন্ধান জানবার জন্য আমরা যেমন Bacon-এর দ্বারস্থ হইনে, হই Shakespeare-এর; ভবিষ্যতে লোক তেমনই অতীত বাঙ্গালি-মনের পরিচয় লাভ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হবে, এ যুগের কোন জ্ঞানীর শরণাপন্ন হবে না। আবার আমরাও যদি আমাদের জাতের ভবিষ্যৎ মানসিক প্রকৃতির বিষয়ে কৌতূহলী হই. তা হলেও আমাদের বর্তমান সাহিত্যের প্রবৃদ্ধ নব-ধারার দিকে নজর দিতে হবে।

১৯

আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই নজরে পড়ে যে, এ যুগে যা অপর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মাচ্ছে, তা হচ্ছে গল্প। আমি পূর্বেই বলেছি যে, যুগধর্ম অনুসারে পৃথিবীর সাহিত্য-রাজ্য এ যুগে গল্পের অধিকারে আসছে। এ সব গল্পের গুণ বিচার না করেও এ কথা বলা যায় যে, এ ব্যাপার আমাদের আশার কথা। যে-জমিতে ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সে জমি যে উর্বর, সে বিষয়ে তো আর সন্দেহ নেই! এই গল্প-সাহিত্যের প্রয়োজনাতীত উৎপত্তিই প্রমাণ যে, বাঙ্গালির মনের জমি দিন-দিন বেশি উর্বর হয়ে উঠছে।

এই গল্প-সাহিতের প্রতিপত্তি দেখে অনেকে ভয় পান। তাঁদের ধারণা যে, গল্প-সাহিত্যের স্ফূর্তি সৎ সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকর। আগাছার উপদ্রবে যেমন ভালো গাছ মারা যায়, তেমনই সাহিত্যের এই আগাছা উঁচুদরের সাহিত্য বলে যদি কোন সাহিত্য থাকে, তো কোন রূপ পারিপার্শ্বিক নীচু সাহিত্য তার বিনাশসাধন করতে পারবে না। যে-সাহিত্য সকল বাধা অতিক্রম করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না ও মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে না, তা উঁচুদরের সাহিত্য নয়।

গল্প-সাহিত্যের যে অনেকের কাছে যথোচিত মান্য নেই, তার একটি কারণ এই যে, অনেকের বিশ্বাস, ও-শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করা অতি সহজ। ঠুংরি যে সঙ্গীত-রাজ্যে উচ্চপদ লাভ করেনি, তারও কারণ এই যে, অনেকের ধারণা, ও-গান গাওয়া অতি সহজ; কারণ, ঠুংরি শেখবার জন্য তাদৃশ কঠিন পরিশ্রম করতে হয় না, যতটা করতে হয় ধ্রুপদ শিক্ষা করবার জন্য। কথা সত্য, কিন্তু সঙ্গীত বা সাহিত্য এর কোনটিরই শ্রেষ্ঠত্ব, কে কতটা মেহন্নত করেছে, তার উপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে রচয়িতার স্বাভাবিক ক্ষমতার উপর, শাস্ত্রে যাকে বলে প্রাক্তন সংস্কার, তারই সদ্ভাবের উপর। সঙ্গীতপ্রাণ শ্রোতা মাত্রেই জানে যে, যথার্থ ঠুংরি শুধু সেই গাইতে পারে— যার ভগবদ্দত্ত গলা আছে, আর সেই সঙ্গে আছে সুরেলা কান ও সুরেলা প্রাণ। লোককে মেরেপিটে হয়তো চলনসই অর্থাৎ অচল ধ্রুপদী বানানো যেতে পারে, কিন্তু ও-উপায়ে ঠুংরি-গায়ক বানানো যায় না। ও-বস্তু যেমন-তেমন করে গাওয়া যেমন সহজ, ভালো করে গাওয়া তেমনই কঠিন।

পৃথিবীর সাহিত্যে গল্পের প্রাচুর্য দেখেই লোকের মনে এ ভুল ধারণা জন্মেছে, এবং তার ফলে অনেক লেখকও স্বধর্মভ্রষ্ট হয়েছেন। যিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখতে পারেন, তিনি তা না লিখে যে নিকৃষ্ট গল্প লিখছেন, অর্থাৎ গল্প-সাহিত্যের শরৎচন্দ্র হতে গিয়ে নষ্টচন্দ্র হচ্ছেন,— এর দৃষ্টান্ত বঙ্গ-সাহিত্যে বিরল নয়। কথায় বলে, 'গলা নেই গান গায় মনের আনন্দে।' এ রূপ আনন্দধ্বনিও বাঙ্গালায় নিত্য শোনা যায় এবং সে ধ্বনি অবশ্য শ্রোতার আনন্দবর্ধন করে না।

এই সব কারণে আমি বঙ্গ-সাহিত্যের তরফ থেকে এ দাবি করতে পারিনে যে, আমাদের মাসিকপত্রে মাস-মাস যত গল্প বিকশিত হয়, তা সবই কাব্য-কুসুম। তার বেশির ভাগই কাগজের ফুল, অর্থাৎ তাতে প্রাণ নেই, মন নেই, আর সম্ভবত এ জাতীয় অনেক ফুল বিলেতি কাগজ কেটে বানানো। তবে পৃথিবীর কোন্ সাহিত্যের এই একই অবস্থা নয়? আমার বিশ্বাস, সকল সাহিত্যেই অমূল্য কাব্যের সংখ্যা অতি কম, আর যার কোন মূল্য নেই, তাই অসংখ্য। অসাধারণকে সাধারণ করা তেমনই অসম্ভব, সাধারণকে অসাধারণ করা যেমন অসম্ভব।

২০

এ সত্ত্বেও আমি এই গল্প-সাহিত্যের আতিশয্য বঙ্গ-সাহিত্যের একটা সুলক্ষণ বলে মনে করি। দশে মিলে যে-জমি তৈরি করে যাচ্ছেন, তার উপরেই ভবিষ্যতে কাব্যের যথার্থ ফুল ফুটবে। আজকের দিনে বহু লেখকের রচিত গল্প যে কাব্য নয়, তার কারণ তাঁদের কল্পনা তেমন পরিস্ফুট ও পরিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু এই নব সাহিত্যকে আর এক হিসাবে দেখা যেতে পারে। গল্প-সাহিত্য থেকে জাতির নব মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যদি এই সাহিত্যকে আমাদের মনের শুধু

দলিল হিসেবে দেখি, তা হলে দেখতে পাই যে, এর অন্তরে একটি নূতন আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। যে-আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। আমাদের জীবন নানা প্রকার চিরাগত আচার ও সংস্কারে বদ্ধ। বাঁধাধরা আচার-বিচারের হাত থেকে মুক্তিলাভের কল্পনাই এই নব-সাহিত্যের মূল কল্পনা। এ সাহিত্য আকারে কতকটা বস্তুতান্ত্রিক হলেও, বাস্তব জীবনের প্রতিকৃতি নয়। কেননা, নব-সাহিত্যের কল্পনা বাস্তব জীবনের epiphenomenon নয়, তার থেকে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ উড়ো কল্পনা। যে-কল্পনার ভিত্তি জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা কখনও কাব্যের সামগ্রী হতে পারে না। কিন্তু আমাদের যুবকরা আজ যে-স্বপ্ন নিজেরা দেখছেন, সে স্বপ্ন তাঁরা বহু লোককে দেখাচ্ছেন। ফলে জাতির মন এই সব নূতন স্বপ্নে ভরে উঠবে। এর ফল আমাদের সামাজিক জীবনের উপর যা-ই হোক, আমাদের মানসিক জীবনের সুর এক পর্দা চড়িয়ে দেবে। যারা সামাজিক জীবনের উপর সাহিত্যের ফল সু কি কু, তা-ই বিচার করতে যান, তাঁরা সামাজিক লোক ভবিষ্যতে বেশি সুখী হবে কি দুঃখী হবে, তারই হিসেব করতে ব্যস্ত। এ ভাবনা সম্পূর্ণ বৃথা। কারণ, সুখ-দুঃখ পৃথিবীতে চিরকাল ছিল, আজও আছে এবং চিরকাল থাকবে। বদল হয় শুধু তার নামরূপের। সুখ-দুঃখ মনের জিনিস এবং মনই প্রতি যুগে তার বিভিন্ন রূপ দেবে। সে যা-ই হোক, সাহিত্যের স্বাভাবিক স্ফূর্তি নষ্ট করে তার স্বাস্থ্যবক্ষার চেষ্টা কত দূর যুক্তিসঙ্গত, তা আপনারাই বিবেচনা করবেন।

২১

আমি এতক্ষণ ধরে আপনাদের কাছে যে বাগ্‌বিস্তার করলুম, তার ভিতর হয়তো কোন সার কথা নেই। আমি এ সভায় কোন নব-বাণী ঘোষণা করবার জন্য উপস্থিত হইনি, এসেছি শুধু আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে এবং সেই উপলক্ষে আপনাদের পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে। সুতরাং আমার কথা যথা-সাধ্য আলাপের অনুরূপ করতে চেষ্টা করেছি। যদি অনেক বাজে কথা বলে থাকি তো সে প্রগল্‌ভতা আপনারা নিজগুণে মার্জনা করবেন।

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে, সাহিত্যের কথা সুহৃৎ-সম্মিত বাণী, প্রভুসম্মিত বাণী নয়। এ মত আমি চিরকালই প্রসন্ন মনে গ্রাহ্য করে এসেছি। প্রভুসম্মিত বাণী অর্থাৎ আদেশই সংক্ষিপ্ত হয়। আজ্ঞা প্রচার করবার অধিকার শুধু ধর্মগুরুদের ও রাজপুরুষদেরই আছে। যারা লোকমান্যও নয়, রাজমান্যও নয়, তাদের অর্থাৎ আমাদের মতো সাহিত্যিকদের সে অধিকার নেই। তাই আমরা আমাদের বাণী এমন কোন মন্ত্রাকারে প্রকটিত করতে পারিনে, যে-মন্ত্র জপ করে লোক মোক্ষলাভ করবে; এমন কোন সূত্রাকারে পরিণত করতে পারিনে, যে-সূত্র লোক ভক্তিভরে বক্ষে ধারণ করে দ্বিজত্ব লাভ করবে।

মন্ত্র রচনা করা ও সূত্র রচনা করা হচ্ছে ধর্মপ্রচারক ও পলিটিকাল প্রচারকদের ব্যবসা। সত্য কথা এই যে, সাহিত্যজগতে কোন প্রচারক নেই এবং থাকতে পারে না। এ রাজ্যে যিনি যে-মুহূর্তে প্রচারকার্য শুরু করেন, তিনি তন্মুহূর্ত্তে সরস্বতীর রাজ্য হতে নির্বাসিত হন— স্বাধিকার প্রমত্ততার অপরাধে। এর কারণ, সাহিত্য কোন বিষয় প্রচার করে না, সব জিনিসই প্রকাশ করে। তাই পৃথিবীতে ধর্মসাহিত্য বলে এক জাতীয় সাহিত্য আছে, যা ধর্মের মন্ত্রভাগ নয়, আর পলিটিকাল সাহিত্য বলেও এক জাতীয় সাহিত্য আছে, যা পলিটিকসের যন্ত্রভাগ নয়; এ রাজ্যে প্রকাশই প্রচার, কেননা, সাহিত্য আলোকধর্মী। আর আলোর ধর্মই এই যে, তা আপনা হতেই বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

২২

বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার মনে একটা মস্ত বড় আশা আছে; সে আশা যে দুরাশা নয়, আপনাদের কাছে তা-ই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কৃতকার্য হয়েছি কি না, বলতে পারিনে। মনে রাখবেন, ভবিষ্যৎ বিষয়ের কোন বর্তমান প্রমাণ নেই। সে বিষয়ে আমাদের আশাই একমাত্র প্রমাণ।

মানুষের ভাষা একটা স্রোত, মানুষের মনও একটি স্রোত; এবং এই দুই স্রোতে মিলে যে-স্রোতের সৃষ্টি করে, তার নাম সাহিত্য-স্রোত। অবশ্য এ স্রোতের অন্তরে কখনও আসে জোয়ার, কখনও ভাটা। আমার বিশ্বাস, আমাদের সাহিত্যের অন্তরে এখন জোয়ার এসেছে। সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যের বর্তমান একটা শুভলগ্ন।

রামপ্রসাদ বলেছেন যে—

> "প্রসাদ বলে থাক ব'সে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
> (যখন) জোয়ার আসবে উজিয়ে যাবে,
> ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা।।"

ধর্মের দিক থেকে দেখতে গেলে, এ উপদেশ যে খুব বড কথা, তা আমি মানি। এ হচ্ছে ভগবানে আত্মসমর্পণের চরম উক্তি। আর দর্শনের দিক থেকে দেখতে গেলেও দেখা যায় যে, এ সত্য কথা। মানুষের আকাশ-জোড়া অহঙ্কার নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যায়, যখন সে জানতে পারে যে, মানুষের ক্ষুদ্র অহং সৃষ্টিপ্রবাহের উপরে ভাসমান খড়কুটো মাত্র। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"— সেই অনন্ত রহস্যের ভাবনায় অভিভূত হলে মানুষের সকল ক্রিয়াশক্তি একদম পঙ্গু হয়ে পড়ে। তাই মানবজীবনের কোন ব্যাপারেই রামপ্রসাদের উপদেশ গ্রাহ্য নয়, সাহিত্যিক জীবনেও নয়। মানুষকে জোয়ারের সময় ভেটিয়ে যেতে হয়, ভাটার সময়েও উজিয়ে যেতে হয়, যদি তার কোন নির্দ্দিষ্ট গম্য স্থান থাকে। আমরা যদি বঙ্গ-সাহিত্যের স্বরাজ্য লাভ করতে চাই তো আমাদের হাল ছেড়ে

দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। কে জানে কখন আবার ভাটা আসবে? বর্তমান জোয়ারের উপর বেশি ভরসা রাখা যায় না। কেননা, তা এসেছে বাইরে থেকে। আমরা যাতে এ জোয়ার চলে গেলে কাদায় না পড়ি, তার জন্য বঙ্গ-সাহিত্যে আমাদের অন্তরের জোয়ার বওয়াতে হবে। তা বওয়ানো, সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ। এ ইচ্ছা আমাদের মনে জন্মলাভ করেছে, এখন তাকে শক্তসমর্থ করবার দায়িত্ব সমগ্র বাঙ্গালি জাতির হাতে। আশা করি, এ দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা বাঙ্গালিরা উদাসীন হব না,— "কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।"

ন ব- সা হি ত্যে র আ গ ম ন

১

বহু কাল পূর্বে আমি একটি হিন্দি গান শুনি. যার কথাগুলো আজও আমার মনে আছে— যদিচ সে গান একবার ছাড়া দু'বার শোনবার সৌভাগ্য আমার অদ্যাবধি হয়নি।

সে গানের প্রথম কথা ক'টি এই—

'নয়ী আয়ি পুরানীকে দূর করো রে।'

গায়ক ছিলেন জাতে হিন্দুস্থানি এবং এতাদৃশ 'তন্‌দুরস্ত' যে, হঠাৎ দেখলে তাঁকে কুস্তিগির পালোয়ান বলে ভুল হত, মনে হত, ওস্তাদজি জীবনে ততটা গলা ভাঁজেননি— যতটা ভেঁজেছেন মুগুর; এবং তিনি এতটা ফুর্তি করে এতটা তার-স্বরে এমন ভাব বাৎলে অর্থাৎ ঘুসো পাকিয়ে 'দূর করো রে, দূর করো রে, দূর করো রে'— এ ক'টি কথা এত বার আবৃত্তি করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর স্বজাতীয় সঙ্গতী ডাইনে-বাঁয়াকে এমন নির্মম ভাবে পিটছিলেন যে, সে গান-বাজনা শুনে, হতভাগিনী পুরানীর প্রতি আমার বেজায় মায়া করছিল, যদিচ সেই সঙ্গে ব্যাপারটিতে মজাও লাগছিল।

'নয়ির' অভ্যর্থনার জন্য ওস্তাদজি নানা রকম ভালো-ভালো বন্দোবস্ত করেছিলেন। আমার যত দূর মনে পড়ে, তাঁর ঘরে ছিল 'সোনেকো থালিয়া', নিজে খাবার ও নয়ীকে খিলাবার জন্য; আর ছিল 'সোনেকো গাড়ুয়া' আর তার অন্তরে 'গঙ্গাজিকো পানি', নিজে পান করবার ও নয়ীকে 'পিলাবার' জন্য; আর ছিল 'সোনেকো খাটিয়া', পান-ভোজনান্তে নিজে শোবার ও 'নয়ী'কে শোওয়াবার জন্য।

এ সব আয়োজনের কথা শুনে বুঝতে পারলুম না, ক্ষুধা-তৃষ্ণা কার বেশি, 'নয়ী'র না ওস্তাদজির। বোধ হয়, দু'জনেরই সমান। তবে বুঝলুম যে, এ সঙ্গীতের প্রেরণা হচ্ছে ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাড়না।

সে যা-ই হোক, এই নব-দম্পতির আনন্দের কথা শুনে আমি নিরানন্দ হয়ে গেলুম— বেচারি পুরানীর দশা ভেবে। প্রথম বয়সে পরের দুঃখে কাতর হওয়া

আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সহৃদয়তা জিনিসটেও এক রকম যৌবন-সুলভ দোষ। মানুষের মন শক্ত হয় কালক্রমে— দর্শনের ফলে।

তার পর সংসারের সঙ্গে কারবার করে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যে, 'নয়ী' আসবার অথবা তাঁকে আনবার কথা উঠলেই পালোয়ান-জাতীয় লোকেরা এই বলে গোঁফে চাড়া দিয়ে গান ধরেন যে— 'পুরানীকে দূর করো রে, দূর করো রে, দূর করো রে।' এঁরা যখন ভবিষ্যতের সঙ্গে ভালোবাসায় পড়ে যান, তখন এঁরা বর্তমানের প্রতি একেবারে নির্মম হন, এবং তখন এঁরা জোর-গলায় বলেন— কারও কোন কথা শুনতে পারিনে, কেননা— 'মন-প্রাণ যাহা ছিল, দিয়ে ফেলেছি'— আগন্তুক 'নয়ী'কে। বীরপুরুষের অর্থাৎ যে-লোকের মস্তিষ্ক, muscle-এ পরিণত হয়েছে, তাকে মানুষে ভক্তি না করুক, ভয় করতে বাধ্য। এই কারণে ভয়ে-ভয়ে এই সত্যটা পাঁচ জনকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, মুখের ধমকে পুরানী দূর হয় না, অত সহজে ও 'কমলি নেহি ছোড়তা।' যে-স্বত্বে পুরানী স্বত্ববান্, সে স্বত্বের চাইতে জবর স্বত্ব পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই, আর তার নাম দখলি-স্বত্ব। পুরানীকে দূর করবার মামুলি উপায় হচ্ছে নিজে তার কাছ থেকে দূর হওয়া— চুপি চুপি— শোরহাঙ্গাম করে নয়।

২

এখন নয়ীর কথায় ফিরে আসা যাক।

কিছু কাল থেকে ভারতবর্ষে পলিটিকাল, ইকনমিক, সামাজিক ইত্যাদি বহুবিধ 'নয়ী' আসছেন। তাই 'দূর করো রে, দূর করো রে' ধ্বনিতে দেশের আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এ খবর সবাই জানেন। কারণ, এ সব 'নয়ী' আসছেন খবরের কাগজের প্রাসাদে!

সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশে আর-একটি 'নয়ী'র আগমনবার্তা ঘোষিত হচ্ছে। এ সংবাদপত্রের 'নয়ী' নয়, সাহিত্যের 'নয়ী'। সরস্বতী নাকি নতুন মূর্তি ধরে বাঙ্গালা দেশে অচিরে দেখা দেবেন। এ কথা শুনে আমি মহা উৎফুল্ল হয়েছি। কেন যে হয়েছি, বলছি।

ছেলেবেলায় একটি বৃদ্ধ বোষ্টম ভিখারির মুখে একটি গান শুনি। সে গানের প্রসাদে আমি একটা মহা শিক্ষালাভ করেছি, কেননা, আমি হচ্ছি সেই জাতের লোক— যারা আর্টের অন্তরে শুধু ফিলজফির সাক্ষাৎ পায়, প্রাণের অন্তরে শুধু জড়ের রূপ দেখতে পায়।

বৃদ্ধ আমাদের সম্বোধন করে ভাঙা গলায় গান ধরলেন—

'না খেলে গাঁজা না খেলে গুলি
ভবে এসে করলে কী?'

এ গান শুনে তখন বাল্যসুলভ চাপল্যবশত হেসে উঠেছিলুম— কারণ, তখন বুঝিনি, ও-দুটি ভৌতিক পদার্থের আধ্যাত্মিক অর্থও আছে। এখন বুঝেছি যে, ও-গান একটা মহা প্রশ্ন।— যারা ভবে এসে, কি গাঁজা কি গুলি, কোন রূপ নেশার বশীভূত হয়নি, তারা এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারে না, আর তারাই হচ্ছে বেশির ভাগ লোক।

চিত্রগুপ্তের খাতা শুধু কেরানির হাজরে বই নয়, অর্থাৎ তাতে দিনের পর দিন শুধুই present লেখা থাকে না, আমরা ভবে এসে কে কী করছি, তারও হিসেবও ও-কেতাবে থাকে। শুধু এ পৃথিবীতে present থাকবার জন্য আমরা যে-সব নিত্য কর্ম করি— যথা অন্নধ্বংস ও বংশবৃদ্ধি, তার হিসেব— চিত্রগুপ্ত জানেন না। কারণ, তাঁর কথা হচ্ছে পৃথিবীতে কারও present থাকবার কোন দরকার নেই— যদি না সে আরও কিছু উপরি কাজ করে। আর যার ঝোঁকে মানুষে এই বাজে কাজ করে, তার নাম নেশা।

এই নেশাখোরের দল আবার সবই এক নেশা করে না। কারও নেশা পলিটিকস, কারও নেশা টাকা, কারও নেশা সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি। আমি এ সকল নেশাই এস্তমাল করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ও-সব আমার ধাতে সইল না। এর কারণ, এদের কোনটা এতটা জলো যে, আমার মোটেই ধরে না, আর কোনটা বা এত মোটা যে, বেজায় ধরে, এত চেপে যে, তখন আর আমায় আমি থাকিনে। তাই আমি ভবে এসে খোশমেজাজে কিছু করে থাকি তো সে সাহিত্যরস পান, আর এ পানের ফলে যা হয়— তার নাম গোলাপি নেশা; সুতরাং আমাদের সাহিত্য-জগতে যে 'নয়ী' সাকী আসছেন, নূতন পানপাত্র ভরে নতুন কাব্যরস নিয়ে, যে-রসের অন্তরে গন্ধ থাকবে ছোট এলাচির, আর রঙ থাকবে জাফরানের, এ সুসমাচার, আমার কাছে মথি-লিখিত সুসমাচারের তুল্য। তবে সন্দেহ হয়, এ আনন্দ তো সেই জাতীয় আনন্দ নয়— যার বাঙলা নাম হচ্ছে 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল?'

৩

বঙ্গসরস্বতী যে 'নয়ী' রূপে অবতীর্ণ হচ্ছেন, তার প্রমাণই বা কী, পূর্বলক্ষণই বা কী?

'সম্ভবামি যুগে যুগে', এ হচ্ছে শুধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা নয়, ভগবতী সরস্বতীরও কথা। সরস্বতীও যুগে-যুগে নব কলেবর ধারণ করে নব বেশে ধরা-ধামে যে অবতীর্ণ হন, তা অবশ্য সকলেরই জানা আছে। কিন্তু যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আগমনের তারিখ ও ঠিকানা বলে দেননি, তখন উক্ত শ্রুতির উপর নির্ভর করে এ ভরসা পাওয়া যায় না যে, সরস্বতী ১৩৩৫ সালের পয়লা বৈশাখ তারিখে

হয় কলকাতায়, নয় ঢাকায় বৈশাখী ঝড়ের মতো লোকের কাপড়-চোপড় উড়িয়ে হু-হু শব্দে এসে পড়বেন। দৈববাণীর ধর্মই এই যে, তা আশার কথা নয়, আকাশের কথা— ভাষায় যাকে বলে ফাঁকা আওয়াজ!

সুতরাং এখন নব-সাহিত্যের আগমনের পূর্বলক্ষণগুলির দিকে নজর দেওয়া যাক। শুনতে পাচ্ছি, নব-সাহিত্যের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে নব-সমালোচনায়। যেমন রণবাদ্য শুনে বোঝা যায় যে, বিজয়ী সেনানী আসছেন। যখন তরুণের দল সুর ধরেছে— রবীন্দ্র-সাহিত্যকে 'দূর করো রে, দূর করো রে,' তখন 'নয়ী' নির্ঘাত আসছে, বঙ্গদেশ রূপে আলো করে।

এ কথা বিনা বাক্যে মেনে নেবার পক্ষে আমার মনে দুটি বাধা আছে।

যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের কান-ফাটানো সমালোচনা করছেন, তাঁরা কি সবাই তরুণ? আমি তো দেখতে পাই যে, যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি তেড়ে শিং বাঁকাচ্ছেন, তাঁদের বেশির ভাগ হচ্ছেন সেই জাতীয় সাহিত্যিক— যাঁরা শিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশেছেন। এ সমালোচনা আগন্তুক সাহিত্যের আগমনী নয়, তাঁদের স্ব-রচিত পূর্ব-সাহিত্যের গুণকীর্তন ও এক রকম সাহিত্যিক টনিকের বিজ্ঞাপন!

তারপর সাহিত্য-জগতের ইভলিউশনের ধারাই এই যে, আগে আসে সাহিত্য, তারপর তার সমালোচনা। আগে সমালোচনা দেখে তার লেজ ধরে সাহিত্য আসছে, এ রূপ অনুমান করা তদ্রূপ— আগে গাড়ি, তার টানে ঘোড়া পিছনে আসছে অনুমান করা যদ্রূপ।

তবে যদি কেউ বলেন যে, এই সমালোচনাই প্রমাণ যে, নব-সাহিত্যের সৃষ্টির ইচ্ছা তরুণদের মনে যখন জাগরূক হয়েছে, তখন তারা নব-সাহিত্য সৃষ্টি করবেই করবে— তা হলে বলি, নব-সাহিত্য নব ইচ্ছার হাত-ধরা নয়, কারণ, সাহিত্য-সৃষ্টি মানুষের ইচ্ছাধীন নয়।

'বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই?' এ আক্ষেপ কাব্যজগতে ইতঃপূর্বে বহু বংশীধারীকে করতে হয়েছে এবং অতঃপরও করতে হবে এবং এঁদের মধ্যে যাঁরা বেশি আক্ষিপ্ত, তাঁরা বাঁশি বাজল না দেখে, তাকে বাঁশ হিসেবে ব্যবহার করেন এবং বংশের উক্ত রূপ ব্যবহারকেও অনেকে সমালোচনা বলে ভুল করেন। বলা বাহুল্য, এ রূপ সমালোচনা ভবিষ্যৎ সাহিত্যের অগ্রদূত নয়, বর্তমান সাহিত্যের ভগ্নদূত।

৪

এই সব সমালোচনা পড়ে-শুনে আমার মনে হয় যে, যাঁরা জোর-গলায় নব-সাহিত্যকে আবাহন করেছেন, তাঁরা সব তরুণ পাঠক, তরুণ লেখক নয়, কারণ, যে যথার্থ লেখক, সে তো সাহিত্যসৃষ্টিই করছে, সে আবার আহ্বান করবে কাকে?

সাহিত্য তো বাইরের জিনিস নয়, যাকে নানা রূপ স্তব-স্তুতির দ্বারা ঘরে আনতে হবে। সাহিত্য-বস্তু নিজ শক্তিতে নিজের অন্তর থেকে গড়ে তুলতে হয়। সাহিত্যের স্বরাজ্য কোন দেশি-বিলেতি কমিশনের প্রসাদে পাওয়া যাবে না।

অপর পক্ষে যে পূর্বজন্মের কর্মফলে জন্মেছে শুধু পাঠক হবার জন্য, সে যদি লেখক হতে চায় তো তার সমালোচক হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। উদাহরণ স্বয়ং আমি। সমালোচক জানেন শুধু পূর্ব-সাহিত্য, সুতরাং ভবিষ্যৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী চিরকাল ভবিষ্যদ্বাণীই রয়ে যাবে।

লেখক মাত্রেরই অন্তরে অবশ্য একটি করে সমালোচক থাকেন, কিন্তু সে সমালোচকের আসল কাজ নিজের লেখার দোষ-গুণ বিচার করা, পরের লেখার দোষ-গুণ ধরা নয়! যাঁরা নিজে লিখতে পারেন না, তাঁরাই পরের লেখা কী রকম হওয়া উচিত, সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেন। যে নিজে গাইতে পারে না, সে-ই তালে-বেতালে নৃত্য করে, আর সে ব্যাপারকে বলে সঙ্গীত।

সাহিত্যে যে আজকাল গণ্ডগোল হচ্ছে, তার আর-একটি কারণ এই যে, অনেকে এমন কাব্য লেখেন, যে-কাব্য হচ্ছে বর্ণচোরা সমালোচনা। রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নীতির সংস্কার হচ্ছে যে-গল্প-সাহিত্যের প্রাণ, তা আকারে কাব্য, কিন্তু আসলে রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক প্রবন্ধ মাত্র। তাই প্রবন্ধের সঙ্গে কাব্য ঘুলিয়ে গিয়েছে। ফলে অনেক পাঠক এই ঘোলা জলকেই কাব্যরস বলে সানন্দে পান করেন। সম্ভবত পাঠক উচ্চজাতীয় সাহিত্যই চান। কারণ, দেখতে পাই, বি-রাজকে স্বরাজ করবার, সারদাকে অন্নদা করবার, বিধবাকে সধবা করবার জন্যে বকে-বকে অনেকের মুখ ব্যথা হয়ে গিয়েছে। এই থেকে আমার মনে হয় যে, সমালোচকদের দল যার আবাহন করছেন, তার নাম নব-সমাজ, নব-সাহিত্য নয়। অনেকে হয়তো মনে করেন যে, সমাজে ও সাহিত্যে কোন প্রভেদ নেই। তবে বেশির ভাগ লোক যে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে দূর করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, এ রূপ মনে করবার কোন কারণ নেই। যে-সম্প্রদায় নব-সমাজ, নব-রাজ্য গড়বার কাজে লেগেছেন অর্থাৎ যে-সম্প্রদায় আমাদের বল-বুদ্ধি-ভরসা, সে সম্প্রদায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের অস্তিত্ব বিষয়েও সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সে সম্প্রদায় লেখকও নন, পাঠকও নন, তাঁরা শুধু বক্তা ওরফে কর্মী। তাঁদের মুখে পুরানীকে দূর করবার প্রস্তাবটা হবে বিয়ের আগেই— divorce-এর প্রস্তাবের মতো।

আসল কথা, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ওরফে বঙ্গ-সাহিত্যের বিরুদ্ধে তথাকথিত বিদ্রোহ হচ্ছে, মনের বিরুদ্ধে ক্ষুধার বিদ্রোহ, বুকের বিরুদ্ধে পেটের বিদ্রোহ, এ অবশ্য সাহিত্যিক বিদ্রোহ নয়। কারণ, নব-সরস্বতী এলে সঙ্গে গোলা-ভরা ধান ও পেঁটরা-ভরা কাপড় আনবেন না। যিনি তা আনতে পারেন, তাঁর নাম লক্ষ্মী এবং এখন তিনি ঘরে বসে লক্ষ্মী মেয়ের মতো চরকা ঘোরাচ্ছেন। সে যা-ই

হোক, সরস্বতীর বেনামীতে লক্ষ্মীকে ডেকে কোন ফল নেই, ও-ডাকে সরস্বতীও আসবেন না— লক্ষ্মীও নয়। উপবাসের পর উৎসব, শিবরাত্রির পর দোল আসে, শুধু পাঁজির জগতে, পুঁথির জগতে নয়।

৫

যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, পুরনো সাহিত্যকে বধ না করলে নব-সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না, তাঁরা ভুলে যান যে, সাহিত্য অমর, তা পুরনোই হোক, নতুনই হোক। যদি রবীন্দ্র-সাহিত্য না ম'লে নব-সাহিত্য না আসে, তা হলে নব-সাহিত্য আর আসবে না, কারণ, ও-পুরনো সাহিত্যের আর মার নেই। আর যদি কেউ বলেন যে, রবি অস্ত গেলেই শশীর উদয় হবে, তা হলে তাঁদের কাছে একটা কথা নিবেদন করি। রবির আলো নিভে গেলেই যে রজনী হবে উতলা, তার কোন সম্ভাবনা নেই। নব-সাহিত্য যে-রূপ ধরেই আসুক, তা সাহিত্যই হবে, সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর তখন দেখা যাবে যে, এ নব-সাহিত্য সে সাহিত্য নয়, যার আগমন পাঁচ জনে প্রতীক্ষা করছেন। এ স্থলে একটা কথা ভরসা করে বলা যায় যে, ভবিষ্যতের কাব্যশাস্ত্র কামশাস্ত্র হবে না, আর ভবিষ্যতের কামশাস্ত্রও কাব্যশাস্ত্র হবে না, কেননা অতীতেও তা হয়নি, যদিচ একটিকে অপরটিতে রূপান্তর করবার বৃথা চেষ্টা অতীতেও করা হয়েছে। এটা সুখের বিষয়ই হোক আর দুঃখের বিষয়ই হোক, science চিরকাল science-ই থাকবে আর literature literature, যদিচ ভবিষ্যতের সাহিত্য বিজ্ঞান-পরিপুষ্ট হবে। বিজ্ঞানে পরিপুষ্ট হবে, অনুমান করছি এই কারণে যে, তা চিরকালই হয়ে এসেছে। সরস্বতী যে শুধু ত্রিকোণ পৃথিবীতেই বাস করতে পারেন, গোলাকার পৃথিবীতে পারেন না, এমন কথা বললে লোক হাসবে। বরং সত্য কথা এই যে, গোল পৃথিবীর ক্ষেত্র সরস্বতীর পক্ষে ঢের উদার।

এ কারণ যাঁরা ভয় পান যে, নব-সাহিত্য অমৃত হবে না, হবে শুধু মদিরা, তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, অমৃতেরও কি নেশা নেই, ও-বস্তু কি হাল সভ্যতার কলের জল? আর সুরার ভিতরেও কি এক ফোঁটাও অমৃত নেই? আছে শুধু হলাহল— ভাষান্তরে আলকহল?

নব-সাহিত্য যদি সত্যই সুরা হয় তো আমি বলি 'সোভান্ আল্লা'। কারণ, সে সুরায় আশা করি, আমাদের শোয়া সামাজিক মনকে ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে খাড়া করে তুলতে পারবে। এই সাহিত্য-সুরা পান করে যদি আমাদের সামাজিক মন দাঁড়িয়ে ওঠে, তা হলে তার বিশৃঙ্খল অঙ্গভঙ্গি দেখেও কেউ আবার তাকে শোয়াতে চাইবে না। মৃতের চাইতে মত্ত ঢের ভালো, কেননা, সে ধড়ফড়ে জীব।

তবে এ সুরা কোন্ জাতীয় সুরা হবে, তাই হচ্ছে ভাবনার বিষয়। লোকে বলে, গাঁজার ভেলসা নেই, কিন্তু সুরার দেদার জাতিভেদ আছে।

নব-সাহিত্য সুরা হোক, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে এ সাহিত্য-সুরা ধেনো না হলেই রক্ষে। কারণ, ধেনোর আর যতই ফয়দা থাকুক, তার গন্ধে ভূত পালায়, সে গন্ধ এত কড়া যে, গরম মসলা যোগেও তাকে নরম করবার যো নেই। বরং তাতে তাকে আরও চড়িয়ে দেওয়া হয়। রামপ্রসাদ বলেছেন, 'সুরা পান করিনে আমি সুধা খাই মা মা বলে।' কিন্তু ও-বস্তু ধেনো হলে কাব্যপিপাসু ভক্তরা তা মা-মা বলে গলাধঃকরণ করতে পারবে না; সবাইকে বাবা-বাবা বলে তা বমন করে ফেলতে হবে।

নব-সাহিত্য আসছে কি না, সে হচ্ছে বাজে ভাবনা। নব-সাহিত্য এসেছে কি না, সেইটেই হচ্ছে আসল জানবার কথা। আমার ধারণা, নব-সাহিত্য এসেছে কি না, তা তত দিন জানা যাবে না, যত দিন নব সমালোচনার জয়ঢাক না থামবে। ও-বাদ্যি থামলেই কোথায় কার বাঁশি সুরে বাজছে, তা সকলেরই কর্ণগোচর হবে, অবশ্য তাদের— যাদের সুরের কান আছে। তরুণরা কে কী গান ধরেন, তাতে কিছু যায় আসে না, মোদ্দা কথা, তা বেসুরে না হলেই হল। ধরুন, তাঁরা যদি পুরানীকে সম্বোধন করে এই বলে তান ধরেন যে, 'আমার হ'ল সুরু তোমার হ'ল সারা' তাতেও আমরা বাহবা দেব— যদি ঠিক-ঠিক জায়গায় ঠিক-ঠিক সুর লাগে, যথা— 'আমার হ'ল সুরু'তে কড়ি, আর 'তোমার হল সারা'তে কোমল, আর তাল যদি রুদ্রতাল না হয়। এ গান আমাদের সবারই কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করবে। কারণ, আমরা সবাই জানি যে, সবারই শেষ হয়, অপর পক্ষে দু'চার জনের শুধু সুরে শুরু হয়।

ক বি ও ক্রি টি ক

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত কিছু দিন পূর্বে রবীন্দ্র-পরিষদে রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য-বিচার' সম্বন্ধে একটি নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিচার করা হয়নি; রবীন্দ্রনাথ-কৃত অপরের কাব্যের বিচারের 'গুণাগুণ' বিচার করা হয়েছে। সংক্ষেপে, কবি রবীন্দ্রনাথের বিচার করা হয়নি, করা হয়েছে ক্রিটিক রবীন্দ্রনাথের।

প্রবন্ধলেখক মহাশয় এই বিচার সূত্রে দুটি মত প্রকাশ করেছেন, অর্থাৎ দুটি তর্কের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ কথা সকলেই জানেন যে, জোর করে কেউ একটা কোন মত প্রকাশ করলেই তার পিঠ-পিঠ তর্ক ওঠে— এ ক্ষেত্রেও উঠেছে। সুবোধবাবুর মতে—

১. সৃষ্টি করা আর বিচার করা, এ দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শক্তি। যিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁর বিচার করবার শক্তি কম; আর যিনি বিচার করেন, তিনি প্রায়ই সৃষ্টি করতে পারেন না।

২. রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদী (idealist), সুতরাং তিনি একমাত্র idealist সাহিত্যের মর্ম গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক (realistic) সাহিত্য তিনি উপভোগ করতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিলেও এ দুটি মত সকলে নির্বিচারে যে শিরোধার্য করতে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাই রবীন্দ্র-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আমাদের পাঁচ জনকে এই মতের বিচার করতে অনুরোধ করেছেন— আর তাঁর সে অনুরোধ আমি যথাসাধ্য রক্ষা করতে উদ্যত হয়েছি।

২

বড় কবি— ভালো ক্রিটিক হতে পারেন কি না,— এ তর্ক সব দেশে সব কালেই উঠেছে, এমনকী সেকেলে ভারতবর্ষেও উঠেছিল। আমি রাজশেখরের কাব্য-মীমাংসা থেকে গুটি-কতক ছত্র উদ্ধৃত করে দিচ্ছি— তার থেকেই দেখতে পাবেন যে তর্কটা পুরনো। আলঙ্কারিকদের মতে— "সা চ দ্বিধা কারয়িত্রী ভাবয়িত্রী চ।

কবেরুপকুর্ব্বাণা-কারয়ত্রী। ভাবকস্যো পকুর্ব্বাণা ভাবয়িত্রী। সা হি কবেঃ শ্রমমভি-প্রায়ং চ ভাবয়তি। তয়া খলু ফলিতঃ কর্ব্বোপারতরুরন্যথা সোহ্বকেসী স্যাৎ।

অস্যার্থ— 'প্রতিভা দু'রকম,— এক সৃষ্টি-শক্তি আর এক বিচার-শক্তি। এই বিচারশক্তি কবির শ্রম ও অভিপ্রায়ের ভাবনা করে। এবং তারই দ্বারা কবির ব্যাপার-তরু সফল হয়, অন্যথা তা নিষ্ফল হয়।" অর্থাৎ গ্রহণ করবার শক্তি যদি আমাদের না থাকে তো কবির দান বৃথা। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে কারয়িত্রী সে বিষয়ে তো সন্দেহ নেই; কিন্তু আমাদের অর্থাৎ স্কুলে-পড়া বাঙালিদের প্রতিভা ভাবয়িত্রী কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। এখন প্রস্তুত বিষয়ে আলঙ্কারিকদের কথা শোনা যাক।

"কঃ পুনরণয়োর্ভেদা যত কবির্ভাবয়তি ভাবকশ্চ কবি।

আচার্য্য তদাহুঃ—

প্রতিভা তারতম্যেন প্রতিষ্ঠা ভুবি ভূরিধা।

ভাবকস্তুঃ কবিপ্রায়ো ন ভজত্যধমাং দশাম্।।"

অস্যার্থ— আচ্ছা, এ দুয়ের প্রভেদ কী, কারণ কবিও ভাবক আর ভাবকও কবি। পূর্বাচার্যদের মত এই। তাই তাঁরা বলেছেন— তারতম্য অনুসারে পৃথিবীতে প্রতিভার বহুবিধ প্রতিষ্ঠা। ভাবকও প্রায়-কবি, অতএব সে অধমদশা প্রাপ্ত হয় না।

আলঙ্কারিকরা আসলে ভাবক অর্থাৎ ক্রিটিক, সুতরাং তাঁরা যে ক্রিটিকদের প্রায় কবি বলবেন, এ তো ধরা কথা।

৩

এখন সেকেলে কবির কথা শোনা যাক—

"ন ইতি কালিদাসঃ। পৃথগেব হি

কবিত্বাদ্ভাবকত্বং ভাবকত্বাচ্চ কবিত্বং। স্বরূপ ভেদাদ্বিষয়ভেদাচ্চ।

যদাহুঃ

কশ্চিদ্বাচংরচয়িতুমলং শ্রোতুমেবাহ্পরস্তাং

কল্যাণী তে মতিরুভয়বা বিস্ময়ং নস্তনোতি।

নহ্যেনকস্মিন্নতিশয়বতাং সন্নিপাতোগুণাণা

মেকঃ সুতে কনকমুপলস্তৎপরীক্ষাক্ষমোহন্য।।

অস্যার্থ— কালিদাস বলেন 'না'। কবিত্ব পৃথক আর ভাবকত্ব পৃথক। স্বরূপ-ভেদ ও বিষয়ভেদের দরুন। যেমন বলা হয়েছে, 'কেউ অমল বাক্য রচনা করতে পারে— অপরে তা শুনতে পারে। হে কল্যাণী, তোমার এই উভমতি আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করছে। এক ব্যক্তিতে নানা অতিশয় গুণের সন্নিপাত হয় না। একই সূত্রে কনক ও রত্ন গ্রথিত হয়, কিন্তু কোনটি কী তার পরীক্ষাক্ষম অপরে।

কালিদাস এ কথা কোথায় বলেছেন জানিনে, বোধ হয় কোন কল্যাণীকে compliment হিসেবে।

সে যা-ই হোক, কবিত্ব ও ভাবকত্ব এক দেহে থাকতে পারে কি না, এ আলোচনা সেকালেও করা হয়েছে এবং তার ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, ক্রিটিকরা বলেন তাঁরা প্রায়-কবি আর কালিদাস বলেছেন যে কাব্য-সৃষ্টি ও বিচার-শক্তি এক জিনিস নয়। দুটি কথাই সত্য। যাঁর অন্তরে কবিত্ব রস নেই তিনি কাব্যরসিক হতে পারেন না, অপর পক্ষে সৃষ্টিশক্তি ও বিচারশক্তির একত্র সন্নিপাত হতে পারে কি না, তার খোঁজ করতে হবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে; ফিলজফির ক্ষেত্রে নয়। একাধারে ও-দুই গুণের সন্নিপাত হতে পারে কি না, এ প্রশ্নের উত্তর দর্শন দিতে পারবে না, এমনকী Psychology নয়, কিন্তু পূর্বে কখনও হয়েছে কি না— সে খোঁজ ইতিহাসের কাছে পাওয়া যাবে। ইউরোপে গ্যেটে, Coleridge, Mathew Arnold, Swinburne সকলেই শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ critic বলেই গণ্য। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বড় কবি বলে যে কাঁচা ক্রিটিক হতে বাধ্য, এ কথা বিচার-সহ নয়।

৪

সমালোচক মহাশয় যে-দ্বিতীয় আলোচনায় আমাদের যোগ দিতে বাধ্য করছেন— সে আলোচ্য বিষয়ের যথার্থ নাম হচ্ছে কাব্য-জিজ্ঞাসা। কারণ কাব্য-বস্তু যে কী, সেইটে ধরতে পারলে— আমরা idealistic কাব্যের সঙ্গে realistic [কাব্যের] প্রভেদ যে কোথায় ও কড় গুণে, তার মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে পারব; অবশ্য এ দুয়ের যদি কোন প্রভেদ থাকে।

বলা বাহুল্য যে কাব্য-জিজ্ঞাসা হচ্ছে পুরোপুরি দার্শনিক জিজ্ঞাসা। তাই এ জিজ্ঞাসার যারা জগৎ-বিখ্যাত মীমাংসক, তাঁরা সকলেই বড় দার্শনিক, যেমন প্রাচীন গ্রিসে আরিস্টটল, নবীন ইউরোপে হেগেল আর বর্তমান ইউরোপে Croce। এঁদের কারও কথা আমরা উপেক্ষা করতে পারিনে, অপর পক্ষে কারও কথা আমরা বেদ-বাক্য বলে গ্রাহ্য করতে পারিনে।

অপর পক্ষে ভারতবর্ষেও যে-সব নব্য আলঙ্কারিকরা এ প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁরাও ছিলেন পুরোদস্তুর নৈয়ায়িক। কিন্তু অদ্যাবধি কেউই এ সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারেননি। কারণ মানুষের মন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। সুতরাং এক যুগের দর্শন আর-এক যুগে লোকের মনে একচ্ছত্র প্রভুত্ব করতে পারে না। নূতন অবস্থায় আমরা অনেক বিষয়েই নূতন মীমাংসা চাই, অথবা পুরনো মত নতুন ভাষায় ব্যক্ত করতে চাই।

ভবিষ্যতেও মানুষের মনে ফিরে ফিরতি এ জিজ্ঞাসার উদয় হবে— যেমন আজ আমাদের হয়েছে। যে-মুহূর্তে একটি নব-মীমাংসা পরিচ্ছিন্ন রূপ ধারণ করে,

তখনই মনে আবার নব-জিজ্ঞাসার উদয় হয়; কারণ তখনই তার ভুলচুক, ত্রুটি সব ধরা পড়ে। অথচ যুগে-যুগে আমাদের নব মীমাংসা চাই-ই চাই, কারণ এক-একটা মীমাংসা হচ্ছে মানুষের চির-জিজ্ঞাসার এক-একটা বিশ্রাম-স্থল। চিন্তাজগতেও খালি দৌড়ানো চলে না, মধ্যে-মধ্যে হাঁফ ছাড়তে হয়।

যিনি এ তর্ক তুলেছেন, তিনি অবশ্য এ প্রশ্নের একটা উত্তর খুঁজে পেয়েছেন বিলেতি নাটককার Bernard Shaw-এর কাছে।

সংক্ষেপে, Shaw সাহেবের মত হচ্ছে এই যে, যে-কথা সমাজ-সংস্কারের কাজে লাগে, তা-ই হচ্ছে সাহিত্য। অবশ্য সমাজ-সংস্কার কথাটা আমরা যে-অর্থে বুঝি, তাঁর কাম্য সমাজ-সংস্কারের সে অর্থ নয়। তিনি চান সমাজকে ঢেলে সাজতে, কারণ বর্তমান অবস্থায় অসংখ্য লোকের দুঃখের আর অন্ত নেই। এ যে অতি মহৎ মনোভাব তার আর সন্দেহ নেই। আর তিনি যে নাটক লিখেছেন, তার একমাত্র উদ্দেশ্য বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা যে ঘোর অব্যবস্থা সেই বিষয়ে দেশের লোককে সচেতন করা। সুতরাং Shaw সাহেবের মতে, তথাকথিত সাহিত্যের যা কিছু মূল্য আছে, তা এই সমাজ-সংস্কারের জোগাড়ি কাজ হিসেবে। তবে মানুষের social consciousness কাব্যরসের উৎস কি না, এ প্রশ্ন হচ্ছে পুরো দার্শনিক প্রশ্ন। এ প্রশ্ন তাঁর মনে কখনও উদয় হয়নি, কারণ Shaw দার্শনিক নন। ফলে তিনি idealistic কাব্য ও realistic কাব্য, উভয়েই কাব্য কি না, আর যদি তা না হয়, এ দুটির ভিতর কোন্‌টি কাব্য আর কোন্‌টি অকাব্য— সে বিষয়ে কিছু বলেননি। এমনকী reality কথাটিরই বা মানে কী ও ideality কথাটিরই বা মানে কী, তার কোনই ব্যাখ্যা দেননি। বলা বাহুল্য, এ দুটি কথাই দর্শন থেকে সাহিত্যে আমদানি করা হয়েছে। আর এ দুটি কথার বিরোধের যে-দিন চূড়ান্ত মীমাংসা পাওয়া যাবে, সে দিন দর্শনের আদালত বন্ধ হবে। কারণ আজও দেখা যায় যে, যাঁরা এর একটি না-আরেকটির ঠিক মানে জানেন, দর্শন জিনিসটে তাঁদের কাছে হাস্যাস্পদ। পূর্ণ-প্রজ্ঞ লোকের মতে সন্দেহটা মনের দুর্বলতা।

এই সুযোগে আমি একটি বড় দার্শনিকের মতামতের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চাই। Bergson কবি কি দার্শনিক, এ বিষয়ে দার্শনিক মহলে অনেক মতভেদ আছে। সত্য কথা এই যে, তিনি একাধারে দার্শনিক ও কবি। সুতরাং কাব্য-জিজ্ঞাসার তাঁর কৃত মীমাংসা আমরা উড়িয়ে দিতে পারিনে। কবি-দার্শনিকের মত সম্ভবত সত্যের কাছ ঘেঁসে যাবে।

৬

উপরন্তু, Bergson আর্ট সম্বন্ধে যে-মত প্রকাশ করেছেন— সে মতই আমি স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারি। মনোজগতে elecive affinity বলে একটা জিনিস

আছে। তাই সংক্ষেপে Bergson-এর মতের পরিচয় দিচ্ছি। সকলেই দেখতে পাবেন যে, এ মত Shaw-র মতের ঠিক উল্টো। Shaw-র মন ব্যবহারিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। আর Bergson আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষের ব্যবহারিক মন কাব্যের জন্মভূমি নয়।

Bergson-এর মতে প্রকৃতিসুন্দরী পরদানশিন। তাই অধিকাংশ লোক তাঁর প্রকৃত রূপ দেখতে পায় না। যিনি তা দেখতে পান, আর আমাদের তা দেখাতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন আর্টিস্ট।

এ পরদা শুধু বাহ্য প্রকৃতিকে নয়, আমাদের অন্তর-প্রকৃতিকেও ঢেকে রাখে আমাদের কাছ থেকে।

এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, এ পরদা বুনলে কে? Bergson বলেন, মানুষের কর্মবুদ্ধি। তাঁর মতে, জীবনের মূলে আছে কর্মবাসনা। সুতরাং আমাদের ব্যবহারিক মনের সকল চিন্তা হচ্ছে কর্মচিন্তা। কাজেই প্রকৃতির যে-অংশকে আমরা জীবন-যাত্রার কাজে খাটাতে পারিনে, সে অংশ মানুষের মনের আবডালেই পড়ে থাকে। আর আমরা যাকে সত্য ও সুন্দর বলি, তার সাক্ষাৎ অধিকাংশ লোকে চায় না বলে পায় না। আর আমরা যাকে শিব বলি, সে জিনিস মানুষের এই ব্যবহারিক ও সামাজিক মনেরই সৃষ্টি।

যদি মানুষ মাত্রেই আর্টিস্ট হত, অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সকলেরই যদি সাক্ষাৎ পরিচয় থাকত, তা হলে লোকযাত্রা বিনষ্ট হত, কারণ কর্মবুদ্ধি বাদ দিয়ে জীবনযাত্রা রক্ষা করা চলে না। Bergson-এর মতে— কর্মবুদ্ধির অভাবে মানুষ বাঁচে না, কিন্তু ও-বুদ্ধি সত্য সুন্দরের নাগাল পায় না।

৭

মানুষ একমাত্র জীবনধারণ করেই তার অন্তরের সকল প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে পারে না। সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষা মানুষ মাত্রেরই আছে। এক কথায় মানুষের পুরো মন, তার ব্যবহারিক মনের অতিরিক্ত। আমাদের দেশের সেকেলে দার্শনিকরাও আত্মাকে নিষ্ক্রিয়ই বলে গিয়েছেন।

এখন, এমন লোকও পৃথিবীতে জন্মায় যাদের মন স্বভাবতই বিষয়ে নির্লিপ্ত— আর তাদের মনের যে-অংশ বিষয়বাসনা-মুক্ত, সেই অংশে তাদের মন প্রকৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুক্ত, আর এই জাতীয় লোকরাই আর্টিস্ট। আর এই সহজ যোগের নামই intuition।

একমাত্র social consciousness-এর বশবর্তী হয়ে মানুষে বিরাট কর্মবীর হতে পারে, কিন্তু কবি হতে পারে না। কারণ কবি আসলে জীবন্মুক্ত। কবির মন কোন বিশেষ সাংসারিক প্রয়োজনের অধীন নয় বলেই সে মন ব্যবহারিক মনের হাতে

বোনা পরদার বাধামুক্ত। মানুষের ব্যবহরিক মন যে তার সত্যজ্ঞান ও সৌন্দর্য-জ্ঞানের অন্তরায়, এই হচ্ছে Bergson-এর দর্শনের মূল কথা।

Bergson-এর দর্শন কবিত্ব কি দর্শন, এ বিষয়ে দর্শন-ব্যবসায়ীদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু আর্টিস্টের মন যে সহজেই নির্লিপ্ত— সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই। এই কারণে Shaw-র কাব্য-মীমাংসা আমার কাছে একেবারেই অগ্রাহ্য, যদিও আমি তাঁর গুণ-ভক্ত। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যদি Shaw-র কাব্য-মীমাংসার অন্তর্ভুক্ত না হয়, তার কারণ Shaw-র জিজ্ঞাসা কাব্যজিজ্ঞাসা নয়, কর্মজিজ্ঞাসা।

তবে সে কাব্য idealistic কি realistic, এখন তা-ই বিবেচ্য। এ জাতিভেদ আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে নেই। এমনকী আমাদের ভাষায় ও-দুটি শব্দের অনুবাদও করা যায় না। কিন্তু ইউরোপে যে ও-দুটি কথা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে নিত্য মারামারি চলে, তা কে না জানে? কাব্যজগতে এ কলহ এক রকম শাক্ত-বৈষ্ণবের ঝগড়া।

৮

আর্ট বিচার করতে বসে Bergson এ দুটি চলতি কথাকে উপেক্ষা করতে পারেননি, কারণ তিনিও ইউরোপের লোক।

প্রথমেই সন্দেহ হয় যে,— আর্টের ক্ষেত্রে, idealism ও realism কথা-দুটির কি কোন মানে আছে? Bergson বলেন, নেই। আর্টের উদ্দেশ্যই হচ্ছে reality-র সঙ্গে আমাদের মনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কিন্তু যার দৃষ্টি বিষয়কামনায় অন্ধ, সে অবশ্য এ কথা মানবে না।

আর্টিস্টের দৃষ্টিতে জীবন অনেকটা immaterial, ভাষান্তরে মায়াময়, অথবা ছায়াময় রূপেই দেখা দেয়। এই বিশেষ দৃষ্টিরই নাম idealism। সুতরাং আর্ট realistic হতে পারে, কিন্তু আর্টিস্টের মন চিরকালই idealistic। সংক্ষেপে idealism-এর প্রসাদেই মানবমন reality-র সাক্ষাৎ পায়। বলা বাহুল্য যে, এ reality মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধিজাত কাজ-চালানো reality নয়। Bergson-এর মতের এর চাইতে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করতে হলে সমগ্র Bergson-দর্শনের বিস্তৃত ভাষ্য লিখতে হয়। এ প্রবন্ধে তার অবসর নেই।

এ দেশে idealism কথাটা বোধ হয় বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কবিরা যে বাহ্যজ্ঞানশূন্য— এ কথা সেকালের লোকও বলত। তার উত্তরে আলঙ্কারিকরা বলেছেন— "সুপ্তস্যাপি মহাকবে শব্দার্থৌ সরস্বতী দর্শয়তি তদিতরস্য তত্র জাগ্রতোঽপ্যন্ধং চক্ষু। মতিদর্পণে কবীনাং বিশ্বং প্রতিফলতি।"

অস্যার্থ— "কবি সুপ্ত হলেও তাকে শব্দার্থ স্বয়ং সরস্বতীই দেখিয়ে দেন। অপরে জাগ্রত হলেও অন্ধ। কারণ কবিদের মতিদর্পণে বিশ্ব প্রতিফলিত হয়।

কথাটা কি Bergsonian নয়?

আর-একটি কথা বলেই এ প্রবন্ধ শেষ করব। Bergson-এর মতে প্রবুদ্ধ social consciousness হতে— সমাজের মহা উপকারী এক জাতীয় সাহিত্য জন্মলাভ করে— সে সাহিত্যের নাম প্রহসন। Bergson বলেন, জড়ত্বের দিকে জীবনের একটি সহজ প্রবণতা আছে। আর জড়ধর্মী অর্থাৎ mechanical ব্যক্তি ও সমাজ এক রকম জীবন্মৃত। তবে বুদ্ধি ও চরিত্রের জড়তার মারাত্মক শত্রু হচ্ছে 'হাসি'। হাসি হচ্ছে জড়তার বিরুদ্ধে চির-প্রতিবাদ। আর যে-সাহিত্য মানুষকে হাসাতে পারে, তারই নাম হচ্ছে প্রহসন। Shaw এই হিসেবেই একজন বড় সাহিত্যিক— কারণ তিনি অদ্যাবধি যা লিখেছেন, তা সবই উঁচুদরের প্রহসন।

ক্রি টি সি জ ম

নূতন কাগজের নূতন সম্পাদকরা, যখন আমাকে তাঁদের কাগজের পৃষ্ঠা-পূরণ করতে অনুরোধ করেন, তখন আমি উভয়-সংকটে পড়ি। কেন, সে কথা আমি বহু বার বলেছি।

আসল কথা, এ ক্ষেত্রে কী লিখব ভেবে পাইনে। আর নূতন সম্পাদকরাও কী লিখতে হবে, তা বলে দেন না। যদি দিতেন, তা হলে আরও মুশকিলে পড়তুম। কারণ, ফরমায়েশি লেখা আমি লিখতে পারিনে। আমার মন এত দূর নমনীয় নয় যে যে-দিকে বাঁকাতে চাই, তখনই সে দিকে তাকে বাঁকাতে পারি।

এখন যদি অনুমতি করেন তো আমার লেখার একটু পরিচয় দিই।

আমি এককালে পদ্যও লিখেছি, কিন্তু কেউ আমাকে কবি বলে ভুল করেনি। আমার রচিত সনেটগুলিকে লোকে experiment হিসেবেই ধরে নিয়েছে, আর যদি সে experiment successful হয়ে থাকে, তা হলেও তা experiment মাত্র। অতএব কোন সম্পাদকই আমাকে কবিতা লেখবার ফরমায়শ করেন না, বিশেষত যখন lisp in numbers করবার তরুণ-তরুণী অসংখ্য আছেন।

আমি গল্পও লিখেছি, কিন্তু সে সব গল্পের মান্য আছে, আদর নেই। অর্থাৎ অনেক লেখক সে গল্পের তারিফ করেন, কিন্তু বাজারে তার কাটতি নেই। তাই আশা করি, সম্পাদক মহাশয়রা আমার কাছে গল্প চান না। এ জ্ঞান তাঁদের আছে যে গল্প লেখা আমার পক্ষে অনায়াসসাধ্য নয়। কোন কালেই আমি হাত ঝাড়লেই গল্প বেরোত না। আর এ বয়সে প্রেমকে নূতন-নূতন সাজে বার করা আমার পক্ষে অসাধ্য। ও-বস্তুকে যে-সাজই পরাই না কেন, তার ভিতর থেকে প্রেমের চির-কেলে কঙ্কাল বেরিয়ে পড়বে। আর প্রেম বাদ দিয়ে গল্প লেখা, সে সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেওয়া।

সাহিত্যসমাজে জনরব এই যে আমি একজন ক্রিটিক। এ খ্যাতি যে আমার আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ যা আমি করিনি, তার জন্যই আমি বিখ্যাত।

বাংলায় সমালোচনার অর্থ পুস্তক সমালোচনা। আর আমার যত দূর মনে পড়ে, আমি অদ্যাবধি মাত্র দুইখানি বইয়ের সমালোচনা করেছি। এক 'চিত্রাঙ্গদা'র, আর

সম্প্রতি 'মহাপ্রস্থানের পথে'র! প্রথমখানি কাব্য, আর দ্বিতীয়খানি ভ্রমণ-কাহিনী। চিত্রাঙ্গদা-র সমালোচনা দীর্ঘ ও মহাপ্রস্থানের পথে-র সমালোচনা হ্রস্ব। এর কারণ আমার বিশ্বাস যে, চিত্রাঙ্গদা অনেক কথার ভার সয়, আর মহাপ্রস্থানের পথে তা সয় না।

প্রথম সমালোচনা সম্বন্ধে জনৈক নবীন সমালোচক এই মত প্রকাশ করেছেন যে, তাতে অনেক কথা আছে, কিন্তু আসল কথা নেই। সম্ভবত এ দোষ সে সমালোচনার আছে। অনেক কথা বলবার দোষ এই যে, বকতে-বকতে আসল কথা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসল কথাটি যে কী, তা নবীন ভাবুক মহাশয় অনুগ্রহ করে পাঠকসমাজকে বলে দেননি। এর থেকে অনুমান করছি যে, এ কাব্যের যে একটি moral আছে, সে বিষয়ে আমি অজ্ঞ বা উদাসীন। কাব্য মাত্রেরই অন্তরে একটি বা একাধিক moral থাকে। এর কারণ কবি মাত্রেই মানুষ— আর মানুষ মাত্রেই 'moral' চিন্তার অধীন। ফল-মূল-পাতার অন্তরে যে ওষুধ আছে, তা আমরা সকলেই জানি। আর সম্ভবত সেইটিই হচ্ছে ও-সকলের সারবস্তু— কারণ মানুষের মহা উপকারী বস্তু। তা হলেও ফলমূল পিষে আর পাতা নিংড়ে বিষ কিংবা অমৃত বার করা কাব্যরসিকের কাজ নয়, কারণ আলঙ্কারিক ভিষক নন। কাব্যামৃত বলে সংস্কৃতে একটা কথা আছে, কিন্তু এ অমৃত মকরধ্বজ নয়।

মহাপ্রস্থানের পথে-র সম্বন্ধে যে বেশি কিছু লিখিনি, তার কারণ ও-গ্রন্থের লম্বা সমালোচনা করলে সেটা হত, মহাত্মা গান্ধি যাকে বলেন, Himalayan error। আমাদের মতো ক্ষুদ্রাত্মা লেখকদের পর্বতপ্রমাণ ফাঁকা কথা বলবার অধিকার নেই।

ভালো কথা, আমি কলম ধরে প্রথমেই একখানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্যের (জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর) সমালোচনা করি। তার পূর্বে আমি কখনও সাদা কাগজের গায়ে বাংলা-কালির আঁচড় কাটিনি। তখন আমি কলেজের ছাত্র; সুতরাং সে প্রবন্ধ যে একাডেমিক পদ্ধতিতে লেখা হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে প্রবন্ধটি সেকালের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, অবশ্য তার অনেক ছাঁটকাট করে। আমি এই কাটাকুটিতে খুব সন্তুষ্ট হইনি। কারণ আমি সেকালেও আমার লেখার উপর কেউ হস্তক্ষেপ করলে প্রসন্ন হতুম না। আমার লেখার জন্য যে একমাত্র আমিই দায়ী, সে জ্ঞান সে বয়েসেও আমার ছিল। আর এ জ্ঞানও আমার ছিল যে, পাঠকের নিন্দা-প্রশংসা কোন্ লেখার কপালে জুটবে অথবা জুটবে না, তা নির্ভর করে কলমের লেখার উপরে নয়; কপালের লেখার উপরে।

উক্ত লেখাটির প্রতি আমার একটু মায়া ছিল, কারণ সেটি আমার আদি লেখা। তাই তার manuscript-টি আমি সযত্নে রক্ষা করি, এবং বহু কাল পরে সেটি 'সবুজ

পত্র'-এ পুনঃপ্রকাশিত করি। এখন সেটি পড়ে দেখতে পাই, সেই লেখাটিতে আমার লেখার দোষগুণ সবই সমান বর্তমান।

আমার লেখার দোষ এই যে, আমার মন সব সময়ে অপরের মতের পশ্চাদ্ধাবন করে না; আর তার গুণ এই যে, আমি যা বলতে চাই তা বাংলায় বলতে পারি— এমনকী সাধু ভাষাতেও। যদিচ আমার মনের ভাষা বিদেশি।

উক্ত প্রবন্ধের এ স্থলে উল্লেখ করবার প্রয়োজন এই যে, আমার যদি সত্য-সত্যই critical faculty থাকে, আমার এই আদি লেখাতেই তা পরিস্ফুট হয়েছে। আর এই দীর্ঘজীবনে কাব্য সম্বন্ধে আমার মতামতের বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটেনি।

ইংরেজি ভাষায় criticism-এর অর্থ শুধু সাহিত্য সমালোচনা নয়। যদি তা হয় তো Renan-কে উনবিংশ শতাব্দীর একটি অগ্রগণ্য critic বলে ইউরোপের লোকে শ্রদ্ধা করত না; কেননা তিনি কখনও কোন পুস্তক সমালোচনা করেননি। অবশ্য Biblical Criticism-কে কেউ আর সাহিত্য সমালোচনা বলেন না।

ইংলন্ডের জনৈক বড় critic, Mathew Arnold তো সাহিত্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন criticism of life। এ কথার অর্থ নিয়ে ইংলন্ডের সাহিত্য সমাজে বহু আলোচনা হয়েছে। অবশ্য এ গোলযোগ ঘটেছিল criticism কথাটা নিয়ে। আধুনিক ফরাসি সমালোচকরা বলেন, সাহিত্য হচ্ছে meditation of life। এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ শুনিনি। এর থেকে বোঝা যায় যে ইউরোপে সাহিত্য মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

মানুষের মন শুধু সাহিত্যের গণ্ডিবদ্ধ নয়। ধর্ম, পলিটিক্স প্রভৃতির সঙ্গে সে মনের যোগাযোগ আছে। বাঙালিদের মনও যে এ সব বিষয় থেকে আলগা নয়, তার প্রমাণ নিত্য তাঁদের কথাবার্তায় পাওয়া যায়। আমিও অবশ্য নানা বিষয়ে নানা কথা বলেছি, যেমন সামাজিক লোকে নিত্য বলেন। সে সব বলা-কওয়া হচ্ছে আসলে স্ব-সমাজের সঙ্গে কথোপকথন। তবে আমার কথা একটু ভেবে বলা আর একটু গুছিয়ে বলা। সে হচ্ছে এই সব বড়-বড় বিষয়ে শুধু টীকাটিপ্পনী, এক কথায় criticism। এ হিসেবে আমি অবশ্য এক রকম সমালোচক। সে সব কথায় কার কী ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে জানিনে। তবে এইটুকু জানি যে, জীবনের প্রতি, অতএব সাহিত্যের প্রতি আমাদের জাতির critical attitude আজও জন্মায়নি! আজও আমরা পরের কথার পিছনে প্রশ্নচিহ্ন দিতে শিখিনি। সেই জন্য বাংলায় আজও সমালোচনা-সাহিত্য গড়ে ওঠেনি। আমাদের সাহিত্যসমাজে এই criticial বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করবার বোধ হয় একটি সহজ উপায় আছে। প্রতি লেখক যদি নিজের লেখার দোষগুণ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করতে শেখেন, তা হলে অপরের লেখাও খুব সম্ভবত সুবিচার করতে শিখবেন। কারণ সকল criticism-এর ভিত্তি হচ্ছে আত্ম-criticism।

খিদিরপুর সারস্বত সম্মেলন

খিদিরপুরের এই সারস্বত সম্মেলনে আমি আমার জীর্ণদেহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছি--- সর্বোপরি কবি হেমচন্দ্রের প্রতি খিদিরপুরবাসীদের সঙ্গে একযোগে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

যাঁরা বাঙলা সাহিত্যকে গড়ে তোলবার কাজে হাত লাগিয়েছেন--- তাঁদের স্মৃতিরক্ষা করা যে আমাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য, সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।

কিছু দিন থেকে বাঙালি শিক্ষিত সমাজের মনে এ ধারণা জন্মেছে যে, আমাদের পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের স্মৃতিরক্ষা করে আমরাই ধন্য হই।

আমরা, সাধারণ লোকরাও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি; কিছু কাল এই পৃথিবী আমাদের কর্মভোগের ক্ষেত্র হয়, তারপরে আমরা নৈসর্গিক নিয়মে চলে যাই। এরই নাম আমাদের জীবন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে জাতীয় জীবনের প্রধান প্রভেদ এই যে, জাতীয় জীবন শুধু বর্তমান নয়, অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা দিয়ে গড়া। যে-সকল ব্যক্তি চলে গেলেও তাঁদের স্মৃতি রেখে যেতে পারেন, তাঁদের স্মৃতিই এই জাতীয় জীবনের স্মৃতি। সুতরাং যাঁরা জাতীয় জীবনকে কোন-না-কোন বিষয়ে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের স্মৃতিরক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। কেননা এই জাতীয় স্মৃতির সাহায্যে আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্টিলাভ করে। কেউ-কেউ বলেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতিরক্ষা করা সম্প্রতি একটি fashion হয়ে উঠেছে। তথাস্তু। কিন্তু fashion মাত্রেই হাস্যজনক নয়। সাহিত্যিকদের স্মৃতিরক্ষার উৎসব অন্যান্য অনেক fashion-এর মতো নিরর্থক নয়।

ধরুন, আমরা সকলে আজ ঘোর স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠেছি। এমনকী অরসিক কংগ্রেসও আজ চাচ্ছেন independence। কিন্তু স্বাধীনতা যে আমাদের পক্ষে কাম্য, এ কথা হেমচন্দ্র সর্বপ্রথম আমাদের শিঙ্গার রবে শুনিয়েছেন। সে কথা বাঙালি জাতির কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছিল। 'ভারত-সঙ্গীত' যখন আমি প্রথম শুনি তখন আমি বালক, কিন্তু সেই বাল্যকালেই এ সঙ্গীত আমার মনে এমনি বসে গিয়েছিল যে, আজ পর্যন্ত আমাদের পরাধীনতার কথা আমার অন্তরে

কাঁটার মতো বিঁধে আছে। আর এক কথা। আমাদের এ যুগের বঙ্গসাহিত্যের অন্তরে স্বাধীনতার সুর নানা প্রকারে বেজেছে ও বাজছে, কখনও স্বরূপে, কখনও বর্ণচোরা রূপে।

লোকে যাঁদের কর্মী লোক বলে, তাঁরা হয়তো এর উত্তরে বলবেন যে, কবির কথা উড়ো কথা— সে কথায় কোন কাজ এগোয় না। কিন্তু সত্য কথা এই যে, কবির কথাই মানুষের মনের জমি তৈরি করে, আর সেই সরস জমি থেকেই নূতন কর্ম উদ্ভূত হয়— যে-কর্মের শ্রী ও শক্তি অপূর্ব। হেমচন্দ্রের পূর্বেই খিদিরপুরের কবি রঙ্গলালও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম বলেন— "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিয়ে চায় রে।" আমার মনে আছে যে, সাত বৎসর বয়েসে এ কথা আমি গুরুজনদের আদেশে তাঁদের বন্ধুবান্ধব সমাজে আবৃত্তি করতুম। তবে আমি যে সত্তর বৎসর বয়েসেও স্বাধীনতাহীনতায় বেঁচে আছি, তার কারণ যাঁদের ইষ্টমন্ত্র হচ্ছে Pro Patriamori— আমি তাঁদের দলভুক্ত নই।

ভালো কথা, রঙ্গলালের কোন্ পুস্তকে যে এ ছত্র আছে, তা আমার মনে নেই। বোধ হয় তাঁর রচিত 'পদ্মিনীর উপাখ্যান'-এ। এ অনুমান করছি এই কারণে যে, বাল্যকালে 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' আমাদের অতি প্রিয় কাব্য ছিল। তার প্রমাণ ও-কাব্যের ক'টি ছত্র আজও আমার মনে আছে। সে ছত্র ক'টি এই :

"নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ কারণ
ভারতের নানা দেশ করি পর্য্যটন,
অবশেষে উপনীত রাজপুতনায়,
বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তিমেখলায়।।"

শুনতে পাই যে আজকের ছেলেরা রঙ্গলালের বই পড়ে না। কেন পড়ে না, জানিনে। আমার বিশ্বাস, 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' আজও বালক-বালিকাদের যথেষ্ট আনন্দদান করবে। কেননা তার ভাষা সহজ ও মনোভাব সরল, ছন্দ মামুলি ও বিষয়বস্তু মনোরম। রঙ্গলালের স্মৃতিরক্ষা করবার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে 'পদ্মিনীর উপাখান' স্কুলপাঠ্য করা। পদ্যে এ উপাখ্যান পড়তে কোন বিরাট ব্যাকরণ বা অভিধানের সাহায্য প্রয়োজন হবে না।

খিদিরপুরবাসী মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার আবশ্যক নেই, কারণ তিনি সর্বলোকপরিচিত। আর তাঁর বিষয় কিছু বলাও কঠিন। কারণ তিনি হচ্ছেন বঙ্গসাহিত্যে একজন unique কবি।

কালিদাস, বাণভট্ট প্রভৃতি সেকালের কবিরা পূর্ব-কবিদের নমস্কার জানিয়ে তারপর নিজেদের কাব্য রচনা করেছেন। মাইকেল কোন পূর্ব-কবিদের, এমনকী ব্যাস-বাল্মিকীরও নাম উল্লেখ করেননি। এর কারণ, তিনি ভারতবর্ষের কোন পূর্ব-কবির পদানুসরণ করেননি। যদি কোন কবির কাব্য তিনি আদর্শ রূপে গ্রহণ করে

থাকেন, তা হলে সে আদর্শ হচ্ছে ইংরাজ কবি Milton-এর কাব্য। এর জন্য তাঁকে বাঙলা ভাষা নতুন করে গড়তে হয়েছে। ফলে "মেঘনাদ-বধ" সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালা। আর বাঙলার কোন পরবর্তী কবিও তাঁর অনুরূপ কাব্য লেখেননি— কী ভাষায়, কী ভাবে। তাঁর কাব্য বঙ্গসাহিত্যের evolution-এর একটি ধাপ নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। তিনি কাব্যরচনায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁকে কোন বিশেষ পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। খিদিরপুর এ তিন কবির বাসস্থান বলে সত্যই গৌরব করতে পারে।

আমার শেষ কথা এই যে, বঙ্গসাহিত্যকে ভবিষ্যতেও স্বাধীনতার মন্ত্র জপ করতে হবে। কারণ জীবনে আমরা পরাধীন থাকব আর মনোরাজ্যে মুক্ত হব, এ হচ্ছে অদ্ভুত সুখস্বপ্ন।

এ রকম স্বপ্ন খোলা চোখে দেখা যায় না।

ব ঙ্গ সা হি ত্যে র সং ক্ষি প্ত প রি চ য়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে দুটি বক্তৃতা লিখতে অনুরোধ করেছেন। আমিও তাতে স্বীকৃত হয়েছি।

বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে অসংখ্য সন্দেহ এবং তর্কের অবসর আছে। প্রথম কথা হচ্ছে, সাহিত্য আমরা কাকে বলি?— প্রসিদ্ধ ইতালীয় দার্শনিক Benedetto Croce একটি পুস্তিকা লিখেছেন, তাতে তিনি প্রথমেই এই প্রশ্নটি করেছেন— Che cosa e arte? অর্থাৎ art বস্তুটি কী? এবং উত্তরে যা বলেছেন, তা সকলেই জানে; কিন্তু তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধিকাংশ লোকেই ভুল করে। এর পর তিনি art-এর আট-দশ রকম ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন; ও অবলীলাক্রমে প্রত্যেকটি খণ্ডন করেছেন। এবং শেষে আর্ট বলতে কী বোঝায়, সে বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করেছেন।

বলা বাহুল্য, এটি একটি দার্শনিক প্রশ্ন। আমি সাহিত্য সম্বন্ধে অনুরূপ প্রশ্ন তুলবও না, তার কোন উত্তরও দেব না। কারণ আমি ধরে নিচ্ছি যে, সাহিত্য কাকে বলে, তা আপনারা সকলেই জানেন। এতে আমার বক্তব্য সহজেই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসবে।

এ বক্তৃতায় বাচালতা করবার বিশেষ সুযোগও নেই। কারণ বাঙ্গলা সাহিত্য বিপুল নয়। আমি পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' সকলকে একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। তাতেই দেখতে পাবেন যে, বাঙ্গলা সাহিত্যের দেহ কত দূর কৃশ। ইংরাজি সহিত্য, ফরাসি সাহিত্য, ইতালীয় সাহিত্যের তুলনায় বঙ্গসাহিত্যের বয়স অতি অল্প। পণ্ডিতমশায় আমাদের সাহিত্যের আদ্য কাল, মধ্য কাল ও ইদানীন্তন কাল আলোচনা করেছেন। কৃত্তিবাস হচ্ছেন তাঁর মতে বাঙ্গলার একজন আদি লেখক। আর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কালের মুখ্য লেখক।

আমি বঙ্গসাহিত্যকে দুই যুগে বিভক্ত করি। এক নবাবি আমলের সাহিত্য আর এক ইংরাজি আমলের সাহিত্য। নবাবি আমলের পিছনে যাবার জো নেই। কিছু কাল পূর্বে দোহাকোষ ও চর্যাপদ নামক দু'খানি পুস্তিকা নেপালে আবিষ্কৃত হয়েছে। এর একখানি— দোহাকোষ— বিশেষজ্ঞদের মতে বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত

নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে দু'খানির ভাষাই বাঙ্গলা, তা হলেও এ পদাবলিকে কোন মতেই সাহিত্য বলা চলে না। দ্বিতীয়ত, এগুলি যে কবে রচিত হয়েছিল, তা-ও ঠিক জানা নেই। সুতরাং আমি বর্তমান বক্তৃতায় শুধু নবাবি ও ইংরাজি আমলের সাহিত্যেরই মোটামুটি পরিচয় দেব।

সাহিত্য মাত্রই কোন-না-কোন ভাষায় রচিত হয়। সুতরাং সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার অন্তরে ভাষার আলোচনা থাকে। নীরব কবি বলে কোন কবির সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। এখন এই বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকেরই কৌতূহল আছে। এবং পাঠকের সে কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারেন philologist-রা। বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের বংশধর নয়। মাগধী প্রাকৃত কালক্রমে অল্প-বিস্তর রূপান্তরিত হয়ে বাঙ্গলা ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙ্গলা ভাষার বর্তমান রূপ কী, তা এখন বলা যাক।

কতকগুলি শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলা যায় না। সে শব্দসমষ্টির পরস্পর যোগের নিয়মই ভাষার মূল কথা। ভাষা মাত্রেরই অন্তরে অন্য ভাষার নানা শব্দ আছে। আমাদের বাঙ্গলা ভাষাও নানা পরভাষার শব্দ অঙ্গীকার করেছে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলবেন যে, বাঙ্গলা ভাষার অন্তরে বহু তৎসম, তদ্ভব ও দেশি শব্দ আছে। তৎসম হচ্ছে অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ,— যথা 'বিবাহ'। তদ্ভব হচ্ছে সংস্কৃত হতে উৎপন্ন শব্দ,— যথা 'বিয়ে'। আর দেশি শব্দ হচ্ছে 'চুবড়ি, কুলো, ডালা' প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত আমাদের ভাষায় নানা বিদেশি শব্দ আছে, যথা পার্শি, আরবি, পর্তুগিজ, ফরাসি, ওলন্দাজি, ইংরেজি ইত্যাদি;— অর্থাৎ আমাদের দেশ যাঁরা-যাঁরা ভিন্ন সময়ে অংশত অধিকার করেছেন, তাঁদের ভাষার শব্দ।

এই সব বিদেশি শব্দ বাঙ্গলায় এমনি মিশে গেছে যে, সেগুলি কোন্ ভাষা থেকে গৃহীত তা অনেক সময় বোঝা যায় না। এর ফলে বাঙ্গলা ভাষার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হয়েছে। এ সব শব্দকে স্বভাষা থেকে এখন বহিষ্কৃত করবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। এবং আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে ইংরেজি শব্দ আরও বেশি পরিমাণে আমাদের ভাষায় ঢুকে যাবে। লেখায় আমরা কোন্ শব্দ কোথায় ব্যবহার করব, তা লেখকের রুচির উপর নির্ভর করে।

আমাদের ভাষার মূলধন হচ্ছে তদ্ভব শব্দ; ভাষান্তরে আমরা যাকে বলি প্রাকৃত। আমার বন্ধু শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের, বঙ্কিমের, আমার এবং আরও দু-এক জন লেখকের লেখা যদৃচ্ছা বিশ্লেষণ করে, শব্দ গণনা করে আবিষ্কার করেছেন যে, আমরা মোটামুটি শতকরা ৩০ সংস্কৃত শব্দ, শতকরা ৬০ প্রাকৃত এবং বাকি শতকরা ১০ বিদেশি ও দেশি শব্দ ব্যবহার করি। তবে লেখক ও বিষয় অনুসারে অবশ্য তারতম্য হয়। বাঙ্গলা ভাষা আজও অত্যন্ত দরিদ্র। Webster's Dictionary-র সঙ্গে শ্রী রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' নামক অভিধান

তুলনা করলেই সকলে দেখতে পাবেন, শব্দসম্ভারে আমাদের ভাষা কত দীন। বাঙ্গলা ভাষায় আর-একটি ত্রুটি আছে। তাতে abstract শব্দ এক রকম নেই বললেই হয় : concrete শব্দই বেশি। বাঙ্গলায় আমরা বলি ছোট-বড়, উঁচ-নীচ, এ সব হচ্ছে concrete শব্দ। কিন্তু পাঁচ রকম বস্তুর এই সব প্রভেদ এক কথায় বোঝাতে হলে আমরা বলি 'অসম'; অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে বাধ্য হই। এর ফলে বাঙ্গলা ভাষা দর্শন লেখবার পক্ষে তত উপযোগী নয়, যত না সাহিত্যের পক্ষে। বাঙ্গলা লেখকেরা যত অধিক দর্শন চর্চা করবেন, ততই তাঁদের প্রকাশভঙ্গি সংস্কৃত ভাষার কাছে আরও ঋণী হয়ে পড়বে। অবশ্য এর ভিতর একটু বিপদও আছে। সে হচ্ছে, অর্থ না বুঝে নির্বিচারে সংস্কৃত দার্শনিক শব্দ প্রয়োগ করা। কারণ সংস্কৃত দার্শনিক ভাষা পরিভাষা মাত্র।

বাঙ্গলা ভাষা ধ্বনিগৌরবে সংস্কৃত এবং ইংরেজির চাইতে হীন। ধ্বনিগৌরব যে কবিতার একটা মস্ত অঙ্গ, তা ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষার কবিতা থেকে সহজেই দেখানো যায়। ইংরেজরা বলেন যে মিল্টন ইংলন্ডের একজন বড় কবি। মিল্টনের Paradise Lost পড়লে আপনারা সকলেই এ কথার সত্যতা অনুভব করতে পারবেন। এবং সংস্কৃত কবিতার ধ্বনি যে কত দূর শ্রোত্ররসায়ন, তা বলাই বাহুল্য।

সংস্কৃত ভাষার এই গালভরা শব্দের প্রাচুর্যে সে ভাষা একটু গুরুভার হয়ে পড়েছে। সংস্কৃত ভাষায় অবশ্য চমৎকার epigram লেখা যায়। তার প্রমাণ ভর্তৃহরির শতকত্রয়। অপর পক্ষে অসংখ্য তদ্ভব এবং দেশি-বিদেশি শব্দের দৌলতে বাঙ্গলা ভাষা ফরাসির মতো একটি অতি চতুর ভাষা হয়েছে। ভারতচন্দ্র বলেছেন,—

"নাগর হে গিয়েছিনু নাগরীর হাটে
তারা কথায় মনের গাঁঠ কাটে।"

গুণীর হাতে এই বাঙ্গলা ভাষাও কথায় মনের গাঁঠ কাটে। এ ভাষা হাসে খেলে; অবশ্য সেই সব লেখকের হাতে, যাঁরা হাসাতে খেলাতে পারেন। বাঙ্গলা ভাষা ওজনে ভারি নয়। কিন্তু অল্প কথায় নানা রকম মনোভাব প্রকাশ করতে পারে। এ যুগে সাহিত্যে রসিকতার যথেষ্ট আদর আছে। এবং আমাদের ভাষা এ গুণের চর্চার অনুকূল। নবাবি আমলে অতি চতুর কবি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থই তার প্রমাণ। তিনি এক স্থানে বলেছেন,— "সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।"

এ স্থলে মিছা মানে মিথ্যে কথা নয়। এখানে মিছা মানে অনাবশ্যক। আমাদের ভাষা এই বিস্তর লেখবার অনুকূল নয়। ইংরেজি ভাষার শতগুণ থাকা সত্ত্বেও, তার প্রধান দোষ হচ্ছে বিস্তর লেখা। এ দোষ ফরাসি ভাষার নেই। আমরা যদি ভবিষ্যতে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হই, তা হলে আশা করি বাঙ্গলা সাহিত্য পূর্ণমাত্রায় বেঁচে উঠবে।

আমরা সংস্কৃত ভাষার মোহ কখনও কাটিয়ে উঠতে পারব না। যে-সব বিদেশি শব্দ আমাদের ভাষার অন্তরঙ্গ হয়েছে, তাদেরও বর্জন করতে পারব না। যদিচ তদ্ভব কথাই বাঙ্গলার প্রাণ। এ স্থলে আমি আর-একটি কথায় উল্লেখ করতে চাই। কিছু কাল থেকে আমাদের মধ্যে একটা তর্ক চলেছে যে, সাধু ভাষা ও তথাকথিত চলতি ভাষার ভিতর কোন্‌টি সাহিত্যের বাহন হবে। আমার মতে, এ বিষয়ে কোন তর্ক নেই। যাঁরা বর্তমান সাহিত্যের খবর রাখেন তাঁরাই জানেন যে, তথাকথিত চলতি ভাষা দিনের পর দিন সাহিত্যের নানা ক্ষেত্র দখল করে নিচ্ছে। এবং সাধু ভাষা এখন সাহিত্যের নয়, সংবাদপত্রের আশ্রয়ে দিন গুজরান করছে।

আমি পূর্বে বলেছি যে, বাঙ্গলা সাহিত্যের বয়স বেশি নয়। আর-একটি কথা। বাঙ্গলা সাহিত্যের লেখক-সংখ্যা অতি কম। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন যে, কৃত্তিবাস হচ্ছেন বাঙ্গলা সাহিত্যের আদি লেখক। এবং তিনি বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সম-সাময়িক। কৃত্তিবাসের তারিখ নির্ণয় করবার মতো উপাদান বেশি কিছু নেই। অতএব তাঁর অনুমান সম্ভবত সত্য বলেই ধরে নেওয়া যাক। যদিচ বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাসের পদাবলির প্রভাব কৃত্তিবাসের রামায়ণে বিন্দু মাত্র নেই,— না ভাষায়, না মনোভাবে। বিদ্যাপতি বাঙ্গালি নন, মৈথিলি কবি। এবং তিনি মৈথিলি ভাষাতেই কবিতা রচনা করেছেন। তা হলেও তাঁর ভাষা বাঙ্গলার এত কাছাকাছি যে, বাঙ্গালিরা তাঁর কবিতাকে প্রথম থেকে বাঙ্গলা বলেই ধরে নিয়েছে। তাঁর রচিত কীর্তিলতা নামক একখানি ছোট বই আছে, যার ভাষা পদাবলির ভাষা নয়। বিদ্যাপতি একে অবহউ ভাষা বলেন;— অর্থাৎ যাকে আমরা বাজারে হিন্দি বলতে পারি। এ বই হচ্ছে জৌনপুরের বর্ণনা, যখন ইব্রাহিম সির্কী ছিলেন সেখানকার সুলতান। এর থেকে বিদ্যাপতির তারিখ ঠিক করা যায়। কবি বিদ্যাপতি দারভাঙার রাজার তরফ থেকে জৌনপুরের সুলতানের কাছে দৌত্য করতে যান। এ ছাড়া নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ সারদাচরণ মিত্র খাঁটি মৈথিলি ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির পদাবলির যে-সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তাতে মনে হচ্ছে তিনি সে সময়কার জনৈক বাঙ্গলা নবাবের স্তুতিবাদ করেছেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে সমসাময়িক, তা প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ। চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির সাক্ষাতের যে-গল্প প্রচলিত আছে, তা কিম্বদন্তি মাত্র। তবে এ কথা ঠিক যে, মহাপ্রভু চৈতন্য এই উভয়ের পদাবলির গান শুনতে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

তারপরে আমরা পাই কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীকাব্য। এ ছাড়া অনেক মনসামঙ্গল রচিত হয়েছিল। তারপর কাশীরাম দাস বাঙ্গলায় মহাভারত রচনা করেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত আজ পর্যন্ত অতিশয় জনপ্রিয়। কিন্তু এ দুটির কোনটিই মূল রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ নয়। শুধু সেগুলি অবলম্বন করে বাঙ্গলা ভাষায় লেখা। কবিকঙ্কণ চণ্ডী বাঙ্গলা ভাষায়

একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। কোন সংস্কৃত বই অবলম্বন করে এটি লেখা হয়নি। অন্তত কোন কাব্য কিম্বা পুরাণের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এ বইয়ে সেকালের একটি সমাজচিত্র পাওয়া যায়, যা অপর কোন কাব্যে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কারণ তাদের নাম করেছেন। আমার যত দূর স্মরণ হয়, তিনি মহাপ্রভু চৈতন্যেরও উল্লেখ করেছেন। যদিচ তাঁর পরবর্তী পদকর্তাদের নাম করেননি। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এই চণ্ডীকাব্যের আদর্শেই রচিত। এ কাব্য এক সময়ে বিশেষ প্রচলিত ছিল।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতর চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত অতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আমাদের সাধারণ শিক্ষিত সমাজে এ বই দু'খানি বরাবর উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে। সম্প্রতি যাঁদের বাঙ্গলার বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে, তাঁরা অবশ্য এ দুই গ্রন্থের আলোচনা করেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত মহাপ্রভুর জীবনের আংশিক ইতিহাস। এ ইতিহাস অতি চমৎকার। কারণ বইখানি যেমন সহজ তেমনি সরল,— যে-দুটি হচ্ছে সাহিত্যের প্রধান গুণ। অপর পক্ষে চৈতন্য-চরিতামৃত বৈষ্ণব ধর্মের এক রকম ব্যাখ্যা। একে অনেকে বাঙ্গলার বৈষ্ণব ধর্মের philosophy মনে করেন। ফলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের চৈতন্য-চরিতামৃতের ভাষা সরলও নয়, সহজও নয়।

চৈতন্য-চরিতামৃত philosophical গ্রন্থ না হলেও, মধ্যে-মধ্যে mystical philosophy-র চমৎকার ব্যাখ্যা আছে। কবিরাজ মহাশয় বলেছেন, তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে এ গ্রন্থ লিখেছেন, যখন তিনি ভালো করে চোখে দেখতে পান না, আর লিখতে তাঁর হাত কাঁপে। ধর্মভাব যার মনে প্রবল নয়, তার পক্ষে এ রূপ বিরাট গ্রন্থ এত বয়সে লেখা অসম্ভব। চৈতন্যের পরবর্তী অনেক ভালো-ভালো পদকর্তা আছেন। তার মধ্যে কেউ-কেউ ব্রজবুলি নামক কৃত্রিম ভাষায় পদ রচনা করেছেন; বিশেষত গোবিন্দ দাস।

এ পর্যন্ত আমি বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মের বিষয়ে কোন সাহিত্যের উল্লেখ করিনি। শূন্যপুরাণ নামে একখানি বই আছে; কিন্তু সেখানি কোন্ সময়ের লেখা বলা যায় না। কারণ তাতে আছে যে, দেবতারা মুসলমান সেজে বাঙ্গলায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং হিন্দুদের নানা রকম শাস্তি দিয়েছিলেন। এ পুস্তকের প্রথম অংশ বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাখ্যা। তারপর যে-অংশে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচারের কথা আছে, সেটা পরের লেখা।

রাজা গোপীচন্দ্র ও ময়নামতীর উপাখ্যান পুরোপুরি বৌদ্ধ ধর্মেরই পুস্তক। যে-সম্প্রদায়ের ভিতর এই উপাখ্যান প্রচলিত ছিল, তাদের বলে নাথ সম্প্রদায়। তাঁরা নাকি সকলেই যোগী ছিলেন। নাথ উপাধি আজও বাঙ্গলায় প্রচলিত। এবং তারা যুগী বলে পরিচিত। এ সম্প্রদায় বর্তমানে উপবীত গ্রহণ করেছে। তাই বলে

সমাজে উচ্চ শ্রেণীর লোক বলে গণ্য হয়নি। চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদও সহজিয়া মতের পৃষ্ঠপোষক। এবং সহজিয়া মত যে বৌদ্ধ ধর্ম থেকে উদ্ভূত, তা বোধ হয় সকলেই জানেন। এমনকী, বাঙ্গলায় যাকে সন্ধ্যাভাষা বলে, তা আমার বন্ধু ডা. প্রবোধ বাগচী আবিষ্কার করেছেন একখানি চীনে গ্রন্থ থেকে। সে গ্রন্থখানি নাকি সন্ধ্যাভাষার অভিধান।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর বহু পদকর্তা বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাসের অনুকরণে পদ রচনা করেন। এবং বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যতীত আরও অনেকে চৈতন্যদেবের জীবনচরিত লেখেন। ফলে বাঙ্গলা ভাষা উন্নতি লাভ করে। তারপর রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের লেখায় বাঙ্গলা ভাষা তার চরম রূপে প্রকাশিত হয়। এ ভাষা যেমন চতুর, তেমনি স্বচ্ছ। ভারতচন্দ্র নবাবি আমলের শেষ লেখক হলেও, ইংরেজি আমলের অর্থাৎ বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রথম লেখক বলেও তাঁকে গণ্য করা যায়। তিনি বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং তাঁর ভাষা 'যাবনী মিশাল'। সংস্কৃত ও বাঙ্গলাকে তিনি বেমালুম মিশিয়ে দিয়েছেন। কী কৌশলে যে তিনি এ কাজ করেছেন, তা আমরা আজও জানিনে। তাঁর হাতে বাঙ্গলা ভাষা সাবালক হয়েছে।

এর পরে ইংরেজি আমলে আমাদের সাহিত্যের ভাষা প্রথমে ভেস্তে যায়। প্রথমত Fort William College-এর পণ্ডিতের হাতে পড়ে সংস্কৃতের দৌরাত্ম্যে বাঙ্গলা এক রকম আধা-বাঙ্গলা আধা-সংস্কৃত হয়ে পড়ে। তারপর ইংরেজি ভাষার আক্রমণে বাঙ্গলা তার নিজের রূপ হারিয়ে ফেলে। নবাবি আমলে সাহিত্য কেবল মাত্র পদ্যে লেখা হত। পদকল্পতরুর সংগ্রহকার বলেছেন যে, চণ্ডীদাসের কবিতা গদ্য এবং পদ্যময়। কিন্তু তাঁর রচিত গদ্য পাওয়া যায় না। পদাবলি সাহিত্যকে lyric বলা যায়। কারণ সেগুলি সব গাওয়া হত। অপর কাব্যগুলি সব পাঁচালি। ভারতচন্দ্র তাঁর রচিত অন্নদামঙ্গলকে পাঁচালি বলেছেন। পাঁচালি বলতে বোধ হয় পাঞ্চাল দেশের প্রচলিত কাব্য লেখবার পদ্ধতি বোঝায়। এ-ও সুর করে পড়তে হত। সংস্কৃত রামায়ণও কুশীলবরা গেয়ে বলত। আমাদের দেশে যত ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি আছে, সে সবই পাঁচালি। আমি ছেলেবেলায় মনসার কথা মুসলমান চাষিদের সুরসংযোগে আবৃত্তি করতে শুনেছি। এরা প্রায় সকলেই বৃদ্ধ। এবং শুনেছি যে তারা ভিন্ন আর কেউই মনসার কথা বলতে পারে না। এর থেকে অনুমান করি যে, এক কালে উক্ত কথা লৌকিক কথা মাত্র ছিল এবং সেই লৌকিক কথা অবলম্বন করে পাড়াগেঁয়ে কবিরা তাদের সব মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। বেহুলা-লখিন্দর এই উপায়েই রচিত হয়। আমি কৃষ্ণনগর থাকা কালে কেওরাদের মধ্যে লখিন্দর আর বেহুলার যাত্রা শুনেছি। এ যাত্রার বিশেষত্ব ছিল এই যে, বেহুলা ও লখিন্দরের কথা গেয়ে বলা হচ্ছে, আর মধ্যে-মধ্যে জন ৪-৫

লোক সমস্বরে ধুয়ো ধরছে, 'ও সে বাঁচবে না।' এতে গ্রিক নাটকের chorus-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। এতদ্ব্যতীত মহাপ্রভুর যে-সব জীবনরচিত লেখা হয়েছে, সবই পদ্যে। নবাবি আমলের সাহিত্যের ভাষা যে এত সহজ, তার কারণ সর্ব-জনবোধ্য ভাষায় তা লেখা হত, ও সকলকে গেয়ে শোনানো হত।

আমি এ যুগের একখানি মাত্র বই জানি, চৈতন্য-চরিতামৃত, পদ্যে লেখা হলেও যার ভাষা মোটেই সহজবোধ্য নয়। আমার কাছে যে-বইখানি আছে, তার ভাষ্য সংস্কৃতে লেখা। এর থেকেই বুঝতে পারবেন, জনগণের পাঠের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ লেখা হয়নি। ব্রিটিশ আমলের পূর্বের কিছু-কিছু গদ্যে লিখিত দলিলাদি পাওয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। একটি লক্ষ করবার বিষয় এই যে, নবাবি আমলের লেখা হলেও, সে যুগের সাহিত্যে মুসলমানের বা মুসলমান ধর্মের কোন প্রভাব সুস্পষ্ট নয়। যদিচ শুনতে পাই যে, মুসলমান নবাবরা এ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। একমাত্র চৈতন্য-ভাগবতে দেখতে পাই, গৌড়ের বাদশা হোসেন শা-র দরবারে মহাপ্রভুর যবন-শিষ্য হরিদাসের বিচারকালে তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম এবং মুসলমান ধর্ম প্রায় এক। এ উভয়ের ভিতর একই মত প্রকাশ করা হয়েছে। দুই-ই ভক্তির ধর্ম এবং একেশ্বরবাদী।

আমি পূর্বে বলেছি যে, কবিকঙ্কণ চণ্ডী কোন লৌকিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হয়েছে। তার প্রথম ভাগ কালকেতু নামক কোন ব্যাধের গল্প। আর দ্বিতীয় ভাগ ধনপতি সদাগর নামক কোন বণিকের সিংহল যাত্রার বিবরণ। ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর দ্বিতীয় বার সিংহল যাত্রা করেন, এবং তাঁর বাপকে সিংহলের রাজার কারাগার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। এই গল্প মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর ও বেহুলা-লখিন্দরের গল্পের অনুরূপ। এ দুই উপাখ্যানই মুখে-মুখে প্রচলিত ছিল, পরে তা লিখিত হয়েছে।

এর একখানিতে মনসা দেবীর মাহাত্ম্য প্রচাব কবা হয়েছে; অপরখানিতে চণ্ডীর। চণ্ডী দেবীর উপাখ্যান মনসা দেবীর উপাখ্যানের চাইতে কী ভাষায়, কী মনোভাবে, অনেক বেশি মার্জিত। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, চণ্ডীকাহিনী আমাদের সাহিত্যের মনসার কাহিনী অপেক্ষা আধুনিক। আর এমনও হতে পারে যে, যিনি চণ্ডীকাহিনী লিখেছেন, তিনি ছিলেন যথার্থ কবি। সে কারণে তার লেখা অপর সকল মঙ্গলকাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উপরন্তু তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত।

আমি পূর্বে বলেছি যে, বাঙ্গলা ভাষার বয়সও বেশি নয়, লেখকের সংখ্যাও অতি কম। অবশ্য অতি অল্প সময়ের ভিতর অতি চমৎকার সাহিত্য গড়ে তোলা যায়। যথা, গ্রিক সাহিত্য এক অ্যাথেন্স শহরে ১০০ বছরের মধ্যে লেখা হয়। অথচ আজও য়ুরোপীয়েরা তার দার্শনিক চিন্তাধারা অতিক্রম করতে পারেননি।

আজও তাঁরা হয় Plato, নয় Aristotle-এর মার্গাবলম্বী। এ ঘটনা একটা অলৌকিক ব্যাপার। গ্রিক দর্শন, গ্রিক কাব্য, গ্রিক ইতিহাস প্রভৃতি সব একসঙ্গে আগুনের মতো দপ করে জ্বলে ওঠে, আর অল্পকালের মধ্যেই সে আগুন নিভে যায়। কিন্তু সে আগুনের আলো আজ পর্যন্ত সমগ্র য়ুরোপীয় সাহিত্যকে আলোকিত করে রেখেছে। এ রকম ব্যাপার অন্য কোন দেশে কোন কালে ঘটেনি। অপর পক্ষে নবাবি আমলের বঙ্গসাহিত্য অতি দরিদ্র। এমনকী, এক হিসেবে পাড়াগেঁয়ে বললেও চলে। একমাত্র এ যুগের বৈষ্ণব পদাবলি এবং ভাষাগুণে ভারতচন্দ্রের রচনাবলিকে বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বলে গণ্য করা যায়।

নবাবি আমলের সাহিত্য বলতে গান ও গল্প বোঝায়। পদাবলিও গান, পাঁচালিও গাওয়া হত। সংস্কৃত মহাকাব্যের অনুবাদ, যথা রামায়ণ ও মহাভারত, বাঙ্গালির হাতে পড়ে পাঁচালি হয়ে পড়েছে। নবাবি আমলে কোন নাটক ছিল না।

আমি এ পর্যন্ত নবাবি আমলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। এবং যত দূর সম্ভব, কোন্ অঞ্চলে বঙ্গসাহিত্য উদ্ভুত হয়েছে, তা-ও বলেছি। তখনকার প্রায় সমস্ত লেখকই পশ্চিমবঙ্গের লোক। কৃত্তিবাসের বাড়ি শান্তিপুরের সন্নিকট ফুলিয়া গ্রামে; চণ্ডীদাসর বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে; কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মেদিনীপুরে বাঁকুড়া রায় নামক একটি ক্ষুদ্র রাজার আশ্রয়ে থেকে চণ্ডীকাব্য লেখেন। আর যাঁরা মনসামঙ্গল লেখেন, তাঁরাও সকলে পশ্চিমবঙ্গের লোক। মহাপ্রভু চৈতন্যের বাড়ি নবদ্বীপ। চৈতন্য-ভাগবতের লেখক বৃন্দাবন দাসের বাড়িও সেইখানে। চৈতন্য-চরিতামৃতের লেকক কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ গ্রন্থ লেখেন বৃন্দাবনে বসে।

চৈতন্যের পরবর্তী যুগে তাঁর জীবনচরিত যাঁরা লিখেছেন এবং নানা পদাবলি রচনা করেছেন, তাঁরাও সব এই অঞ্চলবাসী। রামপ্রসাদ হালিসহরের লোক। ভারতচন্দ্র বর্ধমান জেলার পেঁড়ো গ্রামে জন্মেছিলেন। তারপর নানা অবস্থা-বিপর্যয়ে শেষটা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী কৃষ্ণনগর গিয়ে তাঁর অন্নদামঙ্গল লেখেন। এই অঞ্চলই নবাবি আমলের বঙ্গসাহিত্যের পীঠস্থান।

কী কারণে যে তা হয়, সে বিষয়ে নানা রকম অনুমান করতে পারা যায়; কিন্তু সম্ভবত সে অনুমান প্রমাণ করা যায় না। সে আমলের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থেই বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষা তার পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। সম্ভবত একটি বৌদ্ধ আখ্যান— ময়নামতীর গান— পূর্ববঙ্গে রচিত হয়েছিল।

এর পরে আমি ইংরেজি আমলের বঙ্গসাহিত্যের পরিচয় দেব। তাতে দেখতে পাবেন যে, আজও দুই-এক জন ছাড়া সব প্রধান লেখকই গঙ্গার উভয় কূলের লোক।

আমি কিছু কাল পূর্বে ইংরেজি ভাষায় একটি পুস্তিকা লিখি, এবং তার নাম দিই, Story of Bengalee Literature। তাতে আমি প্রথমেই লিখি, ইংরেজরা বাঙ্গলা ভাষায় গদ্যসাহিত্যের আমদানি করেন। নবাবি আমলে বিষয়কর্মের দলিলাদি গদ্যতেই লেখা হত। আমি রানি ভবানীর দত্ত অনেক ব্রহ্মোত্তর জমির দানপত্র স্বচক্ষে দেখেছি; সে সবই গদ্যে লেখা। ভুষোকালিতে লেখা সে সব পত্রের অক্ষর খুব বড়-বড়, ও বোধ হয় খাগড়ার কলমে লেখা। আর কালি এতই চমৎকার যে, আজ পর্যন্ত তা ফিকে হয়নি। জমিদারি সেরেস্তা ঘাঁটলে বোধ হয় এ জাতীয় দলিলপত্র আজও অনেক পাওয়া যায়। অবশ্য এ সব লেখাকে কোন হিসেবেই সাহিত্য বলা যায় না। Carey, Marshman প্রভৃতি শ্রীরামপুরের মিশনরিরা মুদ্রা-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং শ্রীরামপুরের কোন কর্মকারকে ছাপার অক্ষরের ছাঁচ তৈরি করতে শেখান। তার পরেই বাঙ্গলা ভাষায় নানা রূপ গদ্যপুস্তক প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। Fort William-এর অধ্যাপকরা 'যুবক সাহেবজাতগণ'কে কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রণয়ন করেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যলেখক কে, তা বলা কঠিন। রামরাম বসু যে নন, তার প্রমাণ রাজা রামমোহন রায় তাঁর লেখা মেজে-ঘষে দিয়েছিলেন, এই হচ্ছে অনেকের মত। রামমোহন রায় তার বাঙ্গলা গ্রন্থাবলির প্রথমেই লিখেছিলেন যে, বাঙ্গালিরা আজ পর্যন্ত গদ্য লিখতে শেখেনি। এমনকী, তাদের অনূদিত প্রত্যক্ষ কানুনেরও অর্থ উদ্ধার করা যায় না। সে সবই হযবরল। এই সব হযবরল-কে কী করে বাঙ্গলা গদ্যে পরিণত করা যায়, তা-ও রামমোহন রায় দেখিয়ে দিয়েছেন।

Fort William কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বাঙ্গলা রচনা আমার খুব ভালো লাগে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সজনী দাস. ও ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থাবলি প্রকাশ করেছেন। আমি সে গ্রন্থাবলির অন্তর্গত 'প্রবোধচন্দ্রিকা' ও 'রাজাবলী' সকলকেই পড়তে অনুরোধ করি। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র আরম্ভের ভাষা অতি উৎকট। কিন্তু তা হলেও লেখক ব্যাকরণ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে অল্পের মধ্যে যে-আলোচনা করেছেন, তা খুব ভালো। অলঙ্কারশাস্ত্র তিনি দণ্ডীর কাব্যাদর্শ থেকে প্রায় কথায়-কথায় অনুবাদ করেছেন। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক রসিকতাজ্ঞান এ লেখাতেও প্রকাশ পায়। কাব্যাদর্শ অবশ্য প্রাচীন অলঙ্কারের আদি এবং প্রবীণ পুস্তক। তিনি নব্য অলঙ্কারেরও আলোচনা করেছেন, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা প্রভৃতি বিশেষ গুণ গ্রাহ্য করেননি। ন্যায়দর্শন তিনি কতকগুলি ছোট গল্প দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র প্রথম ভাগ বহুল পরিমাণে সংস্কৃত ভাষার অধীন। কিন্তু তার দ্বিতীয় ভাগে পণ্ডিত মহাশয় কতকগুলি গল্প বলেছেন, এবং সেই সূত্রে স্থানে-স্থানে চমকপ্রদ চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন, তখনকার মৌখিক ভাষার নমুনা

হিসেবে। আমি রাজসাহীর সাহিত্য সম্মিলনে যে-অভিভাষণ পাঠ করি, তাতে তাঁর লিখিত একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছি। সে বর্ণনা পড়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অবাক হয়ে যান। তিনি আমাকে বলেন যে,— আগে কী ভাষাই ছিল, আর আমরা তাকে কী ভাষায় পরিণত করেছি।

'রাজাবলী' হচ্ছে ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাসের গ্রন্থ। সে গ্রন্থে হিন্দু যুগের ইতিহাস নগণ্য। তারপর মুসলমান যুগের বিষয়ে তিনি যা লিখেছেন, তা মোটামুটি সত্য। আর সিরাজদ্দৌলাকে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজরা মেরে কী করে রাজা হয়ে বসলেন, তার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করেছেন। সে নাটকের প্রধান পাত্রদের চরিত্র এবং ব্যবহার সম্বন্ধেও তিনি নিঃসঙ্কোচে সব কথা বলেছেন। তিনি উক্ত পুস্তকে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের বিষয় যা লিখেছেন, তা মূলত সত্য। আমি উক্ত বর্ণনা অবলম্বন করে পানিপথের যুদ্ধের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি। কাশীনাথ রাও বলে একটি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ উক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। এবং তিনি স্বচক্ষে যা দেখেছেন, তার আনুপূর্বিক বিবরণ ফারসি ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই ফারসি পুস্তিকাখানি ব্রাউন নামক কোন ইংরেজ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এবং সেই পুস্তিকাই এ বিষয়ে পরবর্তী মহারাষ্ট্রের ইতিহাসের আজ পর্যন্ত একমাত্র অবলম্বন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এ ঐতিহাসিক তথ্য যে কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন, তা আমার কাছে একটা রহস্য রয়ে গেছে। কারণ তিনি ইংরেজিও জানতেন না, ফারসিও জানতেন না। সে যা-ই হোক, 'রাজাবলী' বইখানি পাঠ্য। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' একখানি text book মাত্র। 'রাজাবলী' হচ্ছে তার কাটছাঁট বাদ দিয়ে বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এ বইখানির ভাষায় অসংখ্য ফারসি শব্দ আছে, যে-সকল শব্দ লোকের মুখে তখন প্রচলিত ছিল।

আমি পূর্বে বলেছি যে ইংরেজি আমলের আগে বাঙ্গলায় গদ্যসাহিত্য ছিল না। তাই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কী করে এমন গদ্য লিখলেন, তা বোঝা শক্ত। 'রাজাবলী'ই প্রমাণ যে, গান এবং পাঁচালি ছাড়া ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালিরা পুস্তক ও পুস্তিকা রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় বিদ্যা-লঙ্কার মহাশয়কে গদ্য লিখতে শেখাননি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে রামমোহন রায়ের পরিচয় ছিল, এবং তিনি পণ্ডিত মহাশয় ও তাঁর পাণ্ডিত্যের বিষয় নিজ গ্রন্থেই উল্লেখ করেছেন। উপনিষদ্‌গুলি যে তাঁর স্বরচিত নয়, তা প্রমাণ করবার জন্য তিনি বলেছেন যে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বাড়িতে গেলেই সব উপনিষদ্ দেখতে পাবেন, সেগুলি আমি বানাইনি।

বাঙ্গলার অদ্বিতীয় মহাপুরুষ রামমোহন রায়, যিনি নানা দিক দিয়ে বর্তমান বাঙ্গলা গড়ে তুলেছেন, তিনি বাঙ্গলা গদ্য গড়বার উপায়ও বলে দিয়েছেন। তাঁর

ইংরেজি ও বাঙ্গলায় নানা জীবনচরিত আছে। কিন্তু তার কোনটিই সন্তোষজনক নয়। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহন রায় সম্বন্ধে সম্প্রতি যে-পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, সেইটিকেই আমি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মনে করি। লেখক অসাধারণ পরিশ্রম করে রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছেন, যা পূর্বে আমাদের জানা ছিল না। তিনি সন্দেহ করেন যে, রামমোহন রায় বাঙ্গলার আদি গদ্যলেখক নন। কিন্তু তাঁর পুস্তকে তিনি রামমোহন রায়ের গদ্য লেখার যে-সব নমুনা তুলে দিয়েছেন, সেইগুলি পড়লেই তিনি যে গদ্য লেখবার হদিশ বাতলেছেন, তা সকলেই দেখতে পাবেন। উপরন্তু, তিনি গৌড়ীয় ব্যাকরণ নামক একখানি ছোট ব্যাকরণ লেখেন। আমার বিশ্বাস যে, সেইখানি বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ। তাতে তিনি ব্যাকরণ কাকে বলে, সে কথা অতি সহজ ভাষায় বিশদ ভাবে পাঠকদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাকরণখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত হওয়া অতি বাঞ্ছনীয়। রামমোহন রায় যদি কোন ভুলভ্রান্তি করে থাকেন, তা হলে এই নতুন সংস্করণে পাদটীকায় সে কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শুধু নতুন সম্পাদক যেন মনে রাখেন যে, এটি সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়,— গৌড়ীয় ব্যাকরণ। তাই এতে সন্ধি-সমাসের বর্ণনা নেই; গ্রন্থকার দু'কথায় এ দুটি বিষয় সেরেছেন। রামমোহন রায়ের ভাষা অবশ্য সংস্কৃতবহুল। তার কারণ, তিনি ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি যে-সব গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাতে সংস্কৃত শব্দ বাদ দেওয়া যায় না। তাঁর ভাষার আর-একটি দোষ এই যে, তিনি তাঁর লেখা punctuate করেননি। আমি পূর্বে তাঁর একটি লেখা নিজে punctuate করে প্রকাশ করি, তাতে সে লেখা জলবত্তরল হয়েছে।

রামমোহন গুটি-কতক গানও রচনা করেন। কিন্তু তিনি কবি ছিলেন না বলে সেগুলি আজ পর্যন্ত প্রচলিত নেই; এক কালে ছিল। তাঁর লেখায় হাস্যপরিহাস দেদার আছে; কিন্তু কোন জায়গায় অভদ্রতা নেই। তাঁর বিরোধী পক্ষকে তিনি হাস্যাস্পদ করবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু কখনও কোন ইতর মনোভাব প্রকাশ করেননি। যে-কালে রামমোহন রায় এ দেশে আবির্ভূত হন, সে কালে তাঁকে পাঁচ ভাষায় গ্রন্থ লিখতে হয়েছে; ফারসি. কিঞ্চিৎ আরবি, সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাঙ্গলা। ইংরেজরা এ দেশে কী কী নতুন মনোভাব আমদানি করেন, এবং কী পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র গড়ে তোলেন, তা তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। এবং সে সব বিষয়ে তিনি তাঁর নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। কোনটি গ্রাহ্য করেছেন. কোনটি করেননি। দুঃখের বিষয়, পলিটিকস ও শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর অতি চমৎকার লেখাগুলি তিনি ইংরেজিতেই লিখেছেন।

এব পর Fort William কলেজের অধ্যাপক ব্যতীত অপরের দ্বারা যে-সব পুস্তক লেখা হয়, তাদের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় নেই। কিন্তু দু'খানি বই,—

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা',— প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ দু'খানি আজও পাঠ্য। প্রথমখানি সম্প্রতি বোধ হয় পাঠ্য পুস্তক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। 'আলালের ঘরের দুলাল' নভেল হিসেবে অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তাতে ইস্কুল, আদালত প্রভৃতি বিষয়ের যে-সব বর্ণনা আছে, তার থেকে সেকালের একটি সঠিক সমাজচিত্র পাওয়া যায়। এ বইখানির ভাষা আমরা এ কালে যাকে চলতি ভাষা বলি, ঠিক তা নয়। বরং মূলত সাধু ভাষা বললেও চলে। কিন্তু মধ্যে-মধ্যে লেখক টেকচাঁদ ঠাকুর এমন খাঁটি বাঙ্গলা লিখেছেন, যা পড়ে অবাক হতে হয়। বাঙ্গলা ভাষার প্রাণ যে কোথায়, তা আবিষ্কার করা যায়। এ গদ্য ইংরেজি গদ্যের অনুকরণে লেখা হয়নি। তারপর কালীপ্রসন্ন সিংহ অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত বাঙ্গলায় অনুবাদ করেন। আজ পর্যন্ত এই অনুবাদই মহাভারতের সর্বোৎকৃষ্ট অনুবাদ। শুনতে পাই, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির হাতও এ অনুবাদে আছে। এর পর কালী সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা' প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থখানি হচ্ছে তখনকার সমাজের আগাগোড়া বিদ্রূপ এবং অতি চমৎকার লেখা। এ বই সেকালের কলিকাতা শহরের চলতি ভাষায় লেখা। এ রকম চতুর গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় আর দ্বিতীয় নেই। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর একটি সুন্দর সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। যাঁরা এ পুস্তক পড়েননি, তাঁদের তা পড়তে অনুরোধ করি।

ইতিমধ্যে বাঙ্গলায় অনেকগুলি সংবাদপত্র বেরোয়। এবং তার থেকে দেখা যায় যে, আজকাল যে-সব বিষয় নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি,— যথা স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা,— সে-সব বিষয় সেকালের সংবাদপত্রেও আলোচিত হয়েছে। এই কারণে এ যুগকে আমি ইতিপূর্বে প্রধানত সংবাদপত্রের যুগ বলেছি;— দৈনিক নয়, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সংবাদপত্র। এই সব সংবাদপত্র-লেখকদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন প্রধান। তিনি অনেক কবিতাও লিখেছেন। এমনকী, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনাবলি সম্বন্ধে একখানি বই লিখেছেন। এর পর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' নামক একখানি কবিতার বই লেখেন। আমরা ছেলেবেলায় উক্ত পুস্তিকার কোন-কোন অংশ মুখস্থ করতে এবং আবৃত্তি করতে বাধ্য হতুম। আমার এখনও তার দু'চার ছত্র মুখস্থ আছে। যথা—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায়।"

আর "বাদলের বারিধারা প্রায়
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়।"

ইতিমধ্যে Fort William কলেজ বোধ হয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবং হিন্দু কলেজ নামক একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল। Fort William

কলেজের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ কর্মচারীদের বাঙ্গলা, ফারসি প্রভৃতি এ দেশের ভাষা শেখানো। হিন্দু কলেজের উদ্দেশ্য হল প্রধানত বাঙ্গালি ভদ্রসন্তানদের ইংরেজি ভাষা, ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস এবং কিঞ্চিৎ দর্শন শিক্ষা দেওয়া। হিন্দু কলেজে সংস্কৃত শেখানো হত না। ফলে বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পরিচয় ছিল না। এ কলেজের অনেক ছাত্র পলিটিকস নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। এবং কেবল মাত্র ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রসাদে তাঁরা আমাদের সমাজকে ওলোট-পালোট করবার চেষ্টায় ছিলেন। একমাত্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণে বাঙ্গলা কাব্য লেখেন। মিল্টন প্রভৃতির নজিরে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁর কবিতা লেখেন। তাঁর রচিত 'মেঘনাদ বধ কাব্য'কে আজও অনেক লোকে মহাকাব্য বলে মনে করেন। কিন্তু আমি তাঁর কৃত্রিম ভাষায় রচিত কাব্যগুলি বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করি।

রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' বইখানি পড়ে দেখবেন, তাতে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় পাবেন।

আমি রঙ্গলালের বিষয় উল্লেখ করেছি। তিনি অবশ্য মাইকেলের পরবর্তী সাহিত্যিক। কিন্তু কী ভাষায়, কী ছন্দে, কী মনোভাবে, মাইকেলের কোন প্রভাব তাঁর লেখায় বিন্দু মাত্র নেই। সত্য কথা বলতে, মাইকেলি ধাঁচায় তাঁর পরবর্তী কোন কবি লেখেননি। অবশ্য তাঁর লেখার দু'টি-একটি প্যারডি আছে, যথা : 'ছুছুন্দরী বধ কাব্য' ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত উদ্ধার কাব্য'। শেষোক্তটি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। এটিকে আমি মনে করি বঙ্গসাহিত্যের একটি রত্ন। মাইকেলকে ব্যঙ্গ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তিনি মাইকেলি ভাষাকে হাস্যাস্পদ করেছেন। সে ভাষার কী কী দোষ, বহু কাল পূর্বে রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস'-এ বলে গিয়েছেন; আর তাঁর সমালোচনা আমাদের আছে আজও সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হয়।

সিপাহি বিদ্রোহের সময় নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব প্রথম বি.এ. বঙ্কিমচন্দ্র। এ বিদ্যালয়ে বোধ হয় সংস্কৃত পড়ানো হত। উপরন্তু সিপাহি বিদ্রোহ ছাত্রদের মনে নতুন মনোভাব আনলে। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সে যুগে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অদ্বিতীয় সাহিত্যিক। তিনি শুধু নভেলই লেখেননি, নানা বিষয় আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও ইংরেজির প্রভাব থেকে মুক্ত নন। এমনকী, তাঁর প্রথম নভেল 'দুর্গেশনন্দিনী'কে লোকে মনে করত Walter Scott-এর Ivanhoe অবলম্বনে লিখিত। সে যা-ই হোক, তিনি বাঙ্গলার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। আজ পর্যন্ত তাঁর মতো গল্প-বলিয়ে আর কেউ হননি। তাঁর সময় Mill-এর প্রভাব খুব বেশি ছিল। তিনি মিল-এর শিষ্য ছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিল-এর জনৈক ভক্ত Seeley-র প্রভাবও তাঁর ধর্ম এবং দর্শন ইত্যাদি বিষয় লেখায় ধরা পড়ে। এ স্থলে

আমি আর-একটি কথা বলতে চাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী লেখক। এবং লোকের বিশ্বাস যে, বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও এক নতুন ভাষার সৃষ্টি করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যা লিখে গেছেন, তা সবই বোধ হয় ইস্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তক। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার বিষয় হচ্ছে প্রধানত উপন্যাস। সুতরাং এ দুই লেখকের ভাষার তুলনা করা অসম্ভব। বিদ্যাসাগরী ভাষা অতি সহজ গদ্য। বাঙ্গলা ভাষাও যে syntax-এর গুণে অতি চমৎকার ভাষা হতে পারে, তা প্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখে দেখিয়ে দেন। তাঁর 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি পুস্তক যথেষ্ট সংস্কৃতবহুল। কিন্তু 'বিধবা বিবাহ' ও 'বহুবিবাহ' পড়ে দেখবেন যে, তাঁর বাঙ্গলা ভাষার শক্তি এবং গতি কী চমকপ্রদ। যদিচ সে ভাষা 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'র ভাষা নয় এবং কলকাতার চলতি ভাষাও নয়। তাঁর এ দুই গ্রন্থের ভাষা যেমন সচল তেমনি সাবলীল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার সেকালে একটু নতুনত্ব ছিল। কিন্তু কী গুণে যে তা নতুন, তা বলা কঠিন। আমার বিশ্বাস, তাঁর বলবার ভঙ্গিটিই নতুন। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বহু পূর্বে বলেছেন যে, 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভাষার চাইতে এ ভাষা উন্নত ও মধুর, এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'র ভাষার সগোত্র। তা অবশ্য নয়। তার পরে রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করেছেন; কিন্তু বিষয়বস্তুতে, ভাষায় নয়। তিনিও লিখেছেন ঐতিহাসিক উপন্যাস।

তারপরে কোন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমি ভাষায় লিখেছেন বলে আমি জানিনে। এমনকী, তাঁর ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন, অথচ সুন্দর। এ কালের নভেল-লিখিয়েরা কেউ তাঁর ভাষায় লিখতে চেষ্টা করেননি। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলায় একটি standard prose গড়ে যাননি। তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় লেখক। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। অতএব একটা যুগকে আমরা যে বঙ্কিমি যুগ বলি, তা যথার্থই বলি।

আমি পূর্বে মাইকেলকে মহাকবি বলে স্বীকার করিনি। কিন্তু তিনি যে কবি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর 'বীরাঙ্গনা কাব্য' পড়ে দেখবেন; কোন অকবি এ কাব্য রচনা করতে পারতেন না। আজ পর্যন্ত অপর কেউ ও-জাতীয় কাব্য লিখতে চেষ্টাও করেননি, পারেনও নি।

তারপর অনেক দিন ধরে যাঁরা কবিতা লিখেছেন, তাঁরা এক বর্ণ না লিখলেও বঙ্গসাহিত্যের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। আমি যাদের লেখার কিছু-না-কিছু প্রশংসা না করতে পারি, তাদের কাব্যের বিষয় নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করি। মাইকেলের পরে এবং রবীন্দ্রনাথের পূর্বে অপর কেউই কবিযশ পাবার উপযুক্ত হননি। একমাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া। যাঁরা তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' পড়েছেন, তাঁরা এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন। তাঁর ভাষা ও ছন্দ চমৎকার। এবং ও-কাব্যে ইংরেজি

সাহিত্যের কোন প্রভাব নেই। এতদ্ব্যতীত তিনি মজা করে যে-ক'টি কবিতা লিখেছেন, তার humour আমাদের যেমন আনন্দ দেয় তেমনি অবাক করে। বাঙ্গলা ভাষার উপর তাঁর এমন অধিকার ছিল যে, তিনি সে ভাষা নিয়ে অবলীলাক্রমে খেলা করতে পারতেন। বঙ্কিমি যুগকে ছাড়িয়ে আমরা একেবারে রবীন্দ্রযুগে এসে পড়ি, যে-যুগ রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত।

বঙ্কিমের পরে এবং রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাঙ্গালিরা যে গদ্যসাহিত্য রচনা বন্ধ করেছিলেন, তা অবশ্য নয়। অনেকে ইংরেজি সাহিত্য থেকে পুস্তক অনুবাদ করবার ভার নিয়েছিলেন। যত দূর মনে পড়ে, আমি নিম্নলিখিত অনূদিত গ্রন্থাবলি দেখেছি এবং কতক-কতক পড়েছি : সমগ্র একাধিক সহস্র রজনী, টমকাকার কুটীর, রবিনসন ক্রুসো, রাসেলাস, পারস্য উপন্যাস, Wandering Jew প্রভৃতি। এই অনুবাদকদের যথেষ্ট দম ছিল। কেউ-কেউ আবার মূল গ্রন্থ লিখতেও চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে রজনী গুপ্তের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' এক কালে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। রামগতি ন্যায়রত্নের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' সম্পূর্ণ অভিনব এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তিনি প্রতি লেখক ও কবির বাস কোথায় ছিল, তা খুঁজে বের করেছেন। তিনি বঙ্কিম ও মাইকেলের প্রশংসা করেছেন, সেই সঙ্গে তাঁদের ভাষার প্রতি টিটকারিও দিয়েছেন। এক হিসেবে এ বইখানি critical। কবি-কঙ্কণের তারিখ সম্বন্ধে বিচারটি পড়ে দেখবেন।

এ জাতীয় গ্রন্থসকল বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রবাহকে মন্দীভূত হতে দেয়নি।

বাঙ্গালির লেখা কোন দর্শন কি বিজ্ঞানের পুস্তক দেখিনি। অবশ্য দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকে প্রবন্ধ লিখেছেন, যথা: হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ধর্ম সম্বন্ধে কেউ-কেউ দুটি-একটি ভালো গ্রন্থ লিখেছেন, যথা: হীরেন্দ্র-নাথ দত্তের 'গীতার ঈশ্বরবাদ' এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম'।

ইতিপূর্বে বাঙ্গালি অনেক ছোটখাটো গান রচনা করেছেন। এবং কতকগুলি গান খুব লোকপ্রিয়ও হয়েছিল, যথা: গোবিন্দ রায়ের 'নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও", এবং "কত কাল পরে বল ভারত রে দুখসাগর সাঁতরি' পার হবে", এবং মনোমোহন বোসের "দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন"। এ তিনটির কোনটিই প্রেমের কবিতা নয়, অথচ বাঙ্গালিকে মুগ্ধ করেছিল। কোন-কোন ব্রহ্মসঙ্গীতও সেকালে খুব প্রচলিত হয়েছিল। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতসঙ্গীত'-এর উল্লেখ করলুম না; কারণ এমন বাঙ্গালি বোধ হয় নেই, যিনি সেটির সঙ্গে সুপরিচিত নন।

আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, নবাবি আমলে কোন নাটক লেখা হয়নি। ব্রিটিশ যুগে সর্বপ্রথম আমরা নাটকের সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু সেগুলি ইংরেজি নাটকের অনুবাদও নয়, অনুবৃত্তিও নয়। কতকগুলি সংস্কৃত নাটকের বাঙ্গলা অনু-

বাদ। অপরগুলির বিষয়বস্তু, হয় কোন পৌরাণিক উপাখ্যান, না হয়তো সমসাময়িক সমাজচিত্র। আমি যত দূর জানি, রামনারায়ণ তর্করত্ন নামক কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সর্বপ্রথম 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নামে একখানি নাটক লেখেন। ও-নাটকের নামেই পরিচিত যে, এ খানি কৌলীন্য প্রথার উপর আক্রমণ। এর পর শুনতে পাই যে, তিনি 'নবনাটক' নামে আর-একখানি নাটক লেখেন। তারপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'পদ্মাবতী' ও 'শর্ম্মিষ্ঠা' নামে দু'খানি নাটক রচনা করেন; ও পরে দু'খানি প্রহসন লেখেন— 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'। এ সবগুলিই কী নাটক কী প্রহসন হিসেবে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নামে একখানি নাটক, ও 'সধবার একাদশী' নামে একখানি প্রহসন লেখেন। তিনি আরও খান-কতক নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু সেগুলি নগণ্য। 'নীলদর্পণ' সেকালের নীল-করদের অত্যাচারের একটি বর্ণনা। এদানি কেউ আর সেটি অভিনয় করেন না। 'সধবার একাদশী' কিন্তু আজও একটি জনপ্রিয় নাটিকা।

তারপরে বোধ হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী' ও 'পুরুবিক্রম' নামক তিনটি নাটক রচনা করেন। 'সরোজিনী' এক কালে খুব লোকপ্রিয় ছিল। তিনি দু'খানি প্রহসনও লেখেন— 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' এবং 'এমন কর্ম আর করব না'। শেষোক্তটি যথার্থ প্রহসন, এবং এখনও 'অলীকবাবু' নামে অভিনীত হয়। বহু পরে তিনি বহু পরিশ্রমপূর্বক প্রায় সমস্ত সংস্কৃত নাটক বাঙ্গলায় অনুবাদ করেন।

এর পর অবশ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি অনেকে থিয়েটারের জন্য নাটক লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান একটি সম্পূর্ণ নতুন শ্রেণীর চমকপ্রদ জিনিস, যা বোধ হয় বহু লোকের কাছে সুপরিচিত।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার বেশি কিছু বলবার নেই। তাঁর বিরাট প্রতিভা সাহিত্যের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অতুলনীয় হয়ে রয়েছে। তিনি একাধারে কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোট-গল্পলেখক ও প্রবন্ধলেখক। তাঁর প্রবন্ধে ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি কোন বিষয়ই উপেক্ষিত হয়নি; এবং এ সব লেখাই লোকের মনকে জাগ্রত করেছে, উন্নত করেছে। রবীন্দ্রনাথ স্বজাতির হাতে এক হিসেবে দূরবিন দিয়েছেন, যার সাহায্যে বাইরের জগৎ দেখা যায়; আর সেই সঙ্গে অনুবিন দিয়েছেন, যার সাহায্য মনোজগৎ দেখা যায়। আর তাঁর কথা সকলেই শুনতে পেয়েছে, কারণ তিনি খাদে গলা সাধেননি। আমরা এখন তাঁরই মানসিক আব-হাওয়াতে বাস করছি। সুতরাং আমাদের পক্ষে তাঁর সাহিত্যের বিচার করা সম্ভব নয়। আমরা এখন কেবল তাঁরই কথায় বলতে পারি :

"তুমি কেমন করে' গান কর যে গুণী
আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।"

অনুবাদের কথা

বাঙালি ছোটগল্প পড়তে ভালোবাসে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে বাঙালি বংশে আর্য। এবং এখনও সে তার আর্যমন হারায়নি।

সংস্কৃত সাহিত্যকে কথা-সরিৎ-সাগর বললে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের আর্য পিতামহেরা গল্প বাদ দিয়ে কী দর্শন, কী বিজ্ঞান, কী ধর্মশাস্ত্র, কিছুই লিখতে পারতেন না। বেদে গল্প আছে, ব্রাহ্মণে গল্প আছে, উপনিষদে গল্প আছে।

তার পর মহাভারতে অগণ্য উপাখ্যান আছে আর তার একটিও নগণ্য নয়। কেউ যদি অনুগ্রহ করে সেগুলি গুণে ফেলেন তো দেখতে পাবেন যে তার সংখ্যা হাজারের কম হবে না। পুরাণের হিসেবও ঐ। রামায়ণের মূল আখ্যান অবশ্য তার মুখ্য আখ্যান, কিন্তু তাই বলে যে তাতে বাজে গল্প নেই তা নয়। আর সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে কাব্য, তা তো আগাগোড়াই গল্প, অবশ্য দু'-লাইন চার-লাইনের কবিতাগুলো বাদ দিয়ে। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস নেই, তার কারণ এ দেশ উপন্যাসের দেশ।

ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য ছেড়ে যদি বৌদ্ধ সাহিত্য ধরি— তা হলে তো একেবারে কথা-সমুদ্রে ডুবে যাই। প্রথমত ভগবান বুদ্ধের জীবনচরিত একটা মহা রূপকথা। তার পর ও-সাহিত্যের মূল গ্রন্থ হচ্ছে তো 'কথাবত্থু'। বৌদ্ধ দর্শন বলে অবশ্য একটা দর্শন আছে। কিন্তু তার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তা কেউ বুঝতে পারে না। আর যাঁরা বলেন যে তাঁরা বুঝেছেন, যথা ইউরোপীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতরা, তাঁরা অপর কাউকে তা বোঝাতে পারেন না। উক্ত দর্শনের এঁদের ব্যাখ্যা পড়লে আমার মনে হয় যে, হয় আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, নয় তাঁদের মাথা খারাপ। সে যা-ই হোক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বৌদ্ধ সাহিত্যের আসল জিনিস হচ্ছে 'জাতক'। যদি কেউ মনে ভাবেন যে 'অভিধর্মের' লোভে জনপ্রাণী বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করেছিল, তা হলে বলি, তিনি পালি জানতে পারেন, কিন্তু লোক-চরিত্র জানেন না। 'জাতক' ও 'অবদান'ই হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের দেহ ও প্রাণ। আর বৌদ্ধ ধর্মের দেশি শাস্ত্রীরা তা বিলক্ষণ জানতেন। তাই পালি সাহিত্যে জাতকের একটি স্বতন্ত্র সংগ্রহ আছে। আমরা 'চার আর্যসত্য' মানি আর না-মানি, পঞ্চ

'অভিজ্ঞা' লাভ করি আর না-করি, এই গল্প-সাহিত্য আমাদের কাছে অতি মূল্য-বান। এই গল্প-সাহিত্য হচ্ছে ভারতবর্ষের যথার্থ লোকসাহিত্য। বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করবার পূর্বে এ সাহিত্য ভারতবর্ষের লোকসমাজে মুখে-মুখে প্রচলিত ছিল— এবং আজ আবার তা হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এই গল্প-সংগ্রহ পালি থেকে বাঙলায় তরজমা করেছেন। এটা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে তাঁর এই অনুবাদ বাঙলার পাঠক-সমাজের কাছে সুপরিচিত নয়। তবে আজ না হোক কাল যে তাঁর 'জাতক' বাঙলার ছেলেমেয়েদের হাতে-হাতে [ঘুর]বে সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।

বৌদ্ধ সাহিত্য পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে, কিন্তু সে অনুবাদ করা হয়েছে— হয় পালি, নয় সংস্কৃত হতে— অর্থাৎ আমাদের দুটি ঘরের ভাষা থেকে। চীনে, তিব্বতি প্রভৃতি ভাষায় এ সাহিত্যের অনুবাদ কত দূর হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী তা আমি বলতে পারিনে। তবে তার ইংরেজি অনুবাদে যে আমাদের মন ওঠে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে অনুবাদে সার থাকতে পারে, কিন্তু রস নেই। দেশি কথা আমাদের মনে যত শিগগির যে-ভাবে ঘা দেয়— বিদেশি কথা তার সিকির সিকিও দেয় না। এই কারণে আমি মনে করেছিলুম যে অবসর-মতো বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য থেকে দু-চারটি গল্প বাঙলা করব। আমার ধারণা ছিল যে তা করাও তেমন শক্ত নয়। পালি ভাষা আমি জানিনে, কিন্তু চিনি, অর্থাৎ তার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় আছে। ধরুন, এই পালি শ্লোকটি হঠাৎ আমার চোখে পড়ল :

যথাগারং দুচ্ছন্নং বুট্‌ঠী সমতিবিজ্‌ঝতি।
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমতিবিজ্‌ঝতি॥

তা হলে দেখবা মাত্র মনে হয় যে, এ আমার চেনা ভাষা, যদিচ এর মানে আমি ঠিক ধরতে পারছিনে। এ শ্লোকের সানুনাসিক কথাগুলোর মানে আন্দাজ করতে পারি, বাকি কথাগুলো নিয়েই একটু মুস্কিলে পড়তে হয়। এমন সময় কেউ যদি বলে দেন যে 'বুট্‌ঠী' মানে বিষ্টি, তখনই সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। ইংরেজিতে এর যথার্থ অনুবাদ হতে পারে না, কেননা ইংরেজের ঘর আমাদের ঘরের মতো ছাওয়া নয়— তার পর rain মানে 'বিষ্টি' নয়। বিলেতের rain হচ্ছে গলিত কুয়াশা, সে তরল পদার্থ কারও ঘরের চাল ফুড়ে তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না, যদিচ ইংরেজদের চিত্তে রাগ অতি সহজে প্রবেশ করে।

পালির চাইতে বৌদ্ধ-সংস্কৃত আমাদের ঢের বেশি নিকট আত্মীয়। ও-ভাষা মূলত সংস্কৃত, তবে তার ভিতর অসংখ্য আর্ষ প্রয়োগ আছে। আর না হয় তো তা সেকেলে প্রাকৃতের সাধু ভাষা অর্থাৎ তা মূলত প্রাকৃত, তবে তার ভিতর দেদার

সংস্কৃত কথা আছে। তার পর এই বৌদ্ধ-সংস্কৃতও এক ভাষা নয়; আমাদের সাধু ভাষার মতো তার প্রতি গ্রন্থের ভাষা স্বতন্ত্র। এর কোন বইয়ের ভাষা সহজ, কোন বইয়ের ভাষা অপেক্ষাকৃত কঠিন। যিনি পঞ্চতন্ত্র পড়ে বুঝতে পারেন, তিনি 'দিব্যাবদান' পড়ে কেন যে বুঝতে পারবেন না তা আমার বুদ্ধির অগম্য। মধ্যে-মধ্যে উক্ত গ্রন্থে এমন এক-একটা কথা দেখা দেয়, যার মানে অবশ্য আমরা জানিনে, কিন্তু ঐ অজ্ঞাত-কুলশীল কথার সংখ্যা 'দিব্যাবদান'-এ খুব কম। 'ললিত-বিস্তর'-এর ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাকৃত-দোষে দুষ্ট, আর তার চাইতেও কটমটে হচ্ছে 'মহাবস্তু'র ভাষা। তবে সে ভাষা আমাদের কাছে গ্রিক নয়। তার দুটি-একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। ঐ নমুনা থেকেই দেখতে পাবেন যে সে ভাষা অসংস্কৃত সংস্কৃত।

স্ত্রিয়ঃ সমর্থা পুরুষা নিযোক্তুং
যো তত্র ভদ্রো স্ত্রিয় এব মূলং।
যে চাপি সংগ্রামহতা নরেন্দ্রা।
তেষাং প্যনয়ো স্ত্রিয় এব মূলং॥

উক্ত শ্লোকের ভাষা চাণক্যশ্লোকের ভাষার চাইতে কি এতই তফাত যে তার মর্ম আমরা গ্রহণ করতে পারিনে! আর-একটি নমুনা দেওয়া যাক। রাহুল বলছেন :

অহং চৌরো মহারাজ অদিন্নং উদকং পিবে।
তস্য করোহি মে দণ্ডং যথা চৌরস্য ক্রিয়তি॥

এ ভাষার ব্যাকরণ অবশ্য মুগ্ধবোধ নয়। কিন্তু তার জন্য তরজমা আটকায় না। জনৈক মহাপণ্ডিতের কাছে শুনলুম যে গীতায় আর্ষ প্রয়োগের অন্ত নেই, কিন্তু সে কারণ অপণ্ডিত বাঙালি কি গীতা অনুবাদ করতে ভয় পান?

আমি অবশ্য বলতে চাইনে যে 'মহাবস্তু'র ভাষা উপরি-উক্ত শ্লোকদ্বয়ের মতো সংস্কৃতের একান্ত গা-ঘেঁষা। আমার বক্তব্য এই যে, বৌদ্ধ-সংস্কৃত বাঙলা করা তাদৃশ কঠিন ব্যাপার নয়। তার জন্য চাই ব্যাকরণকে উপেক্ষা করা আর শব্দার্থ আন্দাজি মারা।

কিন্তু প্রবাসীতে 'সৌন্দরানন্দ' কাব্যের অনুবাদের যে-সমালোচনা বেরিয়েছে, তা পড়ে অনুবাদ করা সম্বন্ধে আমার উৎসাহ একেবারে কমে গিয়েছে।

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত অনুবাদের যে-দোষ দেখিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে একটি কথাও আমার বলবার নেই। অনুবাদক মহাশয় বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপণ্ডিত বলে বিখ্যাত, অথচ তিনি যে অভিজ্ঞা শব্দের অর্থ জানেন না, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। অভিজ্ঞা শব্দের অর্থ জানবার জন্য, কী সংস্কৃত কী পালি, কোন ভাষাই জানবার প্রয়োজন নেই, ইংরেজি জানলেই তো ও-কথার মানে জানা যায়। 'কার্নে'র বইয়ে তো অভিজ্ঞা ইত্যাদি সকল কথার পুরো মানে দেওয়া

আছে। তাই শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিযোগ এ ক্ষেত্রে ডিসমিস করা চলে না। এ ক্ষেত্রে ছাপার ভুলের দোহাই দিয়ে সাফাই হওয়া যায় না। 'অভিজ্ঞা' কম্পোজিটারের হাতে 'অভিজ্ঞ' হতে পারে, কিন্তু কী করে যে 'অভিজ্ঞতা' হয়, তা আমার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। তবে কম্পোজিটার যদি পণ্ডিত হন— তা হলে স্বতন্ত্র কথা।

সে যা-ই হোক, উক্ত আলোচনায় আমি যোগ দিতে যাচ্ছিনে। ও-বিচার হচ্ছে পণ্ডিতের বিচার এবং তাতে আমার যোগ দেবার অধিকার নেই।

তবে এই সূত্রে শাস্ত্রী মহাশয় অনুবাদ করা সম্বন্ধে যে-সাধারণ মতামত প্রকাশ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমার দু'-এক কথা বলবার আছে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের মতানুসারে চলতে হলে, একমাত্র বৈয়াকরণ ও নিরুক্তকার ব্যতীত আর কেউ উক্ত সাহিত্যের অনুবাদ করবার অধিকারী হতে পারেন না। এখন আমার নিবেদন এই যে, ব্যাকরণ ও নিরুক্ত হচ্ছে science আর গল্প বলা art, গল্প অনুবাদ করার ভিতরও গল্প বলার আর্ট থাকা চাই। সুতরাং বৈয়াকরণ এবং কোষকারের ঘাড়ে 'জাতক' অনুবাদের ভার দেওয়া অনেকটা কামারের দোকানে চিনিপাতা দইয়ের ফরমায়েস দেওয়ার মতো। Science এবং art যে এক দেহে ভর করতে পারে না, তা অবশ্য নয়। ব্যাকরণ অভ্যাস করলেই যে মানুষকে 'জড়বুদ্ধি' হতে হবে 'প্রকাশকার' মম্মটভট্টের এ কথা আমি মানিনে, কেননা তা মানতে হলে কালিদাস উর্বশীকে দেখে যে বলেছিলেন :

বেদাভ্যাসজড়ঃকথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতূহলো
নির্ম্মাতুং প্রভবেন্ মনোহর মিদং রূপং পুরানো মুনিঃ?

তাতেও সায় দিতে হয়। যিনি বেদাভ্যাস কিম্বা ব্যাকরণ অভ্যাস করেন, তিনি যে মনোহর রূপ সৃষ্টি করতে পারেন না, সংস্কৃত কবি ও আলঙ্কারিকদের এই অত্যুক্তি অগ্রাহ্য করেও বলা যায় যে, science এবং art মানুষের পৃথক সাধনার বিষয়। এবং সচরাচর এক ঘটে ঐ দুই গুণ বর্তায় না। সুতরাং গল্প ভাষান্তরিত করবার অধিকার অপণ্ডিতেরও আছে।

শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে বিমলাবাবুর অনুবাদ critical নয়। আমার বিশ্বাস এ স্থলে শাস্ত্রী মহাশয় editor-এর কর্তব্যের সঙ্গে অনুবাদকের কর্তব্য ঘুলিয়ে ফেলেছেন। মূল গ্রন্থের যদি critical edition থাকে, তা হলে সেই গ্রন্থ অবলম্বন করে অনুবাদক অনায়াসে নির্ভুল তরজমা করতে পারেন। প্রথমটি হচ্ছে তাঁর কাজ যিনি ভাষার তত্ত্ব জানেন, দ্বিতীয়টি তাঁর যিনি কথার রূপ চেনেন। ঐ দুই একের কাজ হতে পারে, কিন্তু এক কাজ নয়। চরকা-কাটা আর তাঁত-বোনা এক কাজ নয়, এবং ও-দুই একের কাজ কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। 'সৌন্দরানন্দ' কাব্যের অনুবাদ দেখবার সৌভাগ্য আমার আজও হয়নি, কিন্তু আমি নির্ভয়ে বলতে

পারি যে, সে অনুবাদ কাব্যও হয়নি, সুন্দরও হয়নি, আনন্দের বস্তুও হয়নি। সেটি পড়ে কেউ বলবেন না যে, A thing of beauty is a joy forever.

শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে— "এত বড় পুস্তকের অনুবাদে একটি মাত্রও শব্দের অর্থাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কোন টীকা বা টিপ্পনী করা হয় নাই।" এর উত্তরে আমার বক্তব্য যে, উক্ত অনুবাদের সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিপ্রেত টীকা ও টিপ্পনী জুড়ে দিলে 'এত বড় পুস্তকের অনুবাদ' আরও এত বড় হয়ে উঠত যে, পাঠক সেটিকে দূর থেকে নমস্কার করে সরে যেত। সাহিত্যেও বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি মানুষের কাম্য বস্তু নয়। তারপর ও-রূপ টীকা-টিপ্পনীর কোন রূপ সার্থকতা নেই। শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে— "চারটি ধ্যান কি কি তাহাও বলা হয় নাই, যদিও অনুবাদকের বলা উচিত ছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ এই চারিটি রূপ ধ্যানের (বিতর্ক বিচার প্রীতিসুখ ও একাগ্রতা সহিত প্রথম ধ্যান ইত্যাদির) কথা এখানে বলা হইয়াছে।" এখন আমার জিজ্ঞাস্য যে, অনুবাদক মহাশয় যদি তা সবিস্তারে বলতেন তা হলেই কি বৌদ্ধ ধ্যানের মানে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত? যে-পাঠকের বৌদ্ধ শাস্ত্রের সঙ্গে কোন রূপ পরিচয় নেই, তাঁর পক্ষে ধ্যানও যা, বিতর্ক বিচার প্রভৃতিও তা-ই, অর্থাৎ সমান নিরর্থক, যেহেতু ওর প্রতিটি হচ্ছে technical শব্দ এবং সংস্কৃত অভিধানে ও-সকল কথার যে-অর্থ, বৌদ্ধ সাহিত্যে সে অর্থ নয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে চলতে হলে হয় বৌদ্ধ সাহিত্যের বাঙলায় অনুবাদ করা চলে না, নয়তো তার প্রতি কথার মানে করতে হয়। 'বুদ্ধ' 'ধর্ম' 'সঙ্ঘ' 'ভিক্ষু' 'আরাম' 'বিহার' প্রভৃতি কথাগুলো বাদ দিয়ে ও-সাহিত্য সম্বন্ধে এক পাতাও লেখা চলে না। আর এ কথাও ঠিক যে উক্ত শব্দগুলির বাঙলায় যা অর্থ— বৌদ্ধ সাহিত্যে সে অর্থ মোটেই নয়। এ অবস্থায় যেমন কথাটি মূলে আছে, তেমনিটি অনুবাদে থাকলে— 'অভিজ্ঞা' 'অভিজ্ঞতা' না হলেই— আমরা খুশি থাকি।

শাস্ত্রী মহাশয় অপর একটি কারণে অনুবাদে টীকাভাষ্যের সদ্ভাবের বিশেষ পক্ষপাতী।

বিমলাবাবুর অনুবাদ সম্বন্ধে তাঁর নিজের কথা এই— "অনুবাদ দেখিয়া ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বহু স্থানে অর্থটা অনুবাদকের নিকটে স্পষ্ট নহে।" যিনি যে কথা ব্যবহার করেন, সে কথার অর্থ তিনি জানেন কি না, এ প্রশ্ন করার অধিকার আমাদের নেই। ধরে নিতে হবে, তিনি জানেন। তাই অনুবাদকের কাছে এ প্রত্যাশা করা অতি স্বাভাবিক যে তিনি অন্তত মূলের অর্থ জানেন। অপর পক্ষে এ-ও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, বাঙালি লেখকদের সম্বন্ধে এ আশা করা অযথা যে, যে-সকল সংস্কৃত শব্দ তাঁরা ব্যবহার করেন তার প্রতি কথার অর্থ তাঁরা জানেন। যে-সংস্কৃত কথার মানে আমরা জানিনে, সে কথা আমরা লেখায়

ব্যবহার করতে পারব না, এই যদি সমালোচক মহাশয়দের রায় হয়, তা হলে আমাদের সাধু ভাষা লেখা বন্ধ হয়। তুঞ্জ শব্দের মানে আগে জেনে তা যদি পুঞ্জের সঙ্গে মেলাতে হয়, তা হলে আমাদের বাধ্য হয়ে অমিত্রাক্ষরে পদ্য লিখতে হবে, আর ফোয়ারার 'শিৎকারে' যদি আমাদের গায়ের জামা ভিজে না যায়, তা হলে আমাদের কবিহৃদয়ের জ্বালা জুড়োবে কীসে? ভাষা সম্বন্ধে লেখকের সাতখুন মাপ, কিন্তু অনুবাদক বেচারা যে না বুঝে কথা ব্যবহার করলে চোর-দায়ে ধরা পড়বেন, এর চাইতে অবিচার আর কী হতে পারে?

তার পর জানতে চাই যে, অনুবাদক যে-কথার মানে জানেন না, তার কীদৃশ টীকা তিনি করবেন? আমাদের দেশের লোক এ সম্বন্ধে যে একদম বে-পরোয়া, তার নজির আছে। 'মালবিকাগ্নিমিত্র'-এর একটি টীকায় দেখেছি যে, 'মৌর্যসেনা-পতির' অর্থ মৌর্য নামক জনৈক সেনাপতি, আর স্কুলে পড়েছি যে 'শাকপার্থিব'. মানে শাকভোজী পার্থিব। শাস্ত্রী মহাশয় কি বৌদ্ধ-সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদকদের কাছ থেকে এই নমুনার টীকা চান? আমার মতে, অনুবাদক মূলের যে-কথার অর্থ জানেন না, সে কথার উপর কোন রূপ হস্তক্ষেপ না করে অবিকৃত ভাবেই তা রেখে দেওয়া তাঁর পক্ষে উচিত। নচেত সমালোচকদের ভয়ে তাঁরা সে কথা হয়তো বাদ দিয়ে যাবেন। এ রকম বাদ দেওয়ার অভ্যেস এ দেশের লোকের আছে। একটা দৃষ্টান্ত দেই। মহাভারতের শান্তিপর্বের ২১৮ অধ্যায়ে বৌদ্ধ মতের আলোচনা আছে। উক্ত গ্রন্থের বর্ধমান মহারাজার প্রকাশিত বঙ্গানুবাদে উক্ত অধ্যায়টি কথায়-কথায় অনুবাদ করা হয়েছে। সম্ভবত অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়েরা তার একটি কথাও বোঝেননি। হুতোম-পেঁচা একটি বারোয়ারির সং দেখে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, যে সেটি হচ্চে বর্ধমান মহারাজার বাঙলা মহাভারতের মতো, প্রকাণ্ড ও দুর্বোধ্য। ফলে কালী সিংহ মহাশয় সম্ভবত তাঁর মহাভারত সুবোধ করবার জন্যই উক্ত অধ্যাযের সৌগত-মতের বিবরণটি তাঁর অনুবাদ থেকে বেবাক বাদ দিয়েছেন। কালী সিংহ মহাশয় যা করেছেন তা সুবোধ হতে পারে, কিন্তু অনুবাদ নয়। মূলকে নির্ভয়ে যাঁরা ছাঁটতে পারেন, তাঁরা নির্ভয়ে তাকে বাড়াতেও পারেন, ফলে অনুবাদ মৌলিক হয়ে ওঠে।

বাঙ্গালা ভাষায় 'কামসূত্র'-এর একখানি অনুবাদ আছে। তার ভিতর এমন সব পাতা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, মূলের সঙ্গে যার এক দপ্তরির সেলাইয়ের যোগ ব্যতীত অপর কোন যোগ নেই। বাৎস্যায়নের মুখে ইংরেজ রমণীদের রূপ-গুণের বিস্তৃত ও বিকৃত বর্ণনা পুরে দেওয়ায় যে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়া হয়, সে ধারণা পণ্ডিত মহাশয়দের আদপেই নেই। যে-দেশে অনুবাদ সম্বন্ধে পণ্ডিতের দল এত দূর যথেচ্ছাচারী, সে দেশে অপণ্ডিতের দলের পক্ষে মূলের মাছি-মারা অনুবাদ করে যাওয়াই নিরাপদ। 'মহাবস্তু'র শেষে আছে—

যাদৃশী পুস্তকং দৃষ্টা তাদৃশী লিখিতং ময়া।
যদি শুদ্ধমশুদ্ধং বা শোধনীয়ং মহদ্বুধৈ।।

উক্ত লেখকের মত অনুবাদকেরও পণ্ডিত ব্যক্তির হাতে সংশোধনের ভার অর্পণ করে মূল গ্রন্থের হুবহু অনুবাদ করে যাওয়া শ্রেয়। পাঠকেরা তা বুঝুক আর না বুঝুক।

মানুষে লেখে অবশ্য অপরে তা পড়বে বলে। অতএব পাঠক যাতে সে লেখার অর্থগ্রহণ করতে পারে, সে বিষয়ে লেখকদের বিশেষ যত্নবান হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এ বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই। কিন্তু লেখার আর-একটা দিক যে আছে, তা আমরা নিত্য ভুলে যাই। কোন লেখা বুঝতে হলে পাঠকেরও অনেকটা জ্ঞান থাকা চাই, অন্তত ভাষাজ্ঞান তো থাকাই চাই। যে-পাঠক বৌদ্ধ সাহিত্য পড়তে চান, সে পাঠকের সে সাহিত্যের অন্তত ক-খ জানা চাই। বৌদ্ধ গ্রন্থের এমন অনুবাদ কেউ করতে পারবে না, সাধারণ পাঠক যার সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। ও-শাস্ত্রের প্রথম ও শেষ কথার মানে, দু'কথায় কি বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব?

যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা হেতুন্তেষাং তথাগতো।
হ্যবদত্তেষাং চ যো নিরোধা এবংবাদী মহাস্রমণঃ।।
(মহাবস্তু, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬১)

উপরি-উক্ত শ্লোকের দু-ছত্রে অনুবাদ করে দেখুন, পাঠক তার মাথামুণ্ডু কী বোঝে। অথচ এর চাইতে সংস্কৃত আর কত সহজ হতে পারে?

বৌদ্ধ সাহিত্যের গল্প-ভাগ অবশ্য ভাষায় অনুবাদ করা ঢের সোজা। কেননা সে গল্পের রস উপভোগ করবার জন্য কারও পক্ষে বৌদ্ধ শাস্ত্র জানা আবশ্যক নয়। আমি পূর্বে বলেছি যে, বুদ্ধ জন্মাবার বহু পূর্বে এ সব গল্প জন্মলাভ করেছে। এ সকলের আরম্ভে ও উপসংহারে বুদ্ধের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যে-সব বাজে-কথা জুড়ে দিয়েছেন, তার পুরো মানে বোঝা অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মের জ্ঞান-সাপেক্ষ। তবে উপর-নিচের ঐ প্রক্ষিপ্ত অংশটুকু ছেঁটে দেওয়ায় সে গল্পের কিছু মাত্র অঙ্গহানি হয় না। ঐ কথামালার ল্যাজা-মুড়ো বৌদ্ধ দার্শনিকদের চর্বণ করতে দিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, তার বাদবাকি অংশ পেলেই আমরা খুশি থাকব। তবে এ সব গল্প অনুবাদ করার মুস্কিল এই যে, বৌদ্ধ সংস্কৃত আমরা আগাগোড়া বুঝতে পারিনে। এখন শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় যদি উক্ত ভাষার একটি শব্দকোষ রচনা করেন, তা হলে তিনি আমাদের সাহিত্যের প্রভূত উপকার করবেন। Senart সাহেব মহাবস্তুর ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি উক্ত ভাষার যে-glossary রচনা করেছেন, সেইটিকে এ বিষয়ের খসড়া হিসেবে ধরে নিয়ে, ভবিষ্যতে কেউ একখানি দস্তুরমতো বৌদ্ধ-সংস্কৃত ভাষার অভিধান তৈরি কববেন, এ আশা তিনি রাখেন। আমার বিশ্বাস, শাস্ত্রী মহাশয় হচ্ছেন

বাঙ্গালায় একমাত্র লোক, যিনি এ অভিধান রচনা করতে পারেন, কারণ বৈদিক ও অর্বাচীন সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি ও জেন্দ ভাষায় তাঁর সমান এবং অসামান্য অধিকার আছে। অতএব আমার অনুরোধ যে তিনি, আর কালবিলম্ব না করে এই মহৎ কাজটি হাতে নিন।

যত দিন এ অভিধান তৈরি না হচ্ছে তত দিন হয় আমরা ভুল অনুবাদ করব, আর না হয়তো আমাদের কথা পাঠকেরা ভুল বুঝবেন।

শাস্ত্রী মহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিই যে, বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে আমরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করতে চাইনে, চাই উদ্ধার করতে আমাদের প্রাচীন উপন্যাস। অতএব অনুবাদ আমরা করবই। যদি বৌদ্ধ সাহিত্যের শব্দার্ণবে কেউ আমাদের নাবিক না হন, তা হলে আমরা তার পারগামী হতে পারব না। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বলে যে—

"নো হংসো নর্ম্মদাতীরে নাবিকং পরিপৃচ্ছতি।
স্বকেন বাহু বীর্য্যেন হংসো তরতি নর্ম্মদাং।"

কিন্তু আমরা তো হংস নই যে নিজ বাহুবলে নর্মদা পার হব? আমাদের নৌকাও চাই নাবিকও চাই, আর বলা বাহুল্য যে, আমরা সে জাতীয় কর্ণধার চাইনে, যারা ফাঁক পেলেই আমাদের কর্ণ ধারণ করবেন, কিন্তু আমাদের পার করবেন না। শাস্ত্রী মহাশয়েরা আমাদের এ সাহায্যটুকু যদি না করেন তো আমরা বৌদ্ধ সাহিত্যের এ পারেই পড়ে থাকব, আর আমাদের মধ্যে যাঁরা পরমহংস তাঁরা উড়ে তার ওপারে চলে যাবেন। তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু তাঁরা এ পারে আবার ফিরে এসে যে 'কচ্চায়ন' করতে আরম্ভ করবেন, সেইটিই তো বিপদের কথা।

সংস্কৃত সাহিত্যের ক্যাটালগ

১

কোন শিক্ষিত লোক যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, ভারতবর্ষে নর্মদা বলে কি একটা নদী আছে? তা হলে আমরা সে প্রশ্ন শুনে সকলেই চমকে উঠব। অপর পক্ষে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, সুবন্ধু নামে কি কোন সংস্কৃত কবি আছেন? তা হলে সে প্রশ্ন শুনে আমরা কেউ-ই আশ্চর্য হয়ে যাব না। আমাদের ভিতর যাঁরা এ প্রশ্নের হাত হাত উত্তর দিতে পারেন, তাঁরাও মনে করবেন যে, এ নামের সঙ্গে অতি শিক্ষিত লোকের পরিচয় না থাকবারই কথা। এর কারণ, স্কুলে আমরা জিওগ্রাফি পড়েছি, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পড়িনি; কেননা কেউ তা আমাদের পড়ায়নি। এ অজ্ঞতা আমি দুঃখের বিষয় মনে করি।

পৃথিবীর যে-সব দেশকে আমরা সভ্য মনে করি এবং যাদের সভ্যতা নকল করাকে ন্যাশনালিজম বলি, সে সব দেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই যেমন স্বদেশের নদ-নদী, পাহাড়-পর্বতের নাম জানে, তেমনই স্বদেশের সাহিত্য-রচয়িতাদেরও নাম জানে।

'নাম-জানা' কথাটা শুনে অসন্তুষ্ট হবেন না; কারণ আমরা যাকে শিক্ষা বলি, তা অধিকাংশ লোকের কাছে নাম মুখস্থ মাত্র। ধরুন— এই জিওগ্রাফির কথা। আমরা যখন বলি যে, আমরা জিওগ্রাফি জানি, তখন আমরা শুধু এই বলি যে, জিওগ্রাফির নামগুলি আমাদের কাছে অশ্রুতপূর্ব নয়। আমরা অধিকাংশ লোক এর বেশি পৃথিবীর জিওগ্রাফিও জানিনে— ভারতবর্ষের জিওগ্রাফিও জানিনে। এর কারণ, নামের অতিরিক্ত পৃথিবীর পরিচয় লাভ করে আমাদের কোন লাভ নেই। উদাহরণ-স্বরূপ 'মস্কো' শহরটা নেওয়া যাক। মস্কো শহরে আমরা কস্মিন কালেও যাব না, আর তা ছাড়া মস্কোর সঙ্গে আমাদের কোন কারবার নেই, এমনকী পত্র-ব্যবহারও নয়; অথচ যে-ব্যক্তি মস্কোর নাম কখনও শোনেনি, তাকে আমরা অশিক্ষিত বলব, আর যে শুনেছে, উপরন্তু জানে যে, ও-শহর রাশিয়া দেশের দ্বিতীয় রাজধানী, তাকে বলব শিক্ষিত। আর এর বেশি যে জানে, তাকে বলব পণ্ডিত অর্থাৎ লেখাপড়া-জানা মূর্খ!

২

তাদেরই আমরা বলি জোর ন্যাশনালিস্ট— যারা চায় যে, ভারতবর্ষ ধনে ও মনে, জ্ঞানে ও চরিত্রে দ্বিতীয় ইংলন্ড হোক। অবশ্য দু'-এক বিষয়ে ইংলন্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের পার্থক্য থাকবে। ভারতবর্ষ নামক উপদ্বীপকে আমরা দ্বীপ করতে পারব না, আর ভারতবাসীর কালো চামড়াকে আমরা সাদা করতে পারব না, অর্থাৎ স্বদেশ ও স্বজাতির বাহ্য রূপ আমরা কিছুতেই বদলাতে পারব না। কিন্তু তাঁরা চান আমাদের ভিতরটা বদলাতে অর্থাৎ আমরা দেহে থাকব পূর্ব দেশের লোক, আর মনে হব পশ্চিম দেশীয়। এই হচ্ছে এ যুগের পেট্রিয়টের আদর্শ।

এ রূপান্তর ঘটবে শুধু শিক্ষার প্রসাদে। অর্থাৎ সেই শিক্ষার দ্বারা— যার ফলে কোন বিষয়ে আমরা অজ্ঞও না থাকি, বিশেষজ্ঞও না হই। অর্থাৎ দেশের লোককে নানা বিষয়ে নামতা শেখাতে হবে। আমাদের স্কুল-কলেজ ভারতবর্ষের হিস্টরি-জিওগ্রাফির নামতা শেখাবার ভার নিয়েছে, আর সংবাদপত্র ও পলিটিকাল বক্তারা ইকনমিক ও পলিটিকসের নামতা স্বদেশবাসীকে নিত্য মুখস্থ করাচ্ছেন। ফাঁক গিয়েছে শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের শিক্ষা। এ শিক্ষা পলিটিসিয়ানরা দেবেন না, কেন-না, উক্ত সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁরা যেমন অজ্ঞ, তেমনই তার উপর তাঁদের অবজ্ঞা আছে। এ অবজ্ঞা সঙ্গত। কারণ, ভারতবর্ষের সভ্যতার যে-ভবিষ্যৎ ফুল তাঁরা ফোটাতে চাচ্ছেন, তার মূল ভারতবর্ষের অতীতে নেই, বরং তাঁদের মতে ভারত-বর্ষের হিন্দু অতীত ভারতবর্ষের ইংরাজি ভবিষ্যতের বাধা। সুতরাং ইংরাজি-শিক্ষিত মনীষীদের মতে সংস্কৃত সাহিত্যেব চর্চায় আমাদের কোনই লাভ নেই, বরং অনেক ক্ষতি আছে। বাঢ়ম্! কিন্তু এ দেশের পূর্বাচার্যদের নাম শোনায় তো আর ক্ষতি নেই, ক্ষতি তো যা কিছু তাঁদের বই পড়ায়। বোধ হয়, এমন ইংরাজ নেই যে Pope, Dryden-এর নাম শোনেনি, অথচ এমন ইংরাজ খুব কমই আছে, যারা উক্ত লেখকদের বই পড়েছেন কিংবা পড়তে উৎসুক। এই সব ভেবেচিন্তে আমি আপনাদের জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি ক্যাটালগ প্রস্তুত করতে ব্রতী হয়েছি। উক্ত ক্যাটালগ থেকে আপনারা সে সাহিত্যের নামের ফর্দ পাবেন।

৩

আমার যখন বয়েস দশ বৎসর, তখন একবার গোয়ালন্দ থেকে নৌকো করে যমুনা উজিয়ে তার পর বাঁয়ে ভেঙে বরাবর জলপথে বাড়ি গিয়েছিলুম। কারণ, সে কালে NBSR নামক রেলপথ তৈরি হয়নি। তাই তখন সমস্ত পাবনা জিলা প্রদক্ষিণ করে অনেক ঘুরে অবশেষে চলন বিলের মধ্য দিয়ে স্বগ্রামে যেতে হল। ঠিক সন্ধ্যার সময় রেল থেকে গোয়ালন্দে নেমে, নৌকোয় চড়ে পদ্মা পাড়ি দিয়ে অপর পারে গিয়ে নোঙর ফেলা হল। সে রাতটা নৌকো ঘাটেই বাঁধা রইল। চারপাশে আরও

অনেক নৌকো ছিল। রাত ন'টা-দশটার সময় পাশের একটি নৌকো থেকে একটি মাঝি গান ধরলে—

"ঢাকা কলকাতা সহর দিল্লি লাহোর কাতার কাতার"

এ গান শুনে আমার ভারি হাসি পেল, মাঝির— জিওগ্রাফির জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে। আমি তখন ছাত্রবৃত্তি স্কুল পেরিয়ে ইংরাজি স্কুলে fifth ক্লাশে পড়ি, সুতরাং তখন আমার ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি কণ্ঠস্থ; এমনকী, বোখারা-সমরকন্দ যে হিমালয়ের অপর পারে, আন্দামান ও নিকোবরের সহোদর নয়, তা-ও আমি জানতুম। সুতরাং ঐ 'কাতার কাতার' কথাটা শুনে হাসি আর রাখতে পারলুম না। মনে মনে বললুম, মাঝিবেটা কী মূর্খ!

ঢাকা, কলকাতা, দিল্লি, লাহোর নামক চারটি শহর যে ভারতবর্ষে আছে, এ কথা ঠিক; আর ঢাকা থেকে লাহোর যেতে হলে যে পর-পর কলিকাতা ও দিল্লি অতিক্রম করে যেতে হয়, এ কথাও ঠিক। অপর পক্ষে এ ক'টি যে পাশাপাশি শহর নয়, তা স্কুল-বয় মাত্রেই জানে। এর থেকে বোঝা যায় যে, শুধু নাম জানলেই জিওগ্রাফি জানা হয় না, উপরন্তু নামগুলির পরস্পর-সম্বন্ধও জানা চাই অর্থাৎ কার সঙ্গে কার সম্বন্ধ নিকট আর কত নিকট, আর কার সঙ্গে কার সম্বন্ধ দূর আর কত দূর, তা-ও জানা চাই। অর্থাৎ দেশের ব্যবধানের জ্ঞান থাকা চাই।

এর থেকে অনুমান করছি যে, সংস্কৃত কবিদের নামাবলি রচনা করাই যথেষ্ট নয়, এক কবির সঙ্গে অপর কবির কালের ব্যবধানটাও বলে দেওয়া আবশ্যক। নইলে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি কাতার কাতার বললে, পূর্বোক্ত মাঝিটি যে-রূপ জিওগ্রাফির জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন, আমরাও তদ্রূপ হিস্টরির জ্ঞানের পরিচয় দেব অর্থাৎ তা হবে হাস্যকর।

৪

সংস্কৃত ভাষায় যত বই লেখা হয়েছে, সে সব বইকে যদি সাহিত্য ধরা যায়, তা হলে এ ক্যাটালগ দ্বিতীয় মহাভারতের মতো বিপুল হয়ে উঠবে। কারণ, আজ থেকে অন্তত চার হাজার বছর আগে সংস্কৃত বই লেখা শুরু হয়েছে, আজও লোক ও-ভাষায় বই লিখছে। এই চার হাজার বছর ধরে এই প্রকাণ্ড দেশে যে কত বই লেখা হয়েছে, তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন, বিশেষত যখন হিন্দুরা তাদৃশ লড়িয়ের জাত ছিলেন না, যতটা ছিলেন লিখিয়ে-পড়িয়ের জাত।

এখন এই লেখা কথাটায় অনেকে আপত্তি করবেন। কেননা, অনেকের ধারণা, বেদাদি গ্রন্থ আদিতে লেখা হয়নি। ও-সব গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছিল বক্তার মুখে আর তার স্থিতি হয়েছিল শ্রোতার কানে। তার পর হাজারখানেক বছর ধরে এক জনের

মুখে শুনে আর-এক জন তা কণ্ঠস্থ করত। অর্থাৎ সেকালে কলম ছিল লোকের জিভ আর কাগজ ছিল তাদের কান। এই হচ্ছে পণ্ডিতদের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অর্থাৎ সেই জাতীয় অনুমান, যার কোন প্রমাণ নেই। সত্য কথা এই যে, সেকালে মানুষের হস্তাক্ষর যে ছিল, তারও কোন প্রমাণ নেই, আর তা যে ছিল না, তারও কোন প্রমাণ নেই। এ অবস্থায় ছিল না বলা যতটা সঙ্গত, ছিল বলাও ততটা সঙ্গত। তাই আমি বলেছি যে, চার হাজার বছর আগে এ দেশে বই লেখা শুরু হয়েছে।

আমরা আজকাল সাহিত্য বলতে নাটক, নভেল, কবিতা, আর ছোটগল্প বুঝি। আমি যাদের নাম করব, তাঁরা সকলেই হয় নাটক, নয় নভেল, হয় কাব্য, নয় কথার রচয়িতা। অপর পক্ষে দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, অভিধান, ধর্ম, আইন প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তকাবলির নাম পর্যন্ত উল্লেখ করব না। অর্থাৎ বেদ, পুরাণ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, তন্ত্র-মন্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতির বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকব। শুধু এই কথাটা বলে রাখি যে, এ জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় যেমন বিপুল, তেমনই অপূর্ব। আমি শুধু ভাবি, এত কথা যা আমরা পড়ে উঠতে পারিনে, পারে শুধু জর্মানরা, তা আমাদের পূর্বপুরুষরা কী করে মুখস্থ করেছিল? তারা কি সব রক্তমাংসের গ্রামোফোন ছিল?

৫

আমি পূর্বে বলেছি যে, এ সংস্কৃত সাহিত্যিকদের নামের তালিকা আমি তারিখ অনুসারে সাজাব। এখন সংস্কৃত সাহিত্যের মহা দোষ এই যে, কোন বইয়েই লেখকের জন্মদিনের উল্লেখ তাঁদের বইতে নেই। অনেকে নিজের নামটা আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন, কেউ-কেউ বা তাঁদের ঠিকানাও দিয়েছেন, কিন্তু নিজেদের কাল সম্বন্ধে সবাই নীরব। সম্ভবত এই বিশ্বাসে যে, কাল যখন নিরবধি, তখন সে বিষয়ে 'এই অবধি' বলা বৃথা।

তাই তাঁদের তারিখের সন্ধান অনেক খুঁজে-পেতে বার করতে হয়। এ খোঁজ য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা করেছেন এবং মোটামুটি হিসেবে এক রকম বারও করেছেন। তাঁরা যে পাকা তারিখ দিতে পারেননি, সেটা এক হিসেবে সৌভাগ্যের কথা; কারণ এ সব তারিখ যদি নিশ্চিত হয়ে পড়ে, তা হলে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের আর কোন কাজ থাকবে না এবং Orientalism নামক ব্যবসাটা মারা যাবে। সে হবে মহা দুঃখের কথা।

যেমন একটা জানা জায়গা থেকে প্রস্থান শুরু করে উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিমে অপর কোন জায়গা কত দূরে, তার নির্ণয় করতে হয়, তেমনই একটা জানা তারিখ থেকে তার পূর্ব ও পরের তারিখ ঠিক করতে হয়।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের তারিখ জানা আছে। তাই আলেক-জান্ডারের পূর্ব কিংবা পর হিসাবে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের তারিখ ঠিক করা হয়। এই সূত্রে আমরা জানি যে, বুদ্ধদেব আলেকজান্ডারের পূর্ববর্তী আর অশোক তাঁর পরবর্তী।

তেমনই সংস্কৃত সাহিত্যের একটা জানা তারিখ আছে। শ্রীহর্ষ যখন কান্য-কুব্জের অধিপতি, তখন হুয়েন-থ-সাং নামক চীনদেশের জনৈক বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারতবর্ষে এসেছিলেন। মাপজোকে তিনি ছিলেন একজন মহা ওস্তাদ। কোন্ শহর কোন্ শহরের কোন্ দিকে এবং কত দূরে, সে সব কথা তিনি খুঁটিয়ে লিখে গিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এ প্রকৃতির লোক তাঁর ভ্রমণের তারিখ দিতে ভোলেননি। তিনি শ্রীহর্ষের রাজসভার সভা-পণ্ডিত হন। ফলে আমরা শ্রীহর্ষের তারিখ জানি। অতএব তাঁর সভাকবিদেরও তারিখ জানি। এই সূত্রে শ্রীহর্ষচরিত-রচয়িতা বাণ-ভট্টের তারিখ আমরা জানি। উক্ত তারিখের পূর্বে ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ কবি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং পরে কোন্ কোন্ কবি আবির্ভূত হন, তার হিসেবও আমরা পেয়েছি। শ্রীহর্ষের রাজত্বকাল হচ্ছে খ্রিস্টাব্দ ৬০৬ হতে ৬৪৮ পর্যন্ত। সুতরাং বাণভট্ট যে সপ্তম খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগের লোক, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এখন তার মুখেই তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের কথা শোনা যাক।

৬

বেদব্যাসকে নমস্কার করে তিনি হর্ষচরিত রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং উক্ত গ্রন্থের আরম্ভেই তিনি পূর্ব-কবিদের নাম উল্লেখ করেছেন এবং দু'-এক কথায় তাঁদের কাব্যের গুণ-বর্ণনা করেছেন।

তিনি তাঁর সমসাময়িক কবিদের বিষয় যা বলেছেন, তা নিতান্ত অবজ্ঞাসূচক। প্রথমত তিনি ও-সব কবিদের কোকিল বলে গাল দিয়েছেন; কেননা, তারা নাকি রাগাধিষ্ঠিত দৃষ্টয়ঃ অর্থাৎ তাদের চোখ রাগে লাল এবং তারা বাচাল। তার পর তিনি বলেছেন যে, কুকুরের মতো কবি ঘরে-ঘরে আছে, কিন্তু—

"উৎপাদকা ন বহবঃ কবয়ঃ শরভা ইব।"

এখন উক্ত কথাটির মানে একটু বুঝিয়ে বলা আবশ্যক। 'শরভ' হচ্ছে চতুষ্পদ নয়, অষ্টপদ পশু; যার সাক্ষাৎ এ কালে কুত্রাপি মেলে না, এমনকী, চিড়িয়া-খানাতেও নয়, আর সে কালেও মিলত শুধু বইয়ের ভিতর। বড় কবিকে শরভ বলবার কারণ— তাঁরাও উৎপাদকা। শব্দটি দ্ব্যর্থবাচক। এর এক মানে হচ্ছে 'যার উঁচু দিকে পা', শরভের চারটি পা থাকত মাটিতে, অপর চারটি আকাশে। তাই ও-জানোয়ারকে বাণভট্ট উৎপাদক বলেছেন। আর দ্বিতীয় অর্থ— 'যে উৎপন্ন করতে পারে।' এই দ্বিতীয় অর্থেই বড় কবিদের শরভ বলা হয়েছে; কেননা তারা কাব্য

সৃষ্টি করতে পারে, আর যারা পারে না, তাদেরই কুকুর বলা হয়েছে; কেননা এই 'কবিচোরের দল' বড় কবিদের রচনা চুরি করে নিজেদের কবি বলে চালাতে চায়। তার পরে বাণভট্ট এই শরভজাতীয় সাতটি কবির নাম করেছেন।

তিনি সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন 'বাসবদত্তা' নামক আখ্যায়িকার, তার পর ভট্টার হরিচন্দ্রের উজ্জ্বল ও মনোহারী গদ্যবন্ধের।

৭

তার পর তিনি বলেছেন যে, সাতবাহন রাজা বিশুদ্ধ জাতিরত্নের মতো সুভাষিতা-বলীতে তার কেশ অবিনাশী ও অগ্রাম্য করেছেন। তার পর শুনি যে, প্রবরসেনের কুমুদোজ্জ্বল কীর্তি সাগরের পরপারেও ছড়িয়ে পড়েছে। তার পর বাণভট্টের মতে, ভাসের নাটক সপতাক দেবকুলের মতো যশ লাভ করেছে। তার পর তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন যে, কালিদাসের মধুর ও সরস সুন্দর উক্তি তাঁর মুখ থেকে নির্গত হবা মাত্র কার না অন্তর প্রীত করে? অবশেষে তিনি প্রশ্ন করেছেন যে, বৃহৎকথা হরলীলার মত কার না বিস্ময় উৎপাদন করে?

এখন এই সব কবির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক। ভট্টার হরিচন্দ্রের লেখা কোন বই এ যুগে পাওয়া যায় না এবং তিনি কোন্ দেশের কোন্ কালের লোক, তা-ও কেউ জানে না। প্রবরসেনের কীর্তি সাগরের ওপারে গিয়েছিল— দেশে আর ফিরে আসেনি। সম্ভবত যবদ্বীপে খুঁজলে কোন মঠে-মন্দিরে তাঁর লুপ্ত গ্রন্থ পাওয়া যেতে পারে। এ দুটিকে বাদ দিয়ে, অপর পাঁচটির শুধু নামের সঙ্গে নয়, তাঁদের রচিত সাহিত্যের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত।

ভাসের নাটকও বহু কাল যাবৎ খুঁজে পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি গণপতি শাস্ত্রী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের কোন মঠে তাদের আবিষ্কার করেছেন এবং ত্রিবাঙ্কুরের রাজ-দরবার থেকে তা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকের নাম 'স্বপ্নবাসবদত্তা'। আমার নিজের কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগে তাঁর 'অবিমারক'। ভাসের নাটকের প্রধান গুণ এই যে, তার ভাষা অতি সরল, আর তার নায়ক-নায়িকারা অনেকটা আমাদের মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ, যদিও তাঁর নাটকের পুরুষরা প্রায় সবাই বীরপুরুষ, আর নারীরা রূপে-গুণে ষোলো আনা নারী।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা স্থির করেছেন যে, ভাস চতুর্থ খ্রিস্টাব্দের নাটককার। আমার বিশ্বাস, তাঁর জন্ম হয়েছিল, এর শ'-তিনেক বৎসর পূর্বে; কিন্তু আমি যখন পণ্ডিত নই, তখন পণ্ডিতদের কথা আমাকে শিরোধার্য করতেই হবে। ভাস যে-প্রাকৃত ব্যবহার করেছেন, তার থেকেই নাকি তাঁর বয়স ধরা পড়ে। আমি সংস্কৃত অতি কম জানি এবং প্রাকৃত মোটেই জানিনে, অতএব বিনাবাক্যে মেনে নিতে বাধ্য যে, ভাস চতুর্থ শতাব্দীর লোক।

ভাসের পরেই আসেন কালিদাস। তাঁর সাহিত্যের তারিখ ৩৮০ খ্রিস্টাব্দ হতে ৪১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। বয়সে তিনি ভাসের চাইতে অন্তত শ'-খানেক বছরের ছোট। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বজন-স্বীকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি নাটকও রচনা করেছেন, কাব্যও রচনা করেছেন, আর এ দুই-ই সংস্কৃত সাহিত্যে অতুলনীয়। তাঁর রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'শকুন্তলা', 'বিক্রমোর্বশী' এই তিনখানি নাটকের ও 'ঋতুসংহার', 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব', ও 'রঘুবংশ' এ চারখানি ছোট-বড় কাব্যের নাম সকলেই শুনেছেন; সুতরাং এ বিষয়ে বেশি কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। তাঁর অন্তত একখানি নাটক 'শকুন্তলা' ও তিনখানি কাব্য 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব' ও 'রঘুবংশ'-এর সঙ্গে ভদ্রসন্তান মাত্রেরই পরিচয় থাকা কর্তব্য। এ বিষয়ে compulsory higher education-এর আমি পক্ষপাতী। 'শকুন্তলা' সম্বন্ধে গ্যেটে-র সার্টিফিকেট আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পেশ করতে পারব এবং সে সার্টিফিকেট বিশ্ববিদ্বানরা উপেক্ষা করতে পারবেন না।

বাণভট্ট যে-সাতবাহন নৃপতির উল্লেখ করেছেন, তাঁর নাম হাল এবং গোদাবরী-তীরে প্রতিষ্ঠাননগরী ছিল তাঁর রাজধানী। তিনি ছিলেন অন্ধ্র-বংশীয় নৃপতি। তিনি সাত শত শ্লোক সংগ্রহ করে 'গাথাসপ্তশতী' নামক একটি anthology রচনা করেন। এ সব শ্লোক সংস্কৃতে লেখা নয়, লেখা প্রাকৃতে; তাই বাণভট্ট বলেছেন যে, গ্রাম্য ভাষার কবিতা তিনি অগ্রাম্য ও অবিনাশী করে গিয়েছেন। এ সংগ্রহ করা হয়েছিল পঞ্চম শতাব্দীতে।

কিন্তু এর পূর্বে 'বৃহৎ-কথা' রচিত হয়েছিল। এ কথার রচয়িতার নাম গুণাঢ্য। এ বড় অদ্ভুত গ্রন্থ। গুণাঢ্য এই গল্প-সাহিত্য সংস্কৃতেও লেখেননি, প্রাকৃতেও লেখেননি, লিখেছিলেন— পৈশাচী ভাষায়। পৈশাচী ভাষা যে কী, তা আমরা জানিনে এবং সম্ভবত জানবার উপায়ও নেই; কেননা, মূল 'বৃহৎ-কথা' লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই 'বৃহৎ-কথা'র তিনটি সংস্কৃত version আছে,— ১. শ্লোকসংগ্রহ— নেপালে লেখা, ২. বৃহৎ-কথামঞ্জরী— কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্রের লেখা, ৩. কাশ্মীরী কবি সোমদেবের 'কথা-সরিৎ-সাগর'। 'কথা-সরিৎ-সাগর' থেকেই এখন ও-কথা আমরা শুনি; কারণ, তিনি জানতেন যে, কবিত্ব করতে গিয়ে কথা-রস নষ্ট করা উচিত নয়।

সর্বশেষে 'বাসবদত্তা'র রচয়িতা হচ্ছেন সুবন্ধু এবং তিনি খুব সম্ভব সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁর romance লেখেন। দুঃখের বিষয়, এই গদ্য-কাব্যই পরবর্তী কবিদের আদর্শ হয়েছিল; কারণ, ভাবে ও ভাষায় 'বাসবদত্তা' সাহিত্যে কৃত্রিমতার চরম আদর্শ। এতে কবি যার পরিচয় দিয়েছেন, তার নাম art নয়, artifice, রূপ নয়, চাতুরী।

বাণভট্টের পূর্ববর্তী আরও দু'-চার জন খ্যাতনামা লেখক আছেন, যাঁদের নাম তিনি উল্লেখ করেননি। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কবি হচ্ছেন 'বুদ্ধ-চরিত'-এর রচয়িতা অশ্বঘোষ। ইনি পুষ্পপুরের তুরস্ক সম্রাট কণিষ্কের সভাকবি ছিলেন, সুতরাং খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী এঁর আবির্ভাবের কাল। শুধু বাণ কেন, অপর কোন হিন্দু কবি অথবা আলঙ্কারিক কোথাও এঁর নাম উল্লেখ করেননি। বোধ হয়, এর কারণ অশ্বঘোষ ছিলেন বৌদ্ধ. হিন্দু নয়। কিন্তু কবি বৌদ্ধ বলে বাণভট্ট যে তাঁর কাব্য বয়কট করবেন, এতটা গোঁয়ার তিনি ছিলেন না; কারণ, তিনি স্থানান্তরে বৌদ্ধ দর্শনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'অভিধর্মকোষ'-এর উল্লেখ করেছেন। আমার বিশ্বাস, 'বুদ্ধ-চরিত' তাঁর কখনও চোখে পড়েনি, যদিচ কালিদাস যে সে কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তার পরিচয় 'রঘুবংশ'-এই আছে। কালিদাসের কোন-কোন বর্ণনায় 'বুদ্ধ-চরিত'-এর স্পষ্ট ছাপ আছে। মূল 'বুদ্ধ-চরিত' যে-কারণেই হোক, এ দেশে চাপা পড়ে গিয়েছিল। য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা চীনে ভাষায় তার অনুবাদের মারফত প্রথম উক্ত কাব্যের পরিচয়লাভ করেন, তার পর নেপালে মূল গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়েছে। এতদ্ব্যতীত 'সুন্দরানন্দ' নামক এঁর অপর একখানি কাব্যও আবিষ্কৃত হয়েছে। অশ্বঘোষ শুধু কবি নন, মহাকবি, এক কালিদাসকে বাদ দিলে তাঁর জুড়ি দ্বিতীয় কবি সংস্কৃত সাহিত্যে মেলা ভার। সংস্কৃত কবি মাত্রেই পণ্ডিত, এঁরা সবাই ছিলেন গ্যেটে-দান্তের জাতভাই। আর অশ্বঘোষ ছিলেন কালিদাসের সমকক্ষ মহাকবি ও মহা পণ্ডিত। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, এ কাব্যের পঠন-পাঠন আজও দেশে সুপ্রচলিত নয়। এমনকী, এর নাম পর্যন্ত সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছে অবিদিত।

বাণভট্ট আর-একটি বিখ্যাত লেখকের নাম করেননি। 'দশকুমার-চরিত'-এর রচয়িতা দণ্ডী খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীব লোক। তিনি শুধু কবি নন— আলঙ্কারিক হিসাবেও প্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত 'কাব্যাদর্শ' প্রাচীন অলঙ্কারের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বোধ হয়, বাণভট্ট এই কারণে তাঁর নাম উল্লেখ করেননি যে, তিনি মহা কাব্য অর্থাৎ epic-ও লেখেননি, আখ্যায়িকা অর্থাৎ romance-ও লেখেননি, লিখেছিলেন শুধু গুটিকতক ছোটগল্প। দেহে বল, মাথায় বুদ্ধি, হৃদয়ে সাহস আর অন্তরে অদম্য ভোগতৃষ্ণা থাকলে এবং সেই সঙ্গে ধর্মাধর্মের জ্ঞানে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হলে বীর প্রকৃতির যুবাপুরুষ যে কত অদ্ভুত কর্ম করতে পারে, যিনি তার পরিচয় পেতে চান, তিনি দশকুমারের চরিত্র আলোচনা করুন। এ সব গল্প আধা রূপকথা— আধা tales of adventure। দশকুমার-চরিতের সাক্ষাৎ পেলে ফরাসি রোমান্টিক কবিরা তাঁর অনেক গল্প নাটকে রূপান্তরিত করতে পারতেন।

১০

টুলো পণ্ডিতরা বলেন—

'উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ।।

অস্যার্থ— কালিদাসের কাব্যে উপমা, ভারবির কাব্যে অর্থগৌরব আর নৈষধে পদলালিত্য আছে, অপর পক্ষে মাঘের কাব্যে এ তিনটি গুণই আছে। ভারবি 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্' এবং মাঘ 'শিশুপালবধ' কাব্যের রচয়িতা এবং এ উভয়ই বাণ-ভট্টের সমসাময়িক কবি। ভারবির কাল ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ আর মাঘের সম্ভবত এরই কাছাকাছি। বাণভট্ট যে তাঁদের নাম মুখে আনেননি, তার কারণ, বাণভট্টের এই অব্যবহিত পূর্ব-কবিরা খুব সম্ভবত সেকালে প্রসিদ্ধিলাভ করেননি, আর না হয়তো বাণভট্ট তাঁদের কুকবি হিসেবে গণ্য করতেন।

আজকের দিনে মাঘ ও ভারবি অবশ্য টোলে ও কলেজে অবশ্যপাঠ্য; কিন্তু বিদ্যালয়ের বাইরে অন্য কোথাও কেউ যে ও-দুটি শখ করে পড়ে, এ রূপ আমার বিশ্বাস নয়। কিরাতার্জ্জুনীয়ম্-এর অর্থগৌরব থাকতে পারে, কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। ভাষার সঙ্গে কুস্তি করে জিতে যদি তার ভাব বুঝতে হয়, তা হলে কাব্য না পড়ে দর্শন পড়লেই হয়। শুনেছি, শাস্ত্রমার্গে লোকের ক্লেশ করতে হয়। কাব্যমার্গেও যে তাই করতে হয়, এই কবিযুগল তাই প্রমাণ করেছেন। মাঘ শুনেছি ভারবির চাইতেও কষ্টবোধ্য। উপরন্তু এ কাব্যে নাকি ছন্দের নানা রূপ ভাগবাঁট আছে। এতে প্রমাণ হয় যে, কবি তালসিদ্ধ, তার বেশি আর কিছু নয়। কাব্যচর্চা করার উদ্দেশ্য যদি হয় ব্যাকরণ ও অভিধান কণ্ঠস্থ করা, তা হলে অবশ্য মাঘ পড়তেই হবে। তবে মাঘ স্কুলের ছেলেদের ঘাড়ে চাপানো উচিত নয়; কারণ, তাঁর কাব্য যথার্থই শিশুপাল-বধ।

নৈষধ কাব্যের নাম, কবির নাম নয়। এ কবি বাণের তুলনায় অতি আধুনিক কবি। তাঁর পরিচয় পরে দেব। এ কাব্যের লেখক ছিলেন দার্শনিক, পরে তিনি কাব্য লেখেন। দার্শনিকের হাতে কী রকম কাব্য রচিত হয়, নৈষধ তার অদ্বিতীয় উদাহরণ।

১১

ফরাসিরা তাঁদের দেশের রাজা চতুর্দশ লুই-এর যুগের নাম দিয়েছেন Grand Siecle অর্থাৎ মহাযুগ। শ্রীহর্ষদেবের যুগও হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসের একটি মহাযুগ।

মহাযুগের একটি লক্ষণ এই যে, তা সাহিত্যেরও একটি মহাযুগ, যেমন গ্রিসে Pericles-এর যুগ, ইংলন্ডে এলিজাবেথের যুগ। এর থেকে সকলেই অনুমান করতে পারেন যে, শ্রীহর্ষের যুগ সংস্কৃত সাহিত্যেরও একটা উজ্জ্বল যুগ।

এ যুগে ভারতবর্ষের উত্তরাপথে বহু কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমি শুধু চার জনের পরিচয় দেব।

এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাণভট্টের নাম উল্লেখ করা কর্তব্য। তাঁর প্রসিদ্ধ বই দু'খানির নাম 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী'। হর্ষচরিত শ্রীহর্ষদেবের রাজত্বকালের ইতিহাস নয়, তাঁর জীবনচরিত। এ জীবনচরিত ইংরাজরা যাকে বলে biography, তা নয়, এ এক শ্রেণীর কাব্য। আজ বছর-দুই ধরে ফরাসি সাহিত্যিকরা য়ুরোপের বহু মহাপুরুষের জীবনচরিত romance হিসাবে লিখতে শুরু করেছেন, অর্থাৎ কোন লোকের বাস্তবিক জীবন অবলম্বন করে একটি গদ্য-কাব্য রচনা করা আধুনিক ফরাসি সাহিত্যিকরা তাঁদের নতুন কর্তব্য বলে মনে করেন। আর পাঠকরা বলছেন, 'এ এক নতুন জিনিস।' আজ থেকে ১৩০০ বৎসর আগে বাণভট্ট ঠিক এই জাতীয় সাহিত্য লিখে গিয়েছেন।

আর কাদম্বরী হচ্ছে স্বনামধন্য আখ্যায়িকা অর্থাৎ খাঁটি romance। বাণভট্ট বলেছেন, আগে ছিল গুণাঢ্যের বৃহৎ-কথা, তারপর রচিত হয়েছে সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' আর 'কাদম্বরী' হচ্ছে উক্ত জাতীয় তৃতীয় গ্রন্থ। কাদম্বরীর মূল গল্প বৃহৎ-কথা থেকে নেওয়া এবং বলবার ভঙ্গি 'বাসবদত্তা' থেকে।

বাণভট্টের গদ্য প্রথম পরিচয়ে ভীতিপ্রদ। কী কাদম্বরী, কী হর্ষচরিতের এক-একটি সমাস এক-এক পাতা জোড়া, কিন্তু একবার পড়তে আরম্ভ করলে দেখা যায় যে, এ কথার ভিড় ঠেলে অগ্রসর হওয়া তেমন কঠিন নয়। আর ক্রমে জ্ঞান হয়— এ গদ্যের rhythm অতি চমৎকার। এ গদ্য হচ্ছে এক রকম মৃদঙ্গের পরং। বোল অবিরল, কিন্তু তার ফাঁকে-ফাঁকে তালমানের যথাযথ নিয়ম আছে, তা ছাড়া বাণভট্টের ছিল চিত্রকরের রূপগ্রাহী চোখ, আর যথার্থ প্রেমিকের মর্মগ্রাহী মন, উপরন্তু তাঁর বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার, আর বিদ্যা অসাধারণ। কাদম্বরী পড়া এক রকম bioscope দেখা, আর সঙ্গে-সঙ্গে concert শোনা। অথচ এই ছবি-গানের অন্তরে একটি নির্মল প্রাণের ধারা বয়ে যাচ্ছে।

১২

তার পর স্বয়ং শ্রীহর্ষও নাটককার বলে পরিচিত।

'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা' ও 'নাগানন্দ', এই তিনখানি নাটক তাঁর নামেই চলে আসছে। কারণ, সে তিনখানি তিনি নিজের নামে চালিয়েছিলেন। সেকালের সাহিত্য-সমাজ তাঁকে কিন্তু এ নাটকের রচয়িতা বলে স্বীকার করেননি। কেউ বলেছেন যে, ও-সব ধাবকের লেখা, কেউ বলেছেন বাণভট্টের, য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা অপর পক্ষে শ্রীহর্ষের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। রাজার কথা অমান্য করতে তাঁরা প্রস্তুত নন। সে যা-ই হোক, এ তিনখানি নাটকই সুন্দর অর্থাৎ pretty, উপরন্তু

রত্নাবলীর মহাগুণ এই যে, তা স্টেজে act করবার বিশেষ উপযুক্ত। ও-নাটকের লেখক যিনিই হন— তাঁর থিয়েটারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

শ্রীহর্ষের যুগের তৃতীয় কবি হচ্ছেন ভর্তৃহরি। কিম্বদন্তি এই যে, তিনি ছিলেন আগে রাজা, তার পর হয়েছিলেন সন্ন্যাসী। এ কিম্বদন্তির মূলে বোধ হয় কিছু সত্য আছে।

ই-চিং নামক জনৈক প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক বলেছেন যে, ভর্তৃহরি ছিলেন অতি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। তিনি নাকি ছ'বার বৌদ্ধ ভিক্ষুক হয়েছিলেন, আর ছ'বার সন্ন্যাস ত্যাগ করে সাংসারিক হয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর জীবনটা ছিল ত্যাগ ও ভোগের ভিতর একটা পেন্ডুলাম। এ কথা সত্য। তিনি একটি শ্লোকে বলেছেন যে—

একো বাসঃ পত্তনে বা বনে বা
একা ভার্য্যা সুন্দরী বা দরী বা।

সুতরাং তিনি যে পালায়-পালায় বনে ও পত্তনে বাস করেছিলেন এবং কখনও বা দরীর অঙ্কে, কখনও বা সুন্দরীর অঙ্কে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। তাই তিনি 'শৃঙ্গারশতকে' জীবনের তৃষ্ণার লাল ফুলের ও 'বৈরাগ্য-শতকে' বিতৃষ্ণার সাদা ফুলের মালা গেঁথেছেন। তাঁর প্রতি কবিতাই হচ্ছে প্রকৃত lyric। আর তাঁর 'নীতিশতক' হচ্ছে আমাদের মতো মাঝামাঝি লোকদের প্রতি আমির-ফকিরের শত শ্লোকে অবজ্ঞার ফুৎকার। সর্বশেষে বাণভট্টের শ্বশুর ময়ূর-ভট্টের 'সূর্য্যশতক'ও মনে করে রাখবার মতো কাব্য।

১৩

যেমন ইংরাজরা শেক্সপিয়ারের পিঠ-পিঠ মিল্টনের নাম করেন, আমরাও তেমনই কালিদাসের পিঠ-পিঠ ভবভূতির নাম করি। শেক্সপিয়ারের সঙ্গে মিল্টনের অবশ্য কোনই মিল নেই, অপর পক্ষে কালিদাসেব সঙ্গে ভবভূতির এইটুকু মিল আছে যে, উভয়েই নাটককার, কিন্তু আসল মিল এই যে, উভয়েই বড় কবি। ভবভূতির রচিত নাটক তিনখানির নাম হচ্ছে 'মহাবীর-চরিত', 'মালতীমাধব' ও 'উত্তররাম-চরিত'। আর এ তিনখানির মধ্যে প্রভেদ এই যে, মহাবীর-চরিত কেউ পড়ে না, মালতী-মাধব অল্প লোকে পড়ে, আর উত্তররাম-চরিত সকলেই পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র যে মালতী-মাধব পড়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' আর Lamb's Tales of Shakespeare পড়লে যদি Shakespeare পড়া হয় তো, যাঁরা সীতার বনবাস পড়েছেন, তাঁরা উত্তররামও পড়েছেন অর্থাৎ ঐ স্কুল-পাঠ্য বাঙ্গালা বইয়ের মারফত তাঁরা দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়েছেন। ও নাটক— নাটক হিসেবে সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, কিন্তু lyric হিসাবে অগ্রগণ্য। ভবভূতির আবির্ভাবকাল ৭০০ খ্রিস্টাব্দ।

সংস্কৃতে আর-একখানি নাটক আছে, যা অদ্বিতীয়। এ নাটকের নাম 'মুদ্রারাক্ষস' আর এর রচয়িতা হচ্ছেন সামন্ত বটেশ্বর দত্তের পৌত্র ও মহারাজপদভাক্ পৃথুসেনের পুত্র কবি বিশাখদত্ত। অর্থাৎ এ কবি ছিলেন, রাজ-পৌত্র ও মহারাজপুত্র। সম্ভবত এই কারণে তিনি স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর প্রেমের বিষয় তুচ্ছজ্ঞানে পুরুষে-পুরুষে রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ির বিষয়ে নাটক লিখেছেন। চাণক্য কী কৌশলে নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করে চন্দ্রগুপ্তকে রাজচক্রবর্তী করেন, তাই নিয়ে এ নাটক। এ নাটকে অস্ত্র-যুদ্ধের বর্ণনা নেই, এর বর্ণিত বিষয় হচ্ছে বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই ও কূটবুদ্ধির জয় ও ধর্মবুদ্ধির পরাজয়। এ হচ্ছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের নাটকীয় রূপান্তর। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তৎসত্ত্বেও এখানি একখানি যথার্থ নাটক। বিশাখদত্ত খুব সম্ভবত নবম খ্রিস্টাব্দের লোক, অষ্টম শতাব্দীরও হতে পারেন।

১৪

এর পরেও অনেক কবি অনেক নাটক লিখেছেন, কিন্তু সে সবের নাম করার সার্থকতা শুধু পুঁথির ভার বাড়ানো। এ সব নাটক লুপ্ত হয়ে গেলেও, আমার বিশ্বাস, সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু ক্ষতি হত না। কিন্তু দেশের লোকের নাটক লেখার বাতিক থেকে এই প্রমাণ হয় যে, হিন্দু যুগের শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের নাটক দেখার বাতিক ছিল। এ জাত চিরকালই থিয়েটার-প্রাণ। বিলেতে আজও নিত্য নতুন নাটক রচিত হচ্ছে ও অভিনীত হচ্ছে— দু'শো বৎসর পরে যে-নাটকের নাম পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যাবে।

আমি আর-একখানি নাটকের এতক্ষণ নাম করিনি, যে-গ্রন্থ আমার অতিশয় প্রিয় এবং যে-নাটক আমার মতে শকুন্তলার মতোই উচ্চাঙ্গের— সেখানির নাম 'মৃচ্ছকটিক'।

এ নাটক যে কার লেখা ও কবে লেখা, তার সন্ধান য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা অনেক দিন পাননি। অবশ্য উক্ত নাটকের প্রথমেই বলা হয়েছে যে, এর রচয়িতা হচ্ছেন রাজা শূদ্রক। এখন শূদ্রক বলে কোন রাজা ভারতবর্ষে ছিলেন না, ছিলেন রূপকথার দেশে। ফলে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে নানা য়ুরোপীয় পণ্ডিত এ কবির দেশকালের সম্বন্ধে নানা রূপ অনুমান করেছেন— যার প্রত্যেকটিই অমূলক। সম্প্রতি আমরা আবিষ্কার করেছি যে, মৃচ্ছকটিক, ভাসের দরিদ্র চারুদত্ত নামক নাটকের চোরাই সংস্করণ। ভাসের নাটক যখন দেশে লুপ্ত হয়ে যায়, তখন কোন কবিচোর দরিদ্র চারুদত্তের মৃচ্ছকটিক নাম দিয়ে ওটি রাজা শূদ্রকের বেনামীতে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। মৃচ্ছকটিক দশাঙ্ক নাটক, আর দরিদ্র চারুদত্তের মোটে চারটি অঙ্ক মাত্র পাওয়া গিয়েছে। তার থেকেই দেখা যায় যে, দরিদ্র চারুদত্তের

দু'-চার কথা, দু'-চার শ্লোক মাত্র বাড়ানো হয়েছে। যদি শেষোক্ত নাটকের অবশিষ্ট ছয় অঙ্ক পাওয়া যায় তো দেখা যাবে যে, সমস্ত নাটকখানিই ভাসের লেখা। মৃচ্ছকটিকের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এই হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র realistic নাটক আর দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, realism-ও যে চমৎকার কাব্যে পরিণত হতে পারে, তারও প্রমাণ মৃচ্ছকটিক।

১৫

এখন আর-এক জাতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয় দিই, যে-সাহিত্য ভারতবর্ষের চিরগৌরব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায় এ সাহিত্যকে কথামালা বলা যেতে পারে। ইংরাজিতে যাকে fables বলে, সে বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্য পৃথিবীতে অতুলনীয়। আপনারা শুনে হয়তো অবাক হয়ে যাবেন যে, য়ুরোপীয় যত প্রকার এ জাতীয় কথা-সাহিত্য আছে, সে সবই আমাদের সাহিত্য থেকে ধার করা। সে সব যে ভারতবর্ষ থেকে আমদানি করা, তার অকাট্য প্রমাণ আছে। ভারতবর্ষের লোক পশুপক্ষীকে যেমন সহজে, যেমন বুদ্ধিমানের মতো কথা কইয়েছেন, পৃথিবীর অপর কোন জাত অদ্যাবধি তা পারেনি।

আজ থেকে দু'-হাজার বৎসর আগে ভারতবর্ষের শেয়ালরা কথা কইত Machiavelli-র মতো আর সিংহরা Kaiser-এর মতো, গৃধ্ররা Lenin-এর মতো আর বকরা Pope-এর মতো। যদি রাজনীতি শিখতে চাও তো পঞ্চতন্ত্র অথবা হিতোপদেশ পড়ো। অন্তত ও-সাহিত্য চর্চা করলে এই দেখতে পাবে যে, য়ুরোপের বড়-বড় রাজনৈতিক এমন কোন কথা বলেননি, যা এ দেশের পশুপক্ষীরা বহু কাল পূর্বে না বলে গেছে।

এ সাহিত্যের স্রষ্টা ব্রাহ্মণ নন, ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায়ের মাথা থেকে নয়, শাসিতদের মাথা থেকে এর উদ্ভব। এ কথা-সাহিত্য চিরপীড়িত জনগণের শাসক সম্প্রদায়ের রাজনীতির পাল্টা জবাব। আদিতে এ সব গল্প নিরক্ষর লোকের মুখে-মুখে চলত, পরে ব্রাহ্মণরা সেই সব গল্প সংগ্রহ করে তাঁদের নীতিশাস্ত্রের অঙ্গ করে তুলেছেন। বোধ হয়, ক্ষত্রিয়দের এই মাস্টারমশাইদের বিশ্বাস ছিল যে, রাজনীতির যথার্থ ক্ষেত্র হচ্ছে পশুরাজ্য। তাই রাজার আদর্শ হচ্ছে সিংহ, আর রাজমন্ত্রীর শৃগাল। কবে যে এ সব গল্পকে সংস্কৃত করা হয়েছে, তা জানবার উপায় নেই। তবে যে-তিনখানি এ জাতীয় গ্রন্থ এখন পাওয়া যায়, তাদের বয়েস খুব বেশি নয়। 'তন্ত্রাখ্যায়িকার সংগ্রহকাল ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ, পঞ্চতন্ত্রের দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ ও হিতোপদেশের এ দুয়ের মাঝামাঝি কোন সময়। বাঙ্গালায় খালি হিতোপদেশই চলে। এর কারণ, আমাদের প্রিয় সাহিত্য হচ্ছে সেই জাতীয় উপদেশ— যা আমাদের পক্ষে হিতকর।

১৬

এখন নৈষধের কথায় আসা যাক। এ কাব্যের রচয়িতা হচ্ছেন শ্রীহর্ষ আর তা লেখা হয়েছিল কান্যকুব্জে দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে। কিম্বদন্তি এই যে, তিনি বল্লাল সেন কর্তৃক কান্যকুব্জ হতে বাঙ্গালায় আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম। এ অবশ্য উড়ো কথা। শ্রীহর্ষ সংস্কৃত সাহিত্যে দার্শনিক কবি বলে প্রসিদ্ধ; এর কারণ— তিনি ছিলেন একজন পেশাদার দার্শনিক। তাঁর রচিত দার্শনিক গ্রন্থ 'খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য' শুনতে পাই একখানি দাঁতভাঙা দার্শনিক গ্রন্থ। তিনি নাকি সর্বপ্রকার দার্শনিক মতের খণ্ডন করে বেদান্ত মতের প্রতিষ্ঠা করেছেন। যখন কোন মতই তর্কে টেকে না, তখন তাঁর মতে যে-কোন একটা মতকে মেনে নেওয়া যায় অর্থাৎ বিশ্বাসের মূল কেটে দিয়ে তিনি বিশ্বাসকে খোঁড়া করতে চেয়েছিলেন। সে যা-ই হোক, তিনি কত দূর ভীষণ sceptic, তার পরিচয় নৈষধেই পাওয়া যায়। Voltaire, Diderot-ও তাঁর কাছে হার মানে, স্বাধীন চিন্তাতেও, অশ্লীলতাতেও। এ কাব্য কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়দের অতি প্রিয়; কারণ, নৈষধ নাকি অলঙ্কারশাস্ত্রের সর্বপ্রকার নিয়ম রক্ষা করে রচিত। আমার মনে হয় যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে হিন্দু জাত যে কত দূর decadent হয়ে পড়েছিল, নৈষধ হচ্ছে তার চরম প্রমাণ। সে যুগের হিন্দুদের বিদ্যা ছিল— বুদ্ধি ছিল, ছিল না শুধু মহৎ চরিত্র। মহাভারতের নলোপাখ্যানের সঙ্গে শ্রীহর্ষের নৈষধ-চরিত্রের তুলনা করলেই সকলে একবাক্যে বলে উঠবেন, What a fall is there!

শ্রীহর্ষের পূর্ববর্তী একটি কবির দু'-কথায় পরিচয় দিই— যাঁর কবিতা সকলেই জানেন, অথচ কবির নাম অনেকেই শোনেননি। চোর-পঞ্চাশৎ-রচয়িতা চোর-কবির নাম হচ্ছে বিহ্লন। একাদশ খ্রিস্টাব্দে তাঁর আবির্ভাব হয়, জনরব যে, রাজকন্যার সঙ্গে প্রণয় করার অপরাধে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁর বিচারের সময় তিনি উক্ত পঞ্চাশ শ্লোক আবৃত্তি করেন। এ ঘটনার ফলে তাঁর প্রাণ গিয়েছিল কি না, জানিনে। কিন্তু তাঁর কবিতা অমর হয়েছে।

দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে কহ্লন নামক জনৈক কবি 'রাজতরঙ্গিণী' নামক কাশ্মীরের একখানি ইতিহাস পদ্যে লেখেন। এই রাজতরঙ্গিণী-ই হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

সংস্কৃত যুগের শেষ কবি হচ্ছেন বাঙ্গালি কবি জয়দেব। যে-দিন বখতিয়ার খিলজি নবদ্বীপ দখল করলেন, সেই দিন হচ্ছে হিন্দু ইতিহাসের শেষ দিন, সংস্কৃত সাহিত্যেরও শেষ দিন।

১৭

য়ুরোপের একটা যুগকে সে দেশের লোক অন্ধকারের যুগ বলে; কারণ, তাদের

পূর্বপুরুষরা সে যুগে নাকি সব ঘুমিয়েছিল। য়ুরোপের এ রাত্রি বারো ঘণ্টার রাত নয়, হাজার বৎসরের অমানিশা। এই হাজার বৎসর ধরে য়ুরোপের অধিবাসীরা যে হাত-পা ছেড়ে বিছানায় শুয়েছিল, তা অবশ্য নয়। এ কালে তারা নিয়ত মারামারি কাটাকাটি করেছে, কত রাজ্য ভেঙেছে, রাজ্য গড়েছে, লুঠ-তরাজ করেছে ও অবসরকালে নমাজ করেছে। সে দেশে আজও যে-সব রাজ্য আছে, সে সবই ঐ সময়ে গড়া। এ হচ্ছে শেরেফ বীরপুরুষের যুগ। তবে আধুনিক য়ুরোপীয়রা ও-যুগকে যে অন্ধকারের যুগ বলে, তার কারণ, ও-যুগে সে দেশ থেকে সরস্বতী অন্তর্হিত হয়েছিলেন। ফলে সে যুগে য়ুরোপীয়দের অন্তর-আকাশে শুধু অন্ধকার বিরাজ করেছে। এ যুগ শুরু হয় চতুর্থ খ্রিস্টাব্দে আর শেষ হয় চতুর্দশ খ্রিস্টাব্দে।

ভারতবর্ষে কিন্তু এই যুগটাই হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্যের যুগ। কালিদাস থেকে জয়দেব পর্যন্ত সকল কবিই এই যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। য়ুরোপে যে-যুগে ছিল অন্ধকার, ভারতবর্ষে ঠিক সেই যুগেই ছিল দিনের আলো।

এর থেকে মনে ভেবো না, তার পূর্বে ভারতবর্ষ অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সবই পূর্ব-যুগের কথা। সংস্কৃত সাহিত্য যে শিক্ষিত লোকে গড়ে তুলেছে, তার কারণ, তাঁরা পূর্বাচার্যদের কৃত সর্বপ্রকার শাস্ত্রের উত্তরাধিকারী ছিলেন। গ্রিক সাহিত্য অতি চমৎকার, কিন্তু গ্রিক সভ্যতা তিন শ' বৎসরের বেশি বাঁচেনি। গ্রিক সাহিত্যের আলোক অতি উজ্জ্বল, কিন্তু তা ক্ষণপ্রভ। আমাদের দেশ কিন্তু সরস্বতীর কৃপায় কখনও বঞ্চিত হয়নি, বেদ থেকে জয়দেব পর্যন্ত হিন্দুদের মনের আলোক কখনও নেবেনি। আর আমি যে-ফর্দ দিলুম, তা অতি সংক্ষিপ্ত; কারণ, যাঁরা শুধু নাটক-নভেল লিখেছেন, তাঁদের সকলের নাম করতে হলেও এ ফর্দ বেজায় লম্বা হবে, তাই আমি শুধু সেই ক'টি কবির নাম করলুম, যাঁদের নাম মনে রাখতে পারলেই আপনারা cultured বলে গণ্য হবেন, অথচ পণ্ডিত বলে কেউ আপনাদের ভুল করবে না, অতএব বিদ্রূপও করবে না।

১৮

এখন আপনাদের একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস হচ্ছে মুখ্যত হিন্দু জাতির মনের ইতিহাস, এ জাতের মনের ক্রিয়া কস্মিন কালেও বন্ধ হয়নি। ভারতবর্ষের বাহ্য ইতিহাস হচ্ছে ঝড়ঝাপটা, ভূমিকম্পের ইতিহাস। এই সব উপর্যুপরি দৈব দুর্ঘটনার ফলে হিন্দুর সমাজ ও রাজ্য বার-বার বিধ্বস্ত হয়েছে, কিন্তু এই সব খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যে হিন্দু জাতি তার বাহ্য স্বরাজ্য রক্ষা করতে না পারলেও তার মনের স্বরাজ্য রক্ষা করেছে; তা যে করেছে, তার প্রমাণ এই যুগ-যুগান্তরের সাহিত্য। হিন্দুর নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির পরিচয় যুগের পর

যুগে, ধর্মে, দর্শনে ও সাহিত্যে পাওয়া যায়। অতীতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না হয়েও ভারতবর্ষ ক্রমান্বয়ে বর্তমানের নব-নব রূপ দান করেছে; তার মন কখনও ঘুমিয়ে পড়েনি।

সংস্কৃত সাহিত্য অবশ্য ব্রাহ্মণ-সাহিত্য, তাই বলে শূদ্ররা যে এর ভাগ পায়নি, তা নয়। সংস্কৃত ও প্রাকৃত, এ দুই ভাষার আদানপ্রদান চিরদিনই ছিল। প্রাকৃত সাহিত্যও সংস্কৃতে ভাষান্তরিত হয়েছে এবং সংস্কৃত সাহিত্যও প্রাকৃত রূপ ধারণ করেছে। ধর্মশাস্ত্রকাররা বলেছেন যে, বেদপাঠ শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ, কিন্তু ইতিহাস ও কাব্য-কথা তাদের শোনানো ব্রাহ্মণদের অবশ্য কর্তব্য। এর থেকে অনুমান করা যায়, পুরাকালে নিরক্ষর লোকও ইতিহাস-পুরাণ, কাব্য-কথা ও ধর্ম-কথায় শিক্ষিত হত। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, সংস্কৃত সাহিত্য যেমন কোন বিশেষ কালের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, তার প্রভাবও কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। অর্থাৎ এ সাহিত্য হচ্ছে, ভারতবর্ষের সর্বকালের সর্বমানবের মনের জিনিস।

এই মনের স্বরাজ্য ভবিষ্যতে আমরা হারাতে পারি; কেননা, ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে, আমার জাতীয় মনের চাইতে জাতীয় ধনের চর্চা করা আমরা বহু গুণে শ্রেয় মনে করি। আমরা ভুলে যাই যে প্রতি ব্যক্তির পক্ষে ধন যে কাম্য; কেননা, অত্যাবশ্যক, সে শিক্ষা প্রতি লোকের উদরই তাকে দেয়, অপর পক্ষে জাতীয় ধর্মের স্রষ্টা জাতীয় মন। অর্থাৎ তার জন্য মনের চর্চার আবশ্যক। দ্বিতীয়ত, আমাদের অনেকের ধারণা যে, হিন্দু মনের দিকে পিঠ না ফেরালে আমরা আইডিয়াল ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে পারব না। অর্থাৎ আত্মহারা না হয়ে আমরা আত্মবশ হতে পারব না, আমাদের স্বকে নির্মূল না করতে পারলে আমরা স্বাধীন হব না। এ আইডিয়ালের আমি কোন প্রতিবাদ করতে পারব না, কারণ, কারও আইডিয়ালে খোঁচা মারা আমি অকর্তব্য মনে করি। অপর পক্ষে ভারতবর্ষের অতীতের প্রতি আমার অহৈতুকী প্রীতি আছে, তাই আমার এ পরিশ্রম সার্থক হয়, যদি দু'-চার জনের মনেও তার প্রতি সহেতুকী প্রীতির উদ্রেক করতে পারি।

ম হা ভা ষ্য কা র প ত ঞ্জ লি

পরিচয়ের শারদীয়া সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষের 'মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি' নামক প্রবন্ধ পড়ে চমৎকৃত হয়েছি। এটি হল সেই জাতীয় প্রবন্ধ, যা পড়ে আমাদের মতো অপণ্ডিতদের মন দমে যায় না, উল্লসিত হয়ে ওঠে। যদিচ বিষয়টি হচ্ছে ভীষণ অর্থাৎ 'ব্যাকরণ'। ব্যাকরণের নাম শুনলেই আমি ভয় পাই, যদিও জানি যে ব্যাকরণ হচ্ছে একটি গুরুতর বিষয় যার জটিল সমস্যার চর্চা করেন পণ্ডিত লোক। কিন্তু আমার মতো ব্যাকরণ-ভীত পাঠকেরও শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষের প্রবন্ধ পড়ে মহাভাষ্য পড়তে লোভ হয়।

ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের সম্বন্ধ কী? পতঞ্জলি বলেছেন, "ব্যঞ্জনানি পুনর্নট-ভার্য্যাবদ্ভবন্তি তদ্যথা নটানাং স্ত্রিয়ো যো যঃ পৃচ্ছতি 'কস্য য়ুয়ম কস্য য়ুয়ম' ইতি, তং তং 'তব তব' ইত্যাহুঃ, এবং ব্যঞ্জনান্যপি যস্য যস্যাচঃ কার্য্যমুচ্যতে তং তং ভজন্তে।" এর বাঙলা "ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যেমন ক্ষেত্রানুযায়ী যে-কোন স্বরবর্ণ আশ্রয় করে, নট-স্ত্রীগণও সেই রূপ আহ্বান মাত্র যে-কোন ব্যক্তির অনুবর্তী হয়।"

Consonant-এর সঙ্গে Vowel-এর সম্বন্ধ ইংরাজি বাংলা কোন্ ব্যাকরণ-শাস্ত্রী এ জাতীয় সহজ ও সরস উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন?

নট-স্ত্রীরা যে সতীসাবিত্রী ছিলেন না, সে কথা মনুও বলেছেন। এমনকী, আজও আমাদের বাঙ্গাল দেশে— যে-সকল নটী আহ্বান মাত্র পুরুষ মাত্রেরই ভজনা করে, তারা 'নটী' নামেই পরিচিত। ভরত যে তাঁদের নানা গুণের উল্লেখ করেছেন সে সব গুণ নিশ্চয়ই অন্য জাতীয় গুণ। যোগীমারা শিলালিপিতে পাওয়া যায় যে (খ্রি.পূ. দ্বিতীয় শতক)— "সুতনিকা নামক দেবদাসীকে বারাণসীর অধি-বাসী রূপদক্ষ দেবদত্ত ভালোবাসিয়াছিল।" এ ভালোবাসার কারণ বোধ হয় দেব-দত্ত উক্ত নর্তকীর রূপ-গুণে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং সে গুণ সামাজিক গুণ নয়।

সে যা-ই হোক— পতঞ্জলি নট নটী নাটক প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ পুষ্যমিত্র যখন উত্তরাপথের রাজা, তখন এ দেশে নাটকও ছিল, নাটকাভি-নয়ও ছিল। শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ বলেন যে, "নট কেবল নর্তক ছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই।" কেননা এ বিষয়ে য়ুরোপের মহা-মহা Orientalist দের

মধ্যে মতান্তর, এমনকী মনান্তরও ঘটেছে। এ নিয়ে কত বকাবকি হয়েছে তা যদি জানতে চান তা হলে Keith-এর The Sanskrit Drama নামক পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ে দেখবেন। Keith সাহেব সুলেখক নন, কিন্তু ছিদ্রান্বেষী, অতএব এই পণ্ডিতের তর্ক সুখপাঠ্য না হোক, কৌতুকপ্রদ।

শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ বলেন যে, "পতঞ্জলি এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রাখিয়া যান নাই, কেননা তিনি বলিয়াছেন, 'নটস্য শৃণোতি', 'গ্রন্থিকস্য শৃণোতি'।"

এ কথা শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি, কারণ— ভাসের তারিখ সম্বন্ধে পূর্বে যা লিখেছি, ঘোষ মহাশয় তা অপণ্ডিতের আজগুবি অনুমান বলে নাক সিটকবেন না।

পুষ্যমিত্রের যুগে যে নাটক ছিল, এ কথা মানলে য়ুরোপীয় Orientalist-দের অনেক hypothesis ত্যাগ করতে হয়। ঘোষ মহাশয় বলেন যে, "পতঞ্জলি নট ও শৌভিকদের সমপর্যায়ে গ্রন্থিকদেরও উল্লেখ করিয়াছেন। খুব সম্ভব এই গ্রন্থিকগণ বর্তমান যুগের কথকদেরই পূর্ব সংস্করণ।"

পতঞ্জলি যে-সূত্রে শৌভিক ও গ্রন্থিকদের উল্লেখ করেছেন, সে passage-টি Keith তাঁর পুস্তকে উদ্ধৃত করেছেন। এ বিষয়ে যাঁর কৌতূহল আছে, তিনি তা পড়ে দেখতে পারেন। এবং তদ্দৃষ্টে নিজেই নিজের মতামত গড়তে পারেন। বিলেতি পণ্ডিতেরা বলেন যে, সেকালে নাটক ছিল না। ছিল অবাক চিত্র,— তাঁদের দেশের নাটকের মতো সবাক চিত্র নয়। নটরা নাকি করত শুধু নৃত্য,— আর শৌভিকরা করত শুধু অঙ্গভঙ্গি। গ্রিকরা এ দেশে আসবার পূর্বে নাকি এ দেশের নটনটীদের মুখ ফোটেনি।

ভারতবাসীদের মত কিন্তু অন্য রূপ। বাণভট্ট বলেছেন— 'অতিদয়িত লাস্যস্য চ শৈলুষমধ্যমধ্যাস্য মূর্ধানমসিলতয়া মৃণালমিবালুনাদগ্নিমিত্রাত্মজস্য সুমিত্রস্য মিত্রদেবঃ।' শৈলুষ বৈদিক শব্দ, অর্থাৎ অভিনেতা। অগ্নিমিত্র পুষ্যমিত্রের পুত্র; সুমিত্র অগ্নিমিত্রের পুত্র। অতএব পুষ্যমিত্র আর অগ্নিমিত্রের সময়ে যে নাটক অভিনয় হত, এ কথা বাণভট্টও জানতেন। এ সত্যের সন্ধান তিনি কোথা থেকে পেলেন? চিরাগত tradition থেকে।

নাটকের কথা ছেড়ে দিলেও 'তাৎকালিক ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে যে কত কথা জানা যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই।' ঘোষ মহাশয়ের এ কথায় আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে। আশা করি ঘোষ মহাশয় তাঁর পর-প্রবন্ধে আমাদের সে কৌতূহল চরিতার্থ করবেন। ভারতবর্ষের অতীত সম্বন্ধে আমরা সকলে সমান উদাসীন নই। আমাদের শুধু সংস্কৃত ভাষার ও সংস্কৃত শাস্ত্রের জ্ঞান অল্প। সুতরাং বিশেষজ্ঞরা আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে দেবেন, এ আশা আমরা করি। পণ্ডিতদের জ্ঞানাঞ্জনশলকা, আমাদের চক্ষে প্রয়োগ করা তাঁদের কর্তব্য।

শুধু অতীত নয়— আমাদের বর্তমান সমাজ সম্বন্ধেও ঘোষ মহাশয় বহু কথা বলেছেন, যা আমি ষোলো আনা গ্রাহ্য করি। যথা— আমাদের দেশে যে-ধর্ম হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিত, তাকে মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম বললে অত্যুক্তি হয় না। এ অহিন্দু মত আমি পূর্বে প্রকাশ করেছি। আরও এমন দু'-চারটি কথা আছে, আর উল্লেখ করলুম না, পুঁথি বেড়ে যাবার ভয়ে।

আমার অনুরোধ যে ঘোষ মহাশয় পতঞ্জলির কথা যেন আমাদের আরও শোনান, কেননা সে কথা শুনতে আমাদের সকলেরই ভালো লাগবে। পতঞ্জলি— ব্যাকরণাভ্যাসাৎ— জড়বুদ্ধি পণ্ডিত নন। তাঁর বুদ্ধি জীবন্ত ও জাগ্রত। উপরন্তু humour নামক গুণ— তাঁর মনের একটি বিশেষ ধর্ম। এক কথায় তাঁর মনও modern অর্থাৎ তিনি মূক নন, অন্ধ নন, বধিরও নন।

বৈ শ্য স ভ্য তা

আমার বয়স যখন আট বৎসর, তখন আমি কবি মনোমোহন বোসের একটি লম্বা কবিতা পড়ি। সে কবিতার প্রথম লাইন হচ্ছে—

'দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন।'

আমি মনোমোহন বোসকে কবি বলছি এই কারণে যে, আমাদের ছেলেবেলায় যে-সমস্ত কবিতাপুস্তক পড়তে হত, তার মধ্যে মনোমোহন বোসের পদ্যমালা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। যদুগোপাল চাটুজ্যের পদ্যপাঠ ছিল নানা কবির নানা কবিতার এক প্রকার সংগ্রহ-পুস্তক, কিন্তু মনোমোহন বোসের পদ্যমালা আদ্যোপান্ত তাঁর নিজের লেখা। ছেলেদের সে কবিতাগুলি খুব ভালো লাগত; এবং বড়রাও তার তারিফ করতেন। যে-দীর্ঘ কবিতাটির উল্লেখ করেছি, তাতে এক জায়গায় ছিল—

'তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার।'

ইংরেজ আমলে যে নানা রূপ আর্টিজান ক্লাসের দুর্দশা ঘটেছে, তা সকলেই জানেন। এর কারণ, হাত কলের সঙ্গে সমান বেগে চলতে পারে না। এর ফলে কারিগরের দল সব কর্মহীন ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এ ঘটনা সব দেশেই হয়েছে। জর্মান কবি হাউপ্টম্যান এই ব্যাপার নিয়ে 'Weavers' নামক একখানি নাটক লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

এই আর্টিজান সম্প্রদায় আমাদের দেশের গৌরববৃদ্ধি করেছিল। কামার, কুমোর, ছুতোর প্রভৃতি আমাদের দেশে নবশাখ বলে পরিচিত। এই নবশাখ সম্প্রদায় সমাজের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। কারণ এদের হাতে-গড়া সামগ্রী ব্যতীত দৈনিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করা অসম্ভব ছিল। এই নবশাখদের প্রতি আমাদের কোন রূপ অবজ্ঞা ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে যখন জাহাজে-আনা কলে-তৈরি নানা দ্রব্যে দেশ ছেয়ে ফেলেছে, এবং এই কারিগর সম্প্রদায় আমাদের মতো শিক্ষিত নয়, অর্থাৎ ইংরেজি-শিক্ষিত নয়,— তখন ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট তারা নগণ্য শূদ্রের সামিল হয়ে পড়েছে।

এই নবশাখ সম্প্রদায় কারা?— আমার বিশ্বাস তারা আদিতে বৈশ্য ছিল। মনু এ সব সম্প্রদায়ের একটি লম্বা ফর্দ দিয়েছেন। তাঁর মতে তারা সকলেই বর্ণসঙ্কর।

এবং কী করে তারা বর্ণসঙ্কর হল, তারও হদিশ তিনি বাতলেছেন। কিন্তু মনুর সে সব কথা অগ্রাহ্য। একটা কথা নিশ্চিত যে, সেকালে বৈশ্যেরা দ্বিজ ছিল, এবং তাদের উপনয়ন হত। তারা সাবিত্রীভ্রষ্ট নয়; অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্রে তাদের অধিকার ছিল। সংস্কৃত বইয়ে বৈশ্যদের বিষয় বেশি কিছু লেখা হয়নি; লেখা হয়েছে শুধু ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের বিষয়। সেদিন পঞ্চতন্ত্রের একটি গল্প পড়লুম। তার থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় ছুতোর ও তাঁতিরা সব বৈশ্য ছিল।

সে গল্পটি হচ্ছে এই : গৌড়দেশে এক ছোকরা রথকার (ছুতোর) আর একটি কৌলিক (তাঁতি) ছিল, যারা নিজের-নিজের বিদ্যায় পারগামী হয়েছিল। উভয়ে পরস্পরের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তারা দিনের বেলায় নিজের-নিজের কাজ করত, তারপর সন্ধ্যাবেলায় মৃদু বিচিত্র বসন পরিধান করে, সুগন্ধদ্রব্য অঙ্গে লেপন করে ভ্রমণ করতে বেরত; এবং মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করত। একদিন তাঁতি ছোকরা হঠাৎ রাজপ্রাসাদের বাতায়নে রাজকন্যাকে দেখতে পেলে, এবং দেখা মাত্র তার প্রতি ভয়ঙ্কর প্রণয়াসক্ত হল। তার পরদিন থেকে সে আহারনিদ্রা ত্যাগ করলে। তার এই রকম অবস্থা দেখে রথকার বন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করলে— কী হয়েছে? তাতে সে বললে যে, সে রাজকন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে, অথচ তাকে পাবার কোন উপায় নেই, তাই তার এই দশা। তার উত্তরে রথকার বললে— তোমার কোন ভাবনা নেই; আমি একটি গরুড়যন্ত্র তৈরি করে দেব, যাতে চড়ে তুমি আকাশপথে উড়ে রাজ-অন্তঃপুরে গিয়ে প্রবেশ করতে পারবে— স্বয়ং নারায়ণ সেজে। এই গরুড়যন্ত্র হচ্ছে, ইংরেজিতে যাকে বলে এরোপ্লেন, তারই সংস্কৃত নাম। এই গল্পটি অতি চমৎকার, কিন্তু এ স্থলে সব গল্পটি আমি বলব না।

রথকার আরও বললে—

ক্ষত্রিয়ো হসৌ রাজা। ত্বং চ বৈশ্যঃ সন্ অধর্মাদ্ অপি ন বিভেষি। ততো হসৌ প্রাহ। ক্ষত্রিয়স্য তিস্রো ভার্যা ধর্মতো ভবন্ত্য এব। তদ্ এষা কদাচিদ্ বৈশ্যা-সুতা ভবিষ্যতি। তদ্ অনুরাগো মমাস্যাম। উক্তং চ।

> অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা
> যদ্ আর্যম্ অস্যাম্ অভিলাষি মে মনঃ।
> সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
> প্রমাণম্ অন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ॥

উপরে যে-সংস্কৃত কথাগুলি তুললুম, তার ভাবার্থ এই— রাজকন্যাকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে অধর্ম হবে না। কেননা, রাজা হচ্ছেন ক্ষত্রিয়; আর শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তিন বর্ণের তিনটি বিবাহ করা বৈধ। প্রথম স্ত্রী হবেন ক্ষত্রিয়কন্যা, দ্বিতীয়টি বৈশ্যকন্যা, এবং তৃতীয়টি শূদ্রকন্যা। এ অবস্থায়, যে-রাজকন্যাকে তুমি দেখেছ, সে বৈশ্যসুতাও হতে পারে। তা ছাড়া এ রূপ সন্দেহের স্থলে সৎলোকের

মনোমতো কাজ করাই সঙ্গত।— এ কথোপকথন থেকে প্রমাণ হয় যে, আমরা যাকে নবশাখ বলি, তারা সকলে বৈশ্য ছিল; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। তারাও দ্বিজ। প্রভেদ যা ছিল, তা কেবল গুণকর্মে। এই বৈশ্য সম্প্রদায় ইংরেজ আমলে শুধু নিঃস্ব হয়ে পড়েনি, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে হেয় হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে না হোক, বৌদ্ধ সাহিত্যে বৈশ্যদের অনেক কথা আছে। ভগবান বুদ্ধ যখন কোন নতুন নগরে যেতেন, তখন এই সব কামার কুমোর তাঁতি প্রভৃতি নিজ-নিজ সম্প্রদায়ের নিশান উড়িয়ে মহা ধুমধাম করে দলে-দলে তাঁর অভ্যর্থনা করতে আসত। আর আমার বিশ্বাস, এরা সকলেই ছিল বৈশ্য। এবং ভগবান বুদ্ধের নবপ্রচারিত ধর্ম প্রধানত বৈশ্য সম্প্রদায়ই গ্রহণ করেছিল। এ বিষয় যদি বিস্তারিত জানতে চান তো মহাবস্তু পড়ে দেখবেন।

স্বয়ং বুদ্ধের প্রধান শিষ্যের ভিতর উপালি ছিল নাপিত, এবং ঘটিকার (কুমোর) প্রভৃতি ছিল তাঁর আদিশিষ্য। জাতক-এ অনেক লোকের বর্ণনা পাওয়া যায়, যারা সকলেই ছিল বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। পরে অবশ্য অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাঁর উপাসক হয়ে ওঠে। এরা সকলেই ছিল সমাজে গণ্যমান্য। এমনকী পৈশাচী ভাষায় লিখিত গুণাঢ্যের বৃহৎকথা এই বৈশ্য বণিক এবং কারুজীবীদের বর্ণনায় পূর্ণ। এ সব কথা বলাব উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, সেকালে বৈশ্যরা হেয় সম্প্রদায় ছিল না, এবং ভারতবর্ষের সভ্যতা তারাই এক রকম গড়ে তুলেছিল।

বাংলায় যাঁরা সর্বপ্রথম ইংরেজি-শিক্ষিত হন, তাঁরা বাঙালিদের অনেক বিষয়ে আত্মোন্নতির পথপ্রদর্শক। তাঁদের মধ্যেও এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা এই আর্টিজান ধ্বংস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। আমি খালি একজনের উল্লেখ করব। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর লেখক টেকচাঁদ ঠাকুরের ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনী যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন যে, তিনি দেশের শিল্পরক্ষা ও শিল্পের উন্নতির জন্য কত নানাবিধ চেষ্টা করেছিলেন। তার পরে অপর অনেকেও করেছেন। কিন্তু সে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষিত বুর্জোয়া সম্প্রদায় এর কোন প্রতিকার করতে পারেনি।

তার বহু কাল পরে, স্বদেশি আন্দোলনের সময় দেশি শিল্পরক্ষার জন্য অনেকে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। এবং বাংলার প্রধান শিল্প বস্ত্রবয়নের দিকে তাঁদের নজর পড়ে। চন্দননগরের খটখটি তাঁত দেশময় প্রচার করবার জন্য বহু লোক প্রাণপণ চেষ্টা করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে এই বস্ত্রশিল্পের উন্নতির জন্য বহু অর্থব্যয় করেছেন। অবশ্য আমাদের এ সব চেষ্টায় ম্যাঞ্চেস্টরকে কাবু করতে পারা যায়নি। কারণ তাঁতিরা ম্যাঞ্চেস্টর থেকেই সুতো কিনত।

তারপর মহাত্মা গান্ধি চরকার আশ্রয় নিলেন। এবং চরকায় কাটা মোটা সুতোয়

খদ্দর প্রস্তুত করতে ব্রতী হলেন। খদ্দরের পলিটিকাল প্রভাব যা-ই হোক, আমাদের ইন্ডাস্ট্রির তাতে বিশেষ কিছু উন্নতি হয়েছে বলে তো মনে হয় না।

আমি বহু কাল পূর্বে রংপুরে এক রায়ত সভায় সভাপতি হিসেবে একটি অভিভাষণ পাঠ করি। সে ক্ষেত্রে আর পাঁচ কথার ভিতর আমি বলি :

"ইংরেজের আমলে আমাদের হাত যে শুকিয়ে গিয়েছে তার প্রমাণ, যে-সম্প্রদায়ের কাজই হচ্ছে হাতের কাজ, সে সম্প্রদায় এক রকম উচ্ছন্নে গেছে। কামার কুমোর তাঁতি ছুতোর যুগী জোলা প্রভৃতি সব কলের তলে চাপা পড়ে পিষে গিয়েছে। শিল্পীর দল এখন আর এ দেশে নেই, আছে য়ুরোপে, আমেরিকায়, জাপানে, অস্ট্রেলিয়ায়। তাদের হাতের তৈরি মাল আমাদের জীবনযাত্রার সম্বল। কিন্তু যে-দেশে শিল্প আছে, সে দেশে এ কালে শিক্ষার সঙ্গে শিল্পের, মাথার সঙ্গে হাতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। এর একটির শক্তির সঙ্গে অপরটির শক্তি বাড়ে কিংবা কমে, সুতরাং সে সব দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সমাজদেহেরই উচ্চাঙ্গ। এ দেশে সে উচ্চাঙ্গ ছিন্ন অঙ্গ। আমি যখন একটু দূর থেকে স্ব-সম্প্রদায়কে দেখি, তখন আমি মনে-মনে এ কথা না বলে থাকতে পারিনে যে, কাটা মুণ্ড কথা কয়। শুধু কথা কয় না, বড়-বড় কথা বলে, তা-ও আবার ইংরেজিতে। এ দেখে যাঁর আনন্দ হয় তিনি ছেলেমানুষ; আমার শুধু হাসি পায়, কিন্তু সে হাসি কান্নারই সামিল।"

আমাদের বর্তমান দুর্দশার প্রধান কারণই হচ্ছে, সমাজ-অঙ্গের হস্ত পঙ্গু হয়ে যাওয়া। এই ভীষণ অবস্থা থেকে কী করে উদ্ধার পাব, আমি তা জানিনে; অপর কেউ জানেন বলেও আমার বিশ্বাস নেই। সুতরাং রংপুরের বক্তৃতাতে আমি এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার কোন উপায় বাতলাইনি। ধরুন যদি বর্তমান যুদ্ধের পরে আমরা স্বরাজ লাভ করি, তা হলেও এ ঘোর সমস্যা সমানই থেকে যাবে। কারণ আমরা পলিটিকাল স্বরাজ পেলেও, বিদেশের কাছে ইকনমিক অধীনতা দূর হবে না। তবে স্বরাজ লাভ করলে এই সমস্যার দিকে সকলেরই নজর পড়বে, এবং ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণ আমাদের দেশের বৈশ্য সভ্যতা পুনরুদ্ধার করতে ব্রতী হবেন। আজকের দিনে পলিটিকস ইকনমিকস-এর অধীন হয়ে পড়েছে। বর্তমান যুদ্ধের মূলে যতটা ইকনমিকস আছে, সম্ভবত ততটা পলিটিকস নেই। আবার এই যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর সব জাতিই অত্যন্ত ইকনমিক দুর্দশায় পড়েছে; যদিও আমাদের মতো ঘোর দুর্ভিক্ষ আর কারও হয়নি।

আমাদের দেশ কৃষিকর্মের দেশ। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে সম্বোধন করে একটি গানে বলেছিলেন—

"দেশে বিদেশে বিতরিছ অন্ন।"

আজও হয়তো আমরা দেশে বিদেশে অন্ন বিতরণ করছি; কিন্তু দেশের লোকে অন্নাভাবে উপবাসী।

শিল্পজাত দ্রব্য সম্বন্ধে আমরা যে বিদেশিদের কত দূর অধীন, আজকে সে বিষয় সকলেরই চোখ ফুটেছে। নিত্যব্যবহার্য বস্তু যে শুধু ভয়ানক দুর্মূল্য তা নয়— দুষ্প্রাপ্য। কোন্ কোন্ জিনিস দুষ্প্রাপ্য তার কোন ফর্দ দেব না। কারণ তার অভাব সকলেই অনুভব করছেন। আমি পূর্বে বলেছি যে, শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনক্ষেত্রে কলের সঙ্গে হাত পাল্লা দিতে পারে না। অপর পক্ষে, এক হিসেবে কল হাতের সঙ্গে লড়তে পারে না। সূক্ষ্ম ও সুন্দর জিনিস হাত যেমন তৈরি করতে পারে, কল তা পারে না। সে কারণ, আমাদের কোন-কোন শিল্প আজও টিকে আছে। বয়নশিল্পে তাঁতিদের কাছে বিলাতের কল সব হেরে গিয়েছে। শান্তি-পুর ও ঢাকার তাঁতিদের বোনা ধুতি-শাড়ির সঙ্গে কলে-বোনা ধুতি-শাড়ির কোন তুলনা হয় না। সুতরাং আজও দেশে তাঁতে-বোনা কাপড়ের যথেষ্ট চাহিদা আছে।

কুমোরের ব্যবসা আজও সমান চলছে। তার কারণ, আমরা চীনেমাটির বাসন ব্যবহার করিনে, করি দেশি মাটির বাসন। সে সব জিনিস, যথা হাঁড়িকলসী প্রভৃতি, দেশে প্রচুর পরিমাণে বানানো হয়। সেগুলি যেমন নিত্যব্যবহার্য, তেমনি সুলভ। কী ইংলন্ড, কী জর্মানি, এ বিষয়ে আমাদের দেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে কখনও চেষ্টাও করেনি। মাটির ঠাকুরও বিদেশিরা গড়তে পারে না। আমি আমার 'আত্ম-কথা'য় বলেছি যে, কৃষ্ণনগরের তুল্য কুমোর বাংলায় আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের ভালো-ভালো কারিগর এখন আর্টিস্ট হবার চেষ্টায় আছে। যে-মূর্তি পাথব কেটে গড়লে অতি সুদৃশ্য হয়, সেই জাতীয় মূর্তি সব মাটিতে গড়বার চেষ্টা করছে। উপরন্তু তারা জর্মানির চীনেমাটির পুতুলেরও নকলে পুতুল গড়ছে।

এই শিল্পজাত দ্রব্যের অভাব কী করে পূরণ করা যেতে পারে, সে বিষয় এখন কোন-কোন সাহিত্যিকও পথপ্রদর্শক হয়েছেন। 'গড্ডলিকা'র লেখক শ্রীযুক্ত রাজ-শেখর বসুর সদ্যপ্রকাশিত 'কুটিরশিল্প' নামক পুস্তিকা তার প্রমাণ। য়ুরোপে যাকে বলে কটেজ ইন্ডাস্ট্রি, রাজশেখরবাবুর কুটিরশিল্প ঠিক তা নয়। এই কটেজ ইন্ডাস্ট্রি বড়-বড় কলকারখানার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে কি না, সে বিষয়ে ইকনমিস্টরা বহু আলোচনা করেছেন। শেষটা তাঁরা এই মত প্রকাশ করেছেন যে, তা কিছুতেই হতে পারে না। কলের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার জন্য আমাদের নানা রূপ পরীক্ষা করতে হবে। সে সব পরীক্ষার ফল যে কী হবে, তা আজকের দিনে বলা কঠিন। কল যখন মানুষের সুবিধার্থ নির্মিত হয়েছে, তখন কলের উচ্ছেদ করা অসম্ভব। আমি সেদিন ইংরেজ লেখক প্রিস্টলি-র একখানা বই পড়ছিলুম। তাতে দেখলুম তিনি বলেছেন, বড়-বড় কলকারখানাই মানবজাতির বর্তমান দুর্দশার কারণ। কিন্তু বড়-বড় কলকারখানা বন্ধ করে দিয়ে ছোট-ছোট কারখানা প্রতিষ্ঠা করলেই যে মানবজাতি স্বর্গলাভ করবে, তা তো মনে হয় না। আমার বিশ্বাস কলের কাজও থাকবে, হাতের কাজও থাকবে। হাতের পিছনে মানুষের মন আছে, কলের পিছনে

নেই। আর মানুষের মন বাদ দিয়ে মানুষের সভ্যতা কী করে গড়া যায়, তা আমি জানিনে। ভবিষ্যতে কলের কাজের সঙ্গে হাতের কাজেরও একটা ভাগবাঁটোয়ারা হবে বলে আমার বিশ্বাস। অনেকে বলেন যে, বিলাতি সভ্যতা বৈশ্য সভ্যতা। হতে পারে তা-ই। কিন্তু বৈশ্য সভ্যতার প্রধান সহায় হচ্ছে ক্ষাত্রশক্তি। আর এই ক্ষাত্র-শক্তির ধ্বংসলীলা তো আমরা আজ দেখতেই পাচ্ছি। এমন দিন যদি কখনও আসে যে-দিন পৃথিবীতে ক্ষাত্রশক্তির অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ সভ্যতা ও বৈশ্য সভ্যতা দুইয়ে মিলে একটি নতুন সভ্যতা গড়ে তুলতে পারবে, তা হলে সেই শান্ত সভ্যতার কাছে মানবজাতি সুখস্বাচ্ছন্দ্য আশা করতে পারে।

মৃচ্ছকটিক কার রচনা

কালিদাস ও ভাস উভয়েরই সন-তারিখ আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত। ভাস যে কালিদাসের পূর্ববর্তী নাট্যকার, তার পরিচয় কালিদাস নিজমুখে দিয়েছেন। তাঁর প্রথম নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রে গোড়াতেই তিনি বলেছেন— ভাস, সৌমিল্ল ও কবিপুত্রদের মতো আমি প্রথিতযশস্বী নাট্যকার না হলেও, আমার এই নূতন নাটক আমি আর্যমিশ্রদের কাছে উপস্থিত করতে সাহসী হয়েছি। কারণ, যা-কিছু পুরনো তা-ই যে ভালো, আর যে-রচনা নতুন তা-ই যে অগ্রাহ্য, তা অবশ্য নয়।— সৌমিল্ল ও কবিপুত্র-দ্বয়ের কোন নাটক আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু ভাসের প্রায় সমস্ত নাটক সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর থেকে কীথ (Keith) অনুমান করেন যে, ভাস কালিদাসের ১০০ বছর পূর্বে তাঁর সব নাটক রচনা করেন। কালিদাসের কাল খুব সম্ভবত ৪০০ খ্রিস্টাব্দ। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ভাস হচ্ছেন ৩০০ খ্রিস্টাব্দের লেখক।

ভাসের নাটক যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন আমি মডার্ন রিভিউ-তে প্রকাশিত একটি ইংরেজি প্রবন্ধে ভাসকে নারায়ণ কাণ্বের সমসাময়িক বলি। সে প্রবন্ধটি পড়ে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল আমাকে বলেন যে, তিনি আমার সংগৃহীত facts থেকে আমার মত গ্রাহ্য করেন। অপর পক্ষে জর্মানির খ্যাতনামা ওরিয়েন্টালিস্ট জেকবি আমাকে বলেন, ভাস যে-প্রাকৃত ব্যবহার করেছেন, তার থেকে বোঝা যায় তিনি নারায়ণ কাণ্বের পরবর্তী লেখক।

মৌর্য বংশের শেষ রাজাকে তাঁর সুঙ্গ সেনাপতি পুষ্যমিত্র বধ করে নিজে রাজা হয়ে বসেন। পরে সুঙ্গবংশকে ধ্বংসপূর্বক নারায়ণ কাণ্ব তাঁদের সিংহাসন দখল করেন। ভাস যদি নারায়ণ কাণ্বের সমসাময়িক হন, তা হলে তাঁর কাল হয় খ্রিস্টপূর্ব।

সে যা-ই হোক, মেনে নিচ্ছি যে, ভাসের আনুমানিক তারিখ হচ্ছে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ, এবং কালিদাসের ৪০০। সংস্কৃত ভাষায় মৃচ্ছকটিক নামে একখানি এক-ঘরে নাটক আছে। অর্থাৎ এর অনুরূপ দ্বিতীয় নাটক নেই। এই মৃচ্ছকটিক কার লেখা ও কবে লেখা, তা আজও জানা নেই। বিলিতি ওরিয়েন্টালিস্টরা এ সম্বন্ধে নানা মতামত প্রকাশ করেছেন। কীথ বলেন, মৃচ্ছকটিক ভাসের পরে এবং কালি-

দাসের পূর্বে লেখা। বহু সংস্কৃত নাটকে সূত্রধার লেখকের নাম উল্লেখ করেন। ভাসের নাটকে তাঁর নাটক যে কার রচিত, সে বিষয় কোন উল্লেখ নেই। কালি-দাসের নাটকে তা আছে। তার পরবর্তী সব নাটকেই নাট্যকারের নাম আছে; তার বেশি কিছু নেই। কিন্তু মৃচ্ছকটিকে লেখকের লম্বা পরিচয় দেওয়া আছে। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ রাজা, তাঁর নাম শূদ্রক; তিনি ছিলেন চতুর্বেদ, কামশাস্ত্র, হস্তীবিদ্যা প্রভৃতিতে পারদর্শী; তিনি একশো বৎসর দশ দিন বয়সে আগুন জ্বালিয়ে তাতে পুড়ে মরেন। এই অদ্ভুত কথা যে কেউ বিশ্বাস করতে পারে, সে ধারণা আমার নেই। কীথ তা বিশ্বাস করেননি। শূদ্রক বলে যে কোন রাজা কবি ছিলেন, এ কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। কীথ বলেন, কেউ ছিল না; এ হচ্ছে একটা বাজে কিংবদন্তি। এর পর সূত্রধার আরও একটি শ্লোকে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রের আরম্ভেই তাঁর পূর্বেকার প্রথিতযশা নাট্যকারদের নামোল্লেখ করেছেন, তা আগেই বলেছি। যদি তাঁর পূর্বে মৃচ্ছকটিক লেখা হত, তা হলে তিনি নিশ্চয়ই তার রচয়িতার নাম উল্লেখ করতেন।

এখন মৃচ্ছকটিকের প্রথম চার অঙ্কের লেখক কে, তা আমরা জানি। ভাস 'দরিদ্র চারুদত্ত' নামক একখানি নাটক লেখেন। সে নাটকের প্রথম চার অঙ্ক পাওয়া গিয়েছে, পরের অংশ পাওয়া যায়নি। মৃচ্ছকটিকের প্রথম চার অঙ্ক 'দরিদ্র চারুদত্ত' থেকে আগাগোড়া চুরি। তফাতের ভিতর এই যে, যিনি মৃচ্ছকটিক লিখেছেন তিনি অপরের লিখিত অনেক কথা এতে যোজনা করেছেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে ভাসের লিখিত কতকগুলি শ্লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেগুলি প্রায় সবই 'দরিদ্র চারুদত্ত' থেকে উদ্ধৃত। যথা ঘোর অন্ধকারের এই চমৎকার উৎপ্রেক্ষাটি— লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।

কোন প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রে মৃচ্ছকটিকের নাম পর্যন্ত উল্লেখ নেই,— আছে সাহিত্যদর্পণে; আর সে গ্রন্থ গত দু-তিনশো বৎসরের মধ্যে লেখা। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে অভিনব গুপ্ত 'দরিদ্র চারুদত্তে'র নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটি যে খণ্ডিত পুস্তক, তা ঘুণাক্ষরেও বলেননি। এর থেকে অনুমান করছি যে, অভিনব গুপ্তের সময়ে সে নাটক সম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল। ভাসের অন্যান্য সমস্ত নাটকই পুরোপুরি পাওয়া গেছে, কেবল 'দরিদ্র চারুদত্তে'র এই খণ্ডিত রূপ। এর কারণ বোধ হয়, যিনি মৃচ্ছকটিক নামে এটি চালাতে চেষ্টা করেছেন, তিনি এর উপর হস্তক্ষেপ করেছেন।

সূত্রধার প্রথমে মৃচ্ছকটিকের কবির নাম করে এবং তাঁর রূপ-গুণের পরিচয় দিয়ে, তার পরেই এ নাটকে কী কী আছে তার ফর্দ দিয়েছেন। কী দেশি, কী বিলিতি, কী প্রাচীন, কী নবীন, কোন নাটকেই ইতিপূর্বে এ জাতীয় table of contents দেখিনি। সে ফর্দটি এখানে তুলে দিচ্ছি :

অবন্তিপূর্যাং দ্বিজসার্থবাহো যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ।
গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্য বসন্তশোভেব বসন্তসেনা।।
তয়োরিদং সৎসুরতোৎসবাশ্রয়ং নয়প্রচারং ব্যবহারদুষ্টতাম্।
খলস্বভাবং ভবিতব্যতাং তথা চকার সর্বং কিল শূদ্রকোনৃপঃ।।

অস্য বাংলা :

"উজ্জয়িনী নগরে চারুদত্ত নামে, ব্রাহ্মণজাতীয় অথচ বাণিজ্যব্যবসায়ী এক দরিদ্র যুবক ছিলেন এবং বসন্তকালের শোভার ন্যায় বসন্তসেনা নামে একটি গণিকা সেই চারুদত্তের গুণে অনুরক্ত হইয়াছিল।

"রাজা শূদ্রক সেই চারুদত্ত ও বসন্তসেনার নির্দোষ রমণোৎসব, নীতির প্রচার, ব্যবহারের মোকর্দমার দোষ, খলের চরিত্র এবং দৈব— এই সমস্তই নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।"

এর থেকে প্রমাণ হয় যে, মৃচ্ছকটিকের চোর কবির সম্মুখে একটি আদর্শ নাটক ছিল; যার থেকে তিনি এই বিষয়-সূচি নিয়েছেন। এবং আমার বিশ্বাস, মৃচ্ছকটিক হচ্ছে ভাসের লিখিত সমগ্র 'দরিদ্র চারুদত্তে'র একটি চোরাই সংস্করণ। এখানে-ওখানে দু-চারটি শ্লোক সংযোজন এবং বর্জন ছাড়া এই শূদ্রক কবি, তিনি যিনিই হোন, আর বিশেষ কিছু করেননি। প্রথমত, মৃচ্ছকটিকে প্রধান পাত্র হচ্ছেন নায়ক চারুদত্ত এবং নায়িকা বসন্তসেনা। তাদের প্রণয়ঘটিত ব্যাপার হচ্ছে সৎসুরতোৎসব। নীতিপ্রচারের পরিচয় সমস্ত নাটকখানিতে পাওয়া যায়। এক শকার ছাড়া আর কেউ চারিত্র্যভ্রষ্ট নন। চারুদত্তের স্ত্রী ধূতা থেকে আরম্ভ করে শকারের ভৃত্য স্থাবরক পর্যন্ত ঘোর বিপদে পড়ে সকলেই নিজের-নিজের চারিত্র্য বজায় রেখেছেন। এবং সে কথা বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন। খলস্বভাব হচ্ছে শকারের স্বভাব। 'দরিদ্র চারুদত্তে'র প্রথম চার অঙ্কের ভিতর বিট শকারকে বলেছেন পশুর নব অবতার। ব্যবহারদুষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায় মৃচ্ছকটিকের নবম অঙ্কে। প্রথম অঙ্কেই চারুদত্ত বলেছেন যে, দারিদ্র্যের একটি মহা দোষ এই যে, পাপকর্ম অন্যে করলেও দরিদ্র ব্যক্তি তার জন্য দোষী হয়ে পড়ে। শর্বিলক চারুদত্তের বাড়ির সিঁদ কেটে বসন্ত-সেনার গচ্ছিত অলঙ্কার চুরি করেছিল। সেই চৌর্যের জন্যে trial scene-এ চারুদত্ত দোষী সাব্যস্ত হন। সুতরাং 'দরিদ্র চারুদত্তে' যে একটি trial scene থাকবে, তার ইঙ্গিত সে নাটকের প্রথম অঙ্কেই পাওয়া যায়। 'দরিদ্র চারুদত্তে'র চতুর্থ অঙ্ক শেষ হয়েছে এই কথায়, দুর্দিন উপস্থিত। পঞ্চম অঙ্ক পাওয়া যায়নি। কিন্তু মৃচ্ছকটিকের পঞ্চম অঙ্কে চারুদত্তের প্রথম কথাই হচ্ছে : দুর্দিন উপস্থিত। এই দুর্দিনে মেঘ ও বৃষ্টির ভিতর বসন্তসেনার অভিসারের বর্ণনায় সে অঙ্ক পরিপূর্ণ। আমার ধারণা তার অনেক শ্লোক ভাসের রচিত। কোন্ কোন্ শ্লোক, সে কথা পরে বলব।

মৃচ্ছকটিক কোন্ সময়ে লেখা এবং কার লেখা, তা আজও অজ্ঞাত। কীথের

মতো পণ্ডিতও বলেন নাটকখানি দু-হাতে রচিত। প্রথম চার অঙ্ক ভাসের, শেষ দু'-অঙ্ক অজ্ঞাতকুলশীল অন্য কোন কবির। এ কথা যদি ধরে নেওয়া যায় যে, দশ অঙ্কই ভাসের লিখিত, তা হলে মৃচ্ছকটিকের সমস্যা আর থাকে না। তখন মৃচ্ছ-কটিককে আমরা দরিদ্র চারুদত্তের একটি পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ বলে গ্রাহ্য করতে পারি। আর তখন এই চোর কবির বৃথা সন্ধান আমরা করব না। কীথ সাহেব বলেন যে, ভাসের লেখা হলে, অপর যিনি তার উপর হস্তক্ষেপ করেছেন, তিনি যা করেছেন তা হচ্ছে 'inexcusable plagiarism'।

অথচ কীথ স্বীকার করেন যে, মৃচ্ছকটিকের প্রধান গুণ হচ্ছে তার সহজ এবং সরল ভাষা, যা ভাসের ভাষার অনুরূপ। আর তার আর-একটি গুণ হচ্ছে, 'wit and humour'। তিনি বলেন, এ গুণও মৃচ্ছকটিকের কবি ভাসের কাছ থেকে পেয়েছেন। যদি সবটা ভাসের লেখা বলে ধরে নেওয়া যায়, তা হলে সকল গোলই মিটে যায়।

আমি সে কারণে সমস্ত নাটকখানি ভাসের রচনা বলেই ধরে নিচ্ছি। এর পরে ভাসের সপক্ষে আর কী-কী প্রমাণ পাওয়া যায়, তার বিচার করব। এবং এই চোর কবি কোন্ সময়ে 'দরিদ্র চারুদত্ত'কে ঈষৎ রূপান্তরিত করেছিলেন, তারও তারিখ নির্ণয় করতে চেষ্টা করব।

২

কীথ বলেন যে, মৃচ্ছকটিক দু-হাতের লেখা। আমি তা স্বীকার করি। সমস্ত নাটকখানি ভাসের রচিত। কিন্তু 'দরিদ্র চারুদত্তে'র প্রথম চার অঙ্কের অন্তরে অপর কোন অজ্ঞাতকুলশীল চোর কবি যেমন অনেক কথা ঢুকিয়ে দিয়েছেন, শেষ ছয় অঙ্কের ভিতর তেমনি কিছু-কিছু গদ্যপদ্য তিনি নিশ্চয়ই প্রবেশ করিয়েছেন। কীথ বলেন, মৃচ্ছকটিকে একটি প্রণয়কাহিনী আছে, আর একটি রাজনৈতিক বিপ্লবকথা আছে। 'দরিদ্র চারুদত্তে'র প্রথম অংশে এই রাজনৈতিক বিপ্লবের কোন উল্লেখ নেই। অতএব তাঁর মতে, মৃচ্ছকটিকের চোর-কবি এই সমস্ত ব্যাপারটি প্রণয়কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। তাতেই এই নাটকের নূতনত্ব ও বিশেষত্ব। গ্রিক কমেডিতে নাকি এ রকম ব্যাপার আছে। কিন্তু মৃচ্ছকটিক ব্যতীত অপর কোন সংস্কৃত নাটকে নেই। 'দরিদ্র চারুদত্তে' উজ্জয়িনীর রাজা পালককে হত্যা করা হয়। কিন্তু আমি বলি, ভাস পূর্বেও এই রাজনৈতিক বিদ্রোহ অবলম্বন করে নাটক লিখেছেন। Regicide হচ্ছে তাঁর বালচরিতের প্রধান ঘটনা। সুতরাং এ রকম রাজনৈতিক ঘটনার জন্যে কোন গ্রিক নাটকেরও দোহাই দেবার দরকার নেই, চোর-কবির নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধিরও তারিফ করবার দরকার নেই। 'দরিদ্র চারুদত্তে' প্রথম থেকেই রিভল্যুশনের যে-আবহাওয়া রয়েছে, শেষকাণ্ডে তারই পরিণতি হয়।

পূর্বে বলেছি যে, মৃচ্ছকটিকের অন্তর থেকে কোন্ কোন্ শ্লোক ভাসের, তা উদ্ধার করবার চেষ্টা করব। কিন্তু পরে ভেবে দেখছি যে, সে এক রকম অসাধ্য-সাধন হবে। ধরুন, আমি যদি কোন-কোন শ্লোককে ভাসের লেখা বলি, অপরে তা গ্রাহ্য করতে বাধ্য নয়। এবং আমার কথা যে ঠিক, তা-ও আমি প্রমাণ করতে পারব না। বিলাতের প্রসিদ্ধ সমালোচক ওয়াল্টার পেটার তাঁর Appreciations নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কোন্-কোন্ কবিতা খুব উচ্চ শ্রেণীর আর কোন্গুলি ছাইপাঁশ তা যদি কেউ বেছে নিতে পারে তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে, কবিতা কাকে বলে সে জ্ঞান তার আছে। আমি নিজেকে এ জাতীয় সমজদার বলে মনে করিনে। তা হলেও মৃচ্ছকটিকের পঞ্চম অঙ্কে বর্ষা সম্বন্ধে অসংখ্য সুভাষিতাবলির কোন-কোনটি ভাসের রচিত বলে আমার মনে হয়। বর্ষা সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যে অসংখ্য কবিতা আছে। বর্ষা যে মেঘরূপ হাতিতে চড়ে বিদ্যুৎরূপ পতাকা উড়িয়ে, বজ্রধ্বনিরূপ ঢাক বাজিয়ে আসে, এ কথা কালিদাসও বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, মেঘ 'বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।' এ সব উপমার পুনরুক্তি বহু সংস্কৃত কাব্যে দেখা যায়। কিন্তু যে-বর্ণনায় সম্পূর্ণ নূতনত্ব আছে আর যা অতি সহজে বলা হয়েছে, সে উপমাগুলি ভাসের রচিত বলে মেনে নিতে প্রবৃত্তি হয়। আমি মৃচ্ছকটিকের পঞ্চম অঙ্ক থেকে এই রকম কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করছি :

১. মেঘো জলার্দ্রমহিষোদর ভৃঙ্গনীলো বিদ্যুৎপ্রভা-রচিত-পীত-পটোত্তরীয়ঃ।
আভাতি সংহতবলাক-গৃহীত শঙ্খঃ খং কেশবোঽপর ইবাক্রমিতুং প্রবৃত্তঃ।।

২. বিদ্যুৎপ্রদীপশিখয়া ক্ষণনষ্টদৃষ্টাঃ।
ছিন্না ইবাম্বরপটস্য দশাঃ পতন্তি।।

৩. বিদ্যুজ্জিহ্বেনেদং মহেন্দ্রচাপোচ্ছ্রিতায়তভুজেন।
জলধর-বিবৃদ্ধ-হনুনা বিজৃম্ভিতমিবান্তরীক্ষেণ।।

৪. তালীষু তারং বিটপেষু মন্দ্রং শিলাসু রূক্ষং সলিলেষু চণ্ডম্।
সংগীতবীণা ইব তাড্যমানাস্তালানুসারেণ পতন্তি ধারাঃ।।

মৃচ্ছকটিকের পঞ্চম অঙ্কের নাম হচ্ছে দুর্দিন অঙ্ক। এই দুর্দিন অঙ্ক শ্লোকে ঠাসা। চারুদত্ত শ্লোক আওড়ান, বিটও তা-ই করেন, আর বসন্তসেনা প্রাকৃতভাষিণী হলেও এ ক্ষেত্রে প্রাকৃত ত্যাগ করে দেদার সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করেন। উল্লিখিত চতুর্থ শ্লোক তাঁরই মুখের। এটি ভাসের রচিত, না কোন অজ্ঞাতকুলশীল কবির? তার আগে যে-তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছি, সেগুলির বক্তা হচ্ছেন স্বয়ং চারুদত্ত। আর এ ক'টি যে ভাসের রচিত, এ আমার অনুমান। এ অনুমান যাঁর খুশি গ্রাহ্য করতে পারেন বা না পারেন। কিন্তু শেষটি যে ভাসের হাত থেকে বেরিয়েছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। পঞ্চম অঙ্কে বিটের উক্ত দু-একটি শ্লোক আমি ভাসের

রচনা বলে সন্দেহ করি। যাক এ সব কথা। এ অনধিকারচর্চা আর বেশি করব না।

'দরিদ্র চারুদত্ত'কে মৃচ্ছকটিকে রূপান্তরিত কে করেছে, তা ঠিক না বলতে পারলেও, কোন্ সময় করা হয়েছে তা বলতে পারি। মৃচ্ছকটিক দণ্ডীর দশকুমার-চরিতের সমসাময়িক বলে কোন-কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিতের বিশ্বাস। দণ্ডীর নাম সকলেই জানেন। তাঁর লিখিত দু'খানি গ্রন্থ আছে,— একখানি দশকুমারচরিত, অপরখানি কাব্যাদর্শ। এ দু'খানি গ্রন্থ যে এক ব্যক্তির লেখা, ডাক্তার সুশীলকুমার দে প্রভৃতি তা স্বীকার করেন না। আমিও তাঁদের সঙ্গে একমত। কাব্যদর্শ নামক অলঙ্কারের আদি গ্রন্থ অষ্টম খ্রিস্টাব্দের পূর্বে লেখা নয়। হর্ষচরিতের কবি বাণভট্ট ও বাসবদত্তার লেখক সুবন্ধু সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। বাণভট্ট হর্ষ-চরিতের প্রথমেই কতকগুলি পূর্বকবির নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু দণ্ডীর নাম উল্লেখ করেননি। সুতরাং দশকুমারচরিতের রচয়িতা দণ্ডী যে ঠিক কোন্ সময়ের লোক, তা বলা কঠিন: সম্ভবত বহু কাল পরের। 'দরিদ্র চারুদত্তে'র দ্বিতীয় অঙ্কে সংবাহক জুয়ো খেলে সুবর্ণ হেরে পালাচ্ছে; কিন্তু জুয়োর আড্ডার কোন বর্ণনা নেই। মৃচ্ছকটিকে তার দীর্ঘ বর্ণনা আছে। দশকুমারচরিতেও আছে। 'দরিদ্র চারু-দত্তে'র দ্বিতীয় অঙ্কে চারুদত্তের গৃহে ন্যস্ত বসন্তসেনার অলঙ্কার চুরির একটি বর্ণনা আছে। এ চোর হচ্ছে সজ্জলক, মৃচ্ছকটিকে যার নাম হয়েছে শর্বিলক। সজ্জলক সিঁদ কাটার পূর্বে প্রথমেই বলেছে— নমো খর্পটায়। মৃচ্ছকটিকের তৃতীয় অঙ্কে শর্বিলক চুরির আগে দোহাই দিয়েছে কর্ণীসুতের, যিনি চৌর্যশাস্ত্রের রচয়িতা। দশকুমারচরিতেও এই কর্ণীসুতেরই নাম পাওয়া যায়। তারপর সংবাহক যে পালিয়ে গিয়ে একটি জীর্ণ মন্দিরে দেবতা হয়ে বসে, এ গল্প হয়তো বা দশকুমারচরিতে পড়েছি, নয়তো কথাসরিৎসাগরে।

কথাসরিৎসাগর খ্রিস্টীয় ১১শ শতাব্দীতে লেখা। 'দরিদ্র চারুদত্তে'র চতুর্থ অঙ্কে বসন্তসেনার বাড়ির অর্থাৎ গণিকালয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে, মৃচ্ছকটিকে তার দীর্ঘ বর্ণনা আছে। এর অনুরূপ বর্ণনা পরবর্তী লেখকদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। মৃচ্ছকটিকের গায়ে এ সব বর্ণনা চোর-কবি যোজনা করেছেন। তিনি যদি দণ্ডী না হন, তা হলে তিনি দশকুমারচরিত ও কথাসরিৎসাগর থেকে এ অংশ চুরি করেছেন। আর এক কথা। শূদ্রক নামে একটি কবি ছিলেন, তাঁর রচিত দুটি ভাণ আমি চতুর্ভাণ নামক পুস্তকে পড়েছি। তিনি কর্ণীসুতের নাম করেছেন, এবং একজনকে পরোপকার-রসিক বলে বিদ্রূপ করেছেন। মৃচ্ছকটিকে ষষ্ঠ অঙ্কেও এই পরোপকার-রসিক বলে অপরকে বিদ্রূপ করবার পরিচয় আমরা পাই। এবং অষ্টম অঙ্কে সুবন্ধুর নাম পাই। এই সকল কারণে মনে হয় এই শূদ্রক হয়তো 'দরিদ্র চারুদত্ত'কে মৃচ্ছকটিকে পরিণত করেছেন। এ শূদ্রক ভারতবর্ষের অতি অধোগতির সময়কার কবি।

মৃচ্ছকটিকে সুবন্ধুর নাম পাওয়া যায়। আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলুম যে, পূর্ণ-ভদ্র সুরীর (১১৯৯ খ্রি.) পঞ্চতন্ত্রে কর্ণীসুতের উল্লেখ আছে। যথা : যতো রাজ্ঞঃ কর্ণীসুতকথানকে কথ্যমানে ইত্যাদি।

এই গল্পটি পড়লে বোঝা যায় যে খ্রি. দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির ছড়ার মতো কর্ণীসুতের কথানক (ছোটগল্প) রাজাদের ঘুম পাড়াত।

আমার এ নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধ লেখবার উদ্দেশ্য এই দেখানো যে, সমগ্র 'দরিদ্র চারুদত্ত'ই মৃচ্ছকটিকের অন্তরে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। এবং মৃচ্ছকটিক ৩৫০ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়নি। 'দরিদ্র চারুদত্ত' মৃচ্ছকটিকে রূপান্তরিত হয়েছে খুব সম্ভব খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর পরে। অর্থাৎ ভাসের ৬০০ বৎসর পরে। এই চোর কবি যিনিই হোন, তিনি নাট্যকার না হলেও পাঠ্য সংস্কৃত শ্লোক লিখতে পারতেন।

মৃ চ্ছ ক টি ক

আমি যখন এম.এ. পাশ করে বছর-দুয়েক বাড়িতে বেকার বসেছিলুম, তখন আমার সখ হল যে, সংস্কৃত কাব্যের কিছু চর্চা করব। সংস্কৃতের জ্ঞান আমার ছিল অতি সামান্য। সেই সামান্য জ্ঞান নিয়েই সংস্কৃত নাটক পড়তে আরম্ভ করি।

মৃচ্ছকটিক নাটক অন্যান্য সংস্কৃত নাটক থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং অপর কোন নাটকের সগোত্র নয়। অপর অনেক নাটকের ভিতর একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু মৃচ্ছকটিক সংস্কৃত কাব্যে একখানি প্রক্ষিপ্ত নাটক বলে মনে হয়। এর স্বাতন্ত্র্য এতই স্পষ্ট যে, প্রথম থেকেই য়ুরোপের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা এর বিষয় দেদার প্রবন্ধ লিখেছেন। এবং অনেকে গ্রিক নাটকের প্রভাবে এ নাটক লেখা হয়েছে— এই সিদ্ধান্ত করেছেন। আমি গ্রিক জানিনে। কিন্তু ইংরিজি তর্জমায় Aeschylus, Sophocles, Aristophanes, Euripides, এঁদের রচিত নাটক পড়েছি। তাঁদের নাটকের সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তবে শুনতে পাই গ্রিক ভাষায় খান-কতক কমেডি আছে, যার অনুকরণে মৃচ্ছকটিক লেখা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এবং য়ুরোপীয় পণ্ডিতরাই কেউ-কেউ আবার এ মত খণ্ডন করেছেন।

সে যা-ই হোক, মৃচ্ছকটিক যে দলভ্রষ্ট নাটক, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। আমি সেকালে জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের প্রকাশিত মৃচ্ছকটিক সংস্কৃততেই পড়ি। তাঁর প্রকাশিত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে অনেক ভ্রমপ্রমাদ আছে। তা হলেও এই নাটকখানি পড়ে আমি মুগ্ধ হই। সেকালে মৃচ্ছকটিকের কোন বাঙ্গলা অনুবাদ ছিল না। এর প্রথম অনুবাদ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি একসঙ্গে অনেকগুলি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেন, তার মধ্যে মৃচ্ছকটিক একটি। তাঁর অনূদিত মৃচ্ছকটিক প্রথম শ্রেণীর অনুবাদ নয়। তা হলেও আমি যত দূর জানি, সেখানি হচ্ছে বাঙ্গলা ভাষায় মৃচ্ছকটিকের একমাত্র অনুবাদ। তার বহু কাল পরে আমি আবিষ্কার করি যে, সংস্কৃত মৃচ্ছকটিকের আর একটি সংস্করণ আছে, যার সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গলা অনুবাদ দেওয়া আছে। কিন্তু সে অনুবাদ মোটেই ভালো নয়। তবে উপরে সংস্কৃত থাকায়, সে অনুবাদ ক্রমান্বয় যাচিয়ে নেওয়া যায়। এই সংস্করণ যিনি বার করেছেন, তিনি

সংস্কৃত ভাষায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হলেও বাঙ্গলা ভাষার উপর হয়তো তাঁর বিশেষ দখল নেই। আর এমনও হতে পারে যে, বাঙ্গলা ভাষাকে তিনি ঈষৎ অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন।

এখন আমি এই মৃচ্ছকটিকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব। তার থেকেই দেখতে পাবেন যে, এ নাটকের বস্তু কত দূর অভিনব। আপনারা অনুমান করে নিতে পারেন যে, কবির বলবার ভঙ্গি বিষয়োপযোগী।

সংস্কৃত নাটক মাত্রেই সূত্রধার কবির নামোল্লেখ করেন— একমাত্র ভাস নামক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নাট্যকার ব্যতীত। অধিকাংশ নাটকে নাম ছাড়া কবির আর কোন পরিচয় থাকে না। কিন্তু মৃচ্ছকটিকের কবির নাম শূদ্রক এবং তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির বিস্তৃত তালিকা প্রথমেই দেওয়া হয়েছে। তিনি নাকি ছিলেন ব্রাহ্মণ, রাজা ও ঋগ্বেদাদিতে পারদর্শী। তিনি আরও জানতেন গণিতশাস্ত্র, গণিকাশাস্ত্র, অস্থিশাস্ত্র। শূদ্রক নানা গুণালঙ্কৃত হয়েও একশ' দশ বৎসর বয়সে একটি যজ্ঞ করে আগুনে পুড়ে মরেন। এ কথা শুনলেই আমাদের একটু ধোঁকা লাগে। মনে হয় এ রকম রাজা কখনও ছিল না। এবং পণ্ডিতরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও শূদ্রক যে কোন্ সময়ে কোন্ দেশের রাজা ছিলেন, তা আবিষ্কার করতে পারেননি। তাঁদের মতে শূদ্রক হচ্ছেন একটি কিম্বদন্তির রাজা। বাস্তবিক এ রকম মহাপুরুষ কেউ ছিল না। সুতরাং মৃচ্ছকটিক কোন্ সময়ে কে লিখেছে, তা আজও অজ্ঞাত।

তারপরে এ নাটকে কী-কী বিষয় থাকবে, তার একটি ফর্দ প্রথমেই দেওয়া আছে। সে ফর্দটি এই : "উজ্জয়িনী নগরে চারুদত্ত নামে ব্রাহ্মণজাতীয় অথচ বাণিজ্যব্যবসায়ী এক দরিদ্র যুবক ছিলেন, এবং বসন্তকালের শোভার ন্যায় বসন্ত-সেনা নামে একটি বেশ্যা সেই চারুদত্তের গুণে অনুরক্ত হইয়াছিল।

"রাজা শূদ্রক সেই চারুদত্ত ও বসন্তসেনার নির্দোষ রমণোৎসব, নীতির প্রচার, ব্যবহারের (মোকর্দ্দমার) দোষ, খলের চরিত্র এবং দৈব— এই সমস্ত নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।"

আমি কোন বাঙ্গলা, ইংরিজি বা সংস্কৃত নাটকে এ রকম table of contents দেখিনি। এর থেকে মনে হয় মৃচ্ছকটিকের লেখকের সুমুখে আর একখানি নাটক ছিল, যার থেকে তিনি এই বিষয়ের ফর্দ সংগ্রহ করেছেন।

সে যা-ই হোক, এর থেকে বোঝা যায় যে অন্য সব সংস্কৃত নাটক থেকে এটি কত বিভিন্ন।

মৃচ্ছকটিকের নায়িকা বসন্তসেনা গণিকা— রাজকন্যা নন। চারুদত্ত প্রথমে ছিলেন অতি ধনী বণিক। শেষটা হয়ে পড়েন দরিদ্র। এই দরিদ্র অবস্থাতেই বসন্ত-সেনা তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন। এবং এ নাটকের সমস্ত ঘটনা হচ্ছে চারুদত্তের দারিদ্র্য অবলম্বন করে। ব্যবহারদুষ্টতার এক মিথ্যা মোকর্দমায় আদালতের বর্ণনা ও

বিচার একটি পুরো অঙ্কে দেখানো হয়েছে। একে ইংরিজিতে trial scene বলে। Merchant of Venice-এ এই রকম একটি দৃশ্য আছে। কিন্তু মৃচ্ছকটিকের trial scene-এর তুলনায় সেটি নগণ্য আর এক রকম ছেলেখেলা বললেই হয়। আমি যত বার মৃচ্ছকটিক পড়ি, তত বারই আমার মৃচ্ছকটিকের এই নবম অঙ্ক সম্বন্ধে একটি নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধ লেখবার লোভ হয়। কারণ এটি কোন আদালতের কোন স্বকপোলকল্পিত বর্ণনা নয়; সত্যের ছাপ এর সর্বাঙ্গে আছে। আমি যত দূর জানি, অপর কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এর অনুরূপ বর্ণনা নেই। তবে সে লোভ আমি বরাবরই সম্বরণ করে এসেছি।

তারপরে এ নাটকে একটি চুরির বর্ণনা আছে। শর্বিলক ব্রাহ্মণসন্তান, উপরন্তু শিক্ষিত। তিনি চুরি করবার সময় বলেছেন যে চুরির আমি নিন্দাও করছি, আবার কাজেও করছি। আসলে তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ কাজ করেছিলেন। তাঁর স্বগতোক্তি অতি চমৎকার, এবং প্রচ্ছন্ন হাস্যরসে পরিপূর্ণ। তিনি ছিলেন রাজবিদ্রোহীদের একজন নেতা। তিনি রাজা পালকের শিরশ্ছেদ করেন এবং চারুদত্তকে মশান থেকে উদ্ধার করেন।

রাজশ্যালক শকারের মোসাহেব বিট ছিলেন একটি অতিশিক্ষিত এবং অতিভদ্র লোক। তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক শকারকে এক জায়গায় বলেছেন পশুর নব অবতার। এবং এ পশুর দুষ্ট স্বভাব ও খলতার পরিচয় পেয়ে রাজবিদ্রোহীদের দলে গিয়ে যোগ দেন। বিট কাব্য এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এ নাটকের বিদূষকও ভাসের অবিমারক। নাটকের বিদূষকের অনুরূপ; অর্থাৎ ঘরে নর্মসচিব এবং যুদ্ধে অগ্রগণ্য যোদ্ধা। এই সব লোক কখনও চারিত্র্যভ্রষ্ট হয়নি। সুতরাং পূর্বে যে বলা হয়েছে এ নাটকে নীতির প্রচার করা হয়েছে, সে কথা সত্য। খলস্বভাব হচ্ছে শকারের স্বভাব।

আমি আগে বলেছি যে, মৃচ্ছকটিক নাটক কালিদাসের পূর্বে ছিল না; কারণ শূদ্রক বলে যুগপৎ রাজা ও কবি কোন কালে কেউ ছিল না। কালিদাস তাঁর প্রথম নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রে বলেছেন যে, তিনি ভাস, সৌমিল্ল ও কবিপুত্রদের মতো প্রথিতযশ নাট্যকার নন। সৌমিল্ল ও কবিপুত্রদের গ্রন্থ সব লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু ১৯১২ সালে ভাসের গ্রন্থসকল আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে দরিদ্র চারুদত্ত নামক একটি নাটকের মোটে চার অঙ্ক পাওয়া গেছে; বাকি ছয় অঙ্ক পাওয়া যায়নি। আমার বিশ্বাস, দরিদ্র চারুদত্ত আগাগোড়া ভাসের লেখা। এবং আর কোন চোরকবি সে খণ্ডিত অংশ কিঞ্চিৎ অদলবদল করে এবং তার নাম মৃচ্ছকটিক দিয়ে নিজের রচনা বলে চালিয়েছেন।

ভাসের তারিখ ৩০০ খ্রি.; কালিদাসের তারিখ তার শ'-খানেক বৎসর পর। Keith-এর মতে, ইতিমধ্যে দরিদ্র চারুদত্তের লুপ্ত ছ'-অঙ্ক কোন অজ্ঞাতকুলশীল

কবি লিখেছেন, এবং পুরা নাটকখানির নাম দিয়েছেন মৃচ্ছকটিক। আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারিনি।

আমার মতে, মৃচ্ছকটিকের বর্তমান রূপ কোন চোরকবি দিয়েছেন খুব সম্ভবত নবম শতাব্দীতে। Keith-এর অনুমান লাফিয়ে চলে। পাঁচ-ছয়শ' বৎসর তিনি এক লম্ফে উত্তীর্ণ হন।

সে যা-ই হোক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ হচ্ছে বাঙ্গলা ভাষায় মৃচ্ছকটিকের একমাত্র অনুবাদ। এ নাটকের লেখক কে, ও কোন্ সময়ে লেখা হয়েছে, সে বিষয় তিনি মাথা ঘামাননি, এবং তার কোন বিচারও করেননি। তিনি মৃচ্ছকটিক যে-আকারে পেয়েছেন, তারই অনুবাদ করেছেন।

ভাস একজন মহাকবি ছিলেন। এবং দরিদ্র চারুদত্ত কিঞ্চিৎ অদলবদল করলেও সেটি একটি উৎকৃষ্ট নাটক। অতএব তার বাঙ্গলা অনুবাদ আমি সকলকে পড়তে অনুরোধ করি। আমি পূর্বে একটি ইংরিজি প্রবন্ধে বাণপতি [গণপতি] শাস্ত্রীকে অনুরোধ করি যে তিনি সমগ্র 'দরিদ্র চারুদত্ত' অনুসন্ধান করে না বের করবার চেষ্টা করেন। আমার আশা আছে একদিন না একদিন সে মূল গ্রন্থ আবিষ্কৃত হবে।

রামমোহন রায় ও বাঙ্গলা গদ্য

রামমোহন রায় যে পাঁজির হিসেবে না হোক, সাহিত্যের হিসেবে বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম গদ্য লেখক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হয়তো মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' নামক গদ্যগ্রন্থ সর্বপ্রথমে লন্ডন নগরে ছাপা হয়েছিল। কিন্তু 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' সাহিত্যগ্রন্থ নয়, ইংরাজিতে যাকে বলে text book,— তাই। এ পুস্তক রচিত হয়েছিল দেশের লোকের জন্য নয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুবক 'সাহেব জাত'গণকে বাঙ্গলা ভাষায় কিঞ্চিৎ বিদ্যা-শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে।

মানুষে অবশ্য কথা চিরকাল গদ্যেই কয়, পদ্যে নয়। কিন্তু মৌখিক গদ্য ও লিখিত গদ্য এক পর্যায়ভুক্ত নয়। প্রাচীন সাহিত্য মাত্রেই পদ্যসাহিত্য, গ্রিসের 'ইলিয়াড' আগাগোড়া পদ্যে রচিত; আর এ দেশের বেদও প্রধানত ছন্দোবদ্ধ। তবে বেদজ্ঞরা বলেন যে, বেদের অন্তরেও এখানে-ওখানে টুকরো-টাকরা গদ্য আছে। সে যা-ই হোক, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায়, গদ্যতেও যে মানুষে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, আর গদ্যরচনাও যে সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে, এ সত্যের আবিষ্কার মানুষে পরে করে। বাঙ্গলার আদিম সাহিত্য পদ্যসাহিত্য। ইংরাজি আমলে এ দেশে গদ্যসাহিত্য জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে কোন হিসেবেই বাঙ্গলা গদ্যের জন্মদাতা বলে গণ্য করা যায় না। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় নেই। সুতরাং সংক্ষেপে উক্ত গ্রন্থের পরিচয় দেই। এই গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের ভাষা বাঙ্গলা নয়। ন্যায়, অলঙ্কার প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্রের বাঙ্গলা অনুবাদও নয়, paraphrase মাত্র। আর দ্বিতীয় ভাগের ভাষা খাঁটি বাঙ্গলা। কিন্তু এ দুটি পৃথক-পৃথক ভাষার অপর কেউ অনুসরণও করেননি, অনুকরণও করেননি। ফলে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' একখানি literary curiosity মাত্র হয়ে রয়েছে।

অপর পক্ষে সেকালে বাঙ্গলা ভাষায় গদ্য লেখবার কৌশল যে বাঙ্গালিরা আবিষ্কার করেনি, সে বিষয়ে রামমোহন রায় সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই তিনি প্রথমেই কী পদ্ধতি অনুসারে বাঙ্গলায় বাক্য গঠন করতে হয়, তার নিয়মাবলির প্রতিষ্ঠা করেছেন। সংস্কৃতের অনুকরণে যে বাঙ্গলা গদ্য লেখা অসম্ভব, সে জ্ঞান

তাঁর ছিল। আর তাঁর লেখা বাঙ্গলা ব্যাকরণে তিনি স্পষ্ট করে লিখে গিয়েছেন যে, এক ভাষার ব্যাকরণ অপর ভাষার উপর আরোপ করা যায় না, কারণ প্রতি ভাষার গঠন (structure) বিভিন্ন এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাষাকে শাসন করা নয়, ভাষার structure-এর সন্ধান নেওয়া। বাঙ্গলা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা, ও তার বাক্যগঠন প্রণালীও যে বিভিন্ন, এ বিষয়ে তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সন্ধি-সমাস যে বাঙ্গলার ধাতে সয় না, এ সত্য তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। ফলে তাঁর লেখা সম্পূর্ণ সমাসমুক্ত। সংস্কৃত ব্যাকরণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার ফল যে বাঙ্গলা ভাষাকে মুক্তি দেওয়া, অর্থাৎ আত্মবশ করা, রামমোহন রায় প্রদর্শিত এই সহজ সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে আমাদের প্রায় এক শতাব্দী লেগেছে।

ইতিমধ্যে আমরা বাঙ্গলা গদ্য নিয়ে নানা রূপ experiment করেছি। সংস্কৃত ভাষার প্রতি আমাদের যে-মোহ আছে, রামমোহন রায়ের তা ছিল না, কারণ তিনি ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আমরা তা নই। রামমোহন রায় বাঙ্গলা ভাষায় শুধু প্রথম গদ্যলেখক নন, গদ্য রচনার প্রকরণ-পদ্ধতি, বিধি-নিষেধও তিনি লিপি-বদ্ধ করেছেন। এমনকী, কোন্ শব্দ কী রূপে বানান করতে হবে, সে বিষয়েও স্বজাতিকে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। রামমোহন ছিলেন মুক্তির বাণীর প্রচারক এবং তিনি স্বভাষা সম্বন্ধেও মুক্তিকামী ছিলেন।

রামমোহন রায় সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরাজি ও বাঙ্গলা প্রভৃতি নানা ভাষায় নানা বিষয়ে তাঁর মতামত প্রচার করেছেন। ফলে তিনি কোন ভাষাতেই text book রচনা করেননি, রসসাহিত্যও রচনা করেননি। তাঁর সকল লেখার উদ্দেশ্য ছিল স্ব-সমাজকে কতকগুলি কর্মে প্রবৃত্ত করা, অথবা নিবৃত্ত করা। তাঁর সকল বক্তব্যই কর্মসাপেক্ষ ছিল। এ স্থলে কর্ম শব্দ তার ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। গদ্যসাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের কর্মজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা, উন্নত করা। এ বিষয়ে তিনি যে-উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তা যথার্থই অপূর্ব।

এখন তাঁব বাঙ্গলা রচনার ঈষৎ পরিচয় দিই। তাঁর গদ্য প্রবন্ধগুলি দু'-ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমত, তিনি বেদান্ত শাস্ত্রের সঙ্গে স্ব-সমাজের পরিচয় করিয়ে দেন। হিন্দু সমাজ বহু কালাবধি উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্ত দর্শনকে মোক্ষ শাস্ত্রের প্রস্থানত্রয় স্বরূপে গণ্য করে আসছেন। আজকের দিনে শিক্ষিত সমাজ উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্ত দর্শনের মহা ভক্ত হয়ে উঠেছেন। রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম এ তিন শাস্ত্রের সঙ্গে বাঙ্গালি জাতির পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি দুই-একটি উপনিষদের বাঙ্গলায় অনুবাদ করেন। নানা প্রবন্ধে তিনি গীতার বচন উদ্ধৃত করেছেন, আর তিনি যে আচার্যের শিষ্য— অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের শিষ্য— এ কথা নিজ-মুখেই স্বীকার করেছেন। এ সব গ্রন্থের সঙ্গে বাঙ্গলার পণ্ডিত সমাজের যে

বিশেষ পরিচয় ছিল না, তার প্রমাণ এই যে, তাঁর সমসাময়িক অনেক পণ্ডিত সন্দেহ করেছিলেন যে, উপনিষদ্ শাস্ত্র তাঁর স্বকপোলকল্পিত।

রামমোহন রায়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখা হচ্ছে— ইংরাজিতে যাকে বলে controversy। হিন্দু ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে তিনি নিজের মত ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত থাকেননি। নিজের মত সমর্থন করবার এবং বিপক্ষের মত খণ্ডন করবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্ক করতে সদাই প্রস্তুত ছিলেন।

এ জাতীয় লেখায় শুধু তাঁর বিদ্যা নয়— তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিরও পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তর্কক্ষেত্রে বিদ্রূপ করবার ক্ষমতাও তাঁর অসামান্য। শাস্ত্রাভ্যাসাৎ তিনি জড়বুদ্ধি হয়ে যাননি। অথচ তর্কক্ষেত্রে তিনি ভদ্রতার সীমা কখনও অতিক্রম করেননি। এই সব লেখাতেই তাঁর প্রতিভার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা রচনার সঙ্গে আমাদের সমাজের যে পরিচয় নেই, তার একটি কারণ তাঁর রচিত সাহিত্যের কোন selection প্রকাশিত হয়নি; এমনকী স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য যে-সব selection করা হয়, তাতেও রামমোহন রায়ের লেখার কোন নমুনা নেই। যদি থাকত তো সকলে দেখতে পেতেন, তাঁর ভাষা কটমটে নয়, আর তাঁর গদ্য ইংরাজির অনুকরণ নয়, সংস্কৃতেরও নয়, কিন্তু খাঁটি বাঙ্গলা। রামমোহন রায় মুখ্যত সংস্কৃতনবিশ হলেও, পূর্বযুগের বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি নানা স্থানে 'চৈতন্য চরিতামৃতে'র উল্লেখ করেছেন, অবশ্য ভক্তিভরে নয়, কারণ কোন বাঙ্গলা গ্রন্থকে শাস্ত্র হিসেবে গণ্য করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। 'অন্নদামঙ্গল' থেকেও তিনি দু'-চার শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

তাঁর লেখায় কিন্তু একটি দোষ আছে। তাঁর গদ্যরচনা তিনি ইংরাজি দস্তুর-মতো punctuate করেননি। কিন্তু আমরা যদি তা punctuate করে ছাপাই, তা হলেই সে লেখা আমাদের কাছেও অতি প্রাঞ্জল হয়ে উঠবে। ভাষা সম্বন্ধেও আমরা তাঁর কাছে চিরঋণী।

উর্দু বনাম বাঙ্গলা

'বুলবুল'-এ উর্দু বনাম বাঙ্গলার যে-তর্ক উত্থাপন করা হয়েছে— সে বিষয়ে দুটি কথা বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারছিনে, যদিচ আমি জানি যে এ বিষয়ে কথা কওয়া আমার পক্ষে এক হিসেবে অনধিকার চর্চা করা হবে।

উর্দু আমি জানিনে। অর্থাৎ ও-ভাষা আমি লিখতেও পারিনে, পড়তেও পারিনে। অবশ্য পরের মুখে শুনলে ও-ভাষা আমি মোটামুটি বুঝতে পারি, আর কাজ চালানো গোছ হিন্দুস্থানি বলতেও পারি। আমাদের মুখের হিন্দুস্থানি শব্দের উচ্চারণও বিকৃত, আর ব্যাকরণ নিতান্ত অশুদ্ধ;— অর্থাৎ সেই জাতের টুটি-ফুটি উর্দু, যা শুনলে বিশেষজ্ঞরা হাসি সম্বরণ করতে পারেন না। এক কথায় উর্দু ভাষা আমাদের শ্রেণীর হিন্দুদের কাছে তামিলও নয়, তেলুগুও নয়। অর্থাৎ আমাদের কাছে হিন্দুস্থানি সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। এমনকী অনেকের হয়তো বিশ্বাস যে, বাঙ্গলা ভাষাকে একটু বেঁকিয়ে বললেই তা হিন্দুস্থানি হয়। অবশ্য এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুল। বাঁকাচোরা ইটালিয়ান যেমন ফ্রেঞ্চ নয়, বাঁকাচোরা বাঙ্গলা তেমনি হিন্দিও নয়, উর্দুও নয়। কিন্তু এ ভুল লোকে করে এই কারণে যে, এ দুই ভাষার সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষার অনেকটা মিল আছে।

এক সময়ে যখন হিন্দিকে ভারতবর্ষের lingua franca করবার প্রস্তাব হয়েছিল, তখন আমি সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করি। একই কারণে উর্দুকে উত্তরাপথের lingua franca করবার প্রস্তাব আমি প্রসন্ন মনে অনুমোদন করতে পারিনে। বাঙ্গালি হিন্দুর ছেলেরা যদি বাঙ্গলার সঙ্গে-সঙ্গে হিন্দি লিখতে-পড়তে শেখে, ও মুসলমান ছেলেরা উর্দু, তা হলে খুব ভালো হয়। ছেলেদের এ রকম ভাষাশিক্ষা তেমন কঠিন নয়। তবে ইংরাজি শিখতেই যখন তাদের প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হয়, তখন এ প্রস্তাব করতে আমার সাহস হয় না।

২

মুসলমান সম্প্রদায়ের জন-কতক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে কী কারণে এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, তার কারণ বুলবুল-এ প্রকাশ করা হয়েছে। সে বিষয়ে আমার কিছু

বলবার অধিকার নেই। কারণ উক্ত সম্প্রদায়ের প্রকৃত মনোভাব সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ। হিন্দুস্থানিকে বাঙ্গলার ঘাড়ে চাপানোর নিষ্ফল চেষ্টায় শুধু ভাষাবিভ্রাট ঘটবে। এখানে এই কথাটি আমি বলতে চাই যে, বাঙ্গলা ভাষা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ বাঙ্গালির ভাষা। আমি অসংখ্য মুসলমানের সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু সাধারণ হিন্দুর সঙ্গে তাঁদের মুখের ভাষার যে কোন প্রভেদ আছে, তা তো আমি বুঝতে পারিনে। অবশ্য মুসলমানেরা কতকগুলি কথা ব্যবহার করেন, যা হিন্দুরা করে না। যথা শানকি, বদনা, পানি প্রভৃতি। এ সবই বস্তুর নাম। বদনা, শানকি কোন্ দেশীয় কথা আমি জানিনে, কিন্তু 'পানি' যে সংস্কৃত 'পানীয়' কথার অপভ্রংশ, তা সকলেই জানেন; আর বাঙ্গলার বাইরে উত্তরাপথে, হিন্দু-মুসলমান সকলেই 'পানি' শব্দ ব্যবহার করেন। বাঙ্গলায় কেন জল চলল, তা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা বলতে পারেন।

অবশ্য ধর্মকর্ম পূজাপাঠ সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমানরা পৃথক-পৃথক শব্দ ব্যবহার করেন এবং হিন্দু ধর্মের কথা অধিকাংশ সংস্কৃত, আর মুসলমান ধর্মের কথা বোধ হয় অধিকাংশ আরবি। বলা বাহুল্য, এ সব কথা সংখ্যায় অতি স্বল্প এবং তাদের স্পর্শে বাঙ্গলা ভাষা দুটি বিভিন্ন ভাষা হয়ে যায়নি।

একটু লক্ষ করলেই দেখা যায় যে, এ যুগে অনেক ইংরাজি শব্দ, বিশেষত বস্তুর নাম, বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে, এমনকী তারা সাহিত্যেও প্রমোশন পেয়েছে। আমরা, যারা ইংরাজি-ছুট বাঙ্গলা লিখতে চেষ্টা করি, আমরাও তা করতে কৃতকার্য হইনে। একটি মাত্র উদাহরণ দেই। আর্ট শব্দটার এখন সাহিত্যে চল হয়ে গিয়েছে, কারণ বাঙ্গলায় আর্ট নেই। পদার্থের নাম অর্থাৎ বিশেষ্য কোন ভাষারই প্রাণ নয়, এবং এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় তাদের গতিবিধি অবাধ।

৩

বাঙ্গলা ভাষা শুধু আমাদের মতো শিক্ষিত লোকের ভাষা নয়, দেশশুদ্ধ নিরক্ষর লোকের মুখের ভাষা। সুতরাং সম্প্রদায়-বিশেষের কাছে উর্দু যে বাঙ্গলার স্থান অধিকার করবে, এ আশা করা বৃথা। কোন দেশের অতীতকে মুখের কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর অতীতই দেশভাষা গড়েছে।

এ হেন প্রস্তাব যাঁরা করেন, তাঁদের মনোভাবই ঠিক বোঝা যায় না। প্রথমত উর্দু একটি classical language নয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মের ভাষা আরবি ও সাহিত্যের ভাষা ফারসি; এ উভয় ভাষার উপর মুসলমান সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা থাকা স্বাভাবিক— যেমন গ্রিক-ল্যাটিনের উপর য়ুরোপীয়দের শ্রদ্ধা আছে এবং সংস্কৃত ভাষার উপর হিন্দুদের শ্রদ্ধা আছে।

কিন্তু উর্দু তো ও-শ্রেণীর ভাষা নয়। প্রথমত এ ভাষা অতি প্রাচীন নয়, কেবল

মাত্র পুঁথিগত ভাষাও নয়; কিন্তু বাঙ্গলারই মতো একটি প্রাদেশিক প্রচলিত মৌখিক ভাষা।

উর্দু ভাষা কে সৃষ্টি করেছেন, তা জানিনে। আমির খসরু যে করেননি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমির খসরু ছিলেন কবি; সুতরাং তিনি হিন্দি ও ফারসি পাশাপাশি বসিয়ে গুটি-কতক পদাবলি রচনা করেছিলেন, experiment হিসেবে, কিন্তু সে experimental ভাষা উর্দু নয়।

সত্য কথা এই : উর্দু কোন ব্যক্তিবিশেষ সৃষ্টি করেননি। আপনা হতেই ও-ভাষা লোকমুখেই জন্মলাভ করেছে। উর্দু মূলত ব্রজভাষা— অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের লোকভাষা, এবং তার অন্তরে দেদার আরবি ও ফারসি শব্দ ঢুকে গিয়েছে।

বাঙ্গলা ভাষার অন্তরেও এ রূপ শব্দ কম নেই। আইন-আদালত জমি-জমা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই তো ফারসি। উপরন্তু আরও অনেক কথা আছে যা আমরা নিত্য ব্যবহার করি। কিন্তু সে কারণে বাঙ্গলার ধাত বদলায়নি— বরং তার কান্তি পুষ্ট হয়েছে। ইংরাজি ভাষার তুল্য মিশ্র ভাষা য়ুরোপে আর দ্বিতীয় নেই। আর ভারতবর্ষের উত্তরাপথের সব ভাষাই অল্পবিস্তর মিশ্র। সুতরাং অপর ভাষা থেকে শব্দরাশি আহরণ করলে কোন ভাষারই জাত যায় না।

৪

আমি পূর্বে বলেছি যে, ব্রজভাষার বুনিয়াদের উপরেই উর্দু ভাষা গড়ে উঠেছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে, শৌরসেনী প্রাকৃতই কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে এখন পশ্চিম হিন্দুস্থানে হিন্দি ও উর্দু, এই দুই আকারে প্রচলিত। এ দুই ভাষাই সগোত্র। আর আমরা বাঙ্গলার লোক এ দু'-ভাষাকেই নির্বিচারে হিন্দুস্থানি বলি।

এ দু'য়ের ভিতর স্পষ্ট প্রভেদ লেখার। হিন্দি লিপি বাঁ থেকে ডাইনে চলে, আর উর্দু লিপি ডাইনে থেকে বাঁয়ে চলে, আর এ উভয়ের অক্ষরও বিভিন্ন। কিন্তু এ প্রভেদ নিরক্ষর লোকের কাছে নেই। আছে শুধু লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের কাছে।

এই কারণে খুব সম্ভবত সাহিত্যিক হিন্দির সঙ্গে সাহিত্যিক উর্দু পৃথক হয়ে গিয়েছে। এ কালে এমন শুদ্ধিবাতিকগ্রস্ত হিন্দি লেখক আছেন, যাঁরা যথাসাধ্য ফারসি কথা বর্জন করে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন। হিন্দির এখন সাধু ভাষা হবার দিকে ঝোঁক আছে এবং সম্ভবত এমন উর্দু লেখকও আছেন, যাঁরা যথাসাধ্য সংস্কৃত শব্দ বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু এ সব কৃত্রিম ভাষার পরমায়ু অল্প। বাঙ্গলায় আমরা 'সাধু ভাষা'র মায়া কাটিয়েছি। এর থেকে অনুমান করছি যে, হিন্দুস্থানিরা ক্রমে সে মোহ কাটিয়ে উঠবে। অর্থাৎ সে প্রদেশেরও সাহিত্যিক ভাষা মৌখিক ভাষার অনুসরণ করবে।

সে যা-ই হোক, বাঙ্গালির মুখের ভাষা যে হিন্দুস্থানি হবে না, এ কথা জোর

করে বলা যায়। বাঙ্গলা ভাষা এখন শুধু মৌখিক ভাষা নয়, বাঙ্গলার সাহিত্যিক ভাষাও হয়ে উঠেছে। আর বর্তমান বাঙ্গলার সাহিত্য গড়ে তুলছেন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই, আর উভয়েরই দেখতে পাই, সাহিত্যিক ভাষা একই। বাঙ্গলা সাহিত্যের যে দিন-দিন শ্রীবৃদ্ধি হবে, তার লক্ষণ চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে। সুতরাং 'হিন্দি বনাম বাঙ্গলা' ও 'উর্দু বনাম বাঙ্গলা'র মামলায় বাঙ্গলারই যে স্বত্ব সাব্যস্ত হবে, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নেই।

বাঙ্গলা ভাষায় আরবি ফারসি শব্দ

নবপর্যায় 'বুলবুল' পেয়ে ও পড়ে খুব খুশি হলুম। খুশি হবার প্রথম কারণ, এ দেশে নূতন পত্রিকা প্রায়ই পুরনো হয় না। আমাদের দেশে কাগজপত্র টেকসই হয় না। এর নানা কারণ অবশ্য আছে। তার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, মাসিক পত্রিকার পাঠক অনেকে থাকতে পারে, কিন্তু গ্রাহক অত্যন্ত কম। হিন্দু শাস্ত্রে বলে যে, দাতা ও গ্রহীতা একমন না হলে দান সিদ্ধ হয় না। আমরা সাহিত্যিকরা আমাদের মুখের ও মনের অনেক কথা দান করতে সদাই প্রস্তুত— কিন্তু সে দানের উপযুক্ত গ্রহীতা নেই। সাহিত্যই বলুন, শিক্ষাই বলুন, ধর্মই বলুন, কর্মই বলুন, সব মানব-প্রচেষ্টারই একটা economic basis থাকা চাই; শূন্যের উপর এর কোনটিই প্রতিষ্ঠা করে চলে না। অথচ আমাদের দেশে, বিশেষত এই ইকনমিক দুর্দশার দিনে, আমরা শিক্ষা-বাতিকগ্রস্তই হই আর সাহিত্য-বাতিকগ্রস্তই হই, আমরা শিক্ষা কিংবা সাহিত্যের প্রচার করতে বসলেই দেখতে পাই যে, এ দু'য়ের কোনটিরই পাকা ইকনমিক ভিত্তি নেই। এ বিষয়ে বেশি কিছু বলা বৃথা, কেননা এ সত্যটি obvious, আর যা obvious অর্থাৎ স্পষ্ট সত্য, তা নিয়ে মানুষের বাক্-বিতণ্ডার আর অন্ত নেই। এমনকী, যাঁরা পরের কথা অনুবাদ করেন, তাঁরাই বেশি করে প্রতিবাদ করেন। যে-বিষয়ে কোন সমস্যা নেই, সেখানেই সমস্যা গুরুতর হয়ে ওঠে। একটা উদাহরণ দিই।

'বুলবুল' সম্পাদক জানতে চেয়েছেন যে বাঙ্গলা ভাষায় ফারসি ও আরবি শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে আমার মত কী?

আমার মত এই যে, ফারসি ও আরবি শব্দ ছেঁটে দিলে বাঙ্গলা ভাষা বলে কোন একটা ভাষাই থাকে না। এই দেখুন না কেন, বাঙ্গলায় জমা-জমির প্রতি কথাটি ফারসি; সুতরাং সে সব কথা বাঙ্গলা ভাষা থেকে বহিষ্কৃত করলে আমাদের মুখের কথাও বন্ধ হয়, লেখাও বন্ধ হয়। যদি এমন কোন কাণ্ডজ্ঞানরহিত হিন্দু সাহিত্যিক থাকেন, যিনি ফারসির পরিবর্তে তার সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে চান, তা হলে তাঁকে বলি সংস্কৃত ভাষায় সে জাতীয় প্রতিশব্দ নেই। বহু কাল পূর্বে আমার জনৈক মারহাট্টি বন্ধু আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি দু'-চারটি ছাড়া

জমা-সেরেস্তা ও শুমার-সেরেস্তায় নিত্য ব্যবহৃত শব্দগুলির সংস্কৃত প্রতিশব্দ বেদে-পুরাণে খুঁজে পাননি।

আইন-আদালতের কথাগুলি প্রায় সব ফারসি কথা। অবশ্য আজকাল আইন-আদালতের অনেক ইংরাজি কথাও আমাদের ভাষায় ঢুকেছে। আর ফারসির সঙ্গে তাদের সমাস হয়ে যাচ্ছে, যেমন— 'ডিক্রি-জারি'। সুতরাং এ স্থলে কোন সমস্যাই নেই। অতএব সমস্যা তুললে শুধু গোলযোগের সৃষ্টি হবে।

বাঙ্গলার প্রত্যেকের ও প্রত্যহের নিত্য ব্যবহৃত অনেক কথার কুল-শীলের খবর য়ুরোপে খুঁজতে হয়। দেদার পর্তুগিজ শব্দ বাঙ্গলা ভাষা আত্মসাৎ করেছে। ফরাসি শব্দ ও ওলন্দাজ শব্দও অনেক আমাদের ভাষায় আছে, অবশ্য গা-ঢাকা দিয়ে।

আমাদের শাস্ত্রে বলে যে, উত্তর ভারতবর্ষের সব প্রচলিত ভাষায় তিন জাতীয় শব্দ আছে,— যথা তৎসম, তদ্ভব ও দেশি। কিন্তু সত্য কথা এই যে, বাঙ্গলা ভাষায় অন্তত লেখায় অনেক তৎসম কথা আছে, আর আছে তার চাইতে ঢের বেশি তদ্ভব শব্দ; কিন্তু দেশি শব্দ খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। উপরন্তু আছে অসংখ্য বিদেশি শব্দ, যথা ফারসি, আরবি, পর্তুগিজ, ফরাসি ও ইংরাজি শব্দ। বাঙ্গলা ভাষার বর্তমান ঐশ্বর্যও এই কারণেই। সুতরাং শুদ্ধিবাতিকগ্রস্ত লেখকেরা যখন এই বিদেশি শব্দগুলিকে অস্পৃশ্য করতে চান, তখন তাঁরা বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গহানি করতে চান; এ কাঁটা তাঁরা বাছতে পারবেন না।

তবে একটি কথা এ স্থলে বলা আবশ্যক; নূতন করে ফারসি ও আরবি শব্দ আমাদের ভাষায় আমদানি করবার কোন প্রয়োজনও নেই, অবসরও নেই। নূতন-নূতন যে-সব শব্দ বাঙ্গলায় ঢুকবে সে সবই ইংরাজি শব্দ।

এখন আর একটি কথা বলেই এ পত্র শেষ করি। এক দল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, যাঁরা বাঙ্গলাকে প্রায় সংস্কৃত করে তোলবার প্রস্তাব করতেন। যদি তাঁদের অনুরূপ কোন সম্প্রদায় মুসলমান সমাজেও থাকে, তা হলে বীরবলের একটি পুরনো কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিই। বীরবল বলেছিলেন— "এ দোটানায় পড়ে বেচারা বঙ্গ-সরস্বতী কাশী যাই কি মক্কা যাই স্থির করতে না পেরে চলৎশক্তি-রহিত হবেন।"

সংক্ষিপ্ত বাঙ্গলা ব্যাকরণ

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে বড়দিনের সময় ভবানীপুর পোড়াবাজারে কংগ্রেসের যে-অধিবেশন হয়, সে কংগ্রেসে বাঙ্গালি কংগ্রেস-ওয়ালাদের সঙ্গে অবাঙ্গালি কংগ্রেস-ওয়ালাদের মতভেদের সৃষ্টি হয়। বাঙ্গালিদের প্রস্তাবিত কতকগুলি resolution অপর প্রদেশের হুমরো-চুমরো পলিটিসিয়ানরা গ্রাহ্য করতে নারাজ হন। ফলে দু'-দলে মহা তর্ক বেধে যায়। প্রকাশ্যে কংগ্রেসে এ তর্কের মীমাংসা করা অসম্ভব বিবেচনায় উভয় পক্ষের মন্ত্রীর দল পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে কংগ্রেসের অন্দর-মহলে প্রবেশ করলেন। খানিক ক্ষণ পর আমি তাঁদের মন্ত্রণা-মন্দিরে উপস্থিত হয়ে দেখি, আমার অগ্রজ আশুতোষ চৌধুরী, মদনমোহন মালবিয়া ও বালগঙ্গাধর তিলক, এই তিন জনে মিলে অনর্গল তর্ক করছেন। আর তাঁদের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি আমাকে ডেকে বললেন— ওদের তিন জনের তর্ক শোনো। এঁরা তর্ক করছেন grammar নিয়ে, কারণ এঁরা তিন জনেই ব্রাহ্মণ, আর ব্যাকরণের আলোচনা করাই এ জাতের চিরকেলে অভ্যাস। অবশ্য দত্ত মহাশয় এ মন্তব্য হাসিমুখেই করেছিলেন, সুতরাং তাঁর কথা শুনে আমিও ঈষৎ হাস্য করলুম।

২

সংস্কৃত ভাষায় যে অসংখ্য অপূর্ব ব্যাকরণ আছে, তা আমরা সকলেই জানি,— অন্তত মহা-মহা বৈয়াকরণদের নাম জানি। পাণিনি, পতঞ্জলির নাম কে না জানে? আর ব্যাকরণ রচনা শুরু হয়েছে বহু কাল পূর্বে। পাণিনি নাকি খ্রি.পূ. চতুর্থ শতকের লোক, আর পতঞ্জলির বয়সও বড় কম নয়। ফলে হাজার-আড়াই বৎসর ধরে আমরা ব্যাকরণের চর্চা করছি।

৩

বৈয়াকরণদের পূর্বপুরুষরা কি সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন?— বোধ হয় না; কেন-না জৈন বৈয়াকরণও ছিল, বৌদ্ধ বৈয়াকরণও ছিল। তা ছাড়া গোণিকাপুত্র ও

গোলর্দ্দীয় নামক সে শাস্ত্রের দুটি পূর্বাচার্য কি ব্রাহ্মণ ছিলেন? গোলর্দ্দ অবশ্য দেশের নাম। কিন্তু গোণিকা হচ্ছে সেই স্ত্রীলোক, যে ছালা বোনে। মা ছালা বুনছে, আর ছেলে ব্যাকরণের সূত্র বানাচ্ছে— এ ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত লাগে। তা ছাড়া এঁরা উভয়েই ছিলেন কামশাস্ত্রে স্বনামধন্য পূর্বাচার্য। ব্যাকরণের সূত্রের সঙ্গে কামসূত্রের যোগসূত্র কী?

৪

পাণিনির ব্যাকরণ সূত্রাত্মক মাত্র, অতএব সংক্ষিপ্ত। সূত্রকাররা দীর্ঘসূত্রতা-দোষে দুষ্ট নন। পতঞ্জলির ভাষ্য যে বিরাট, তার প্রমাণ তার নাম মহাভাষ্য। অবশ্য পতঞ্জলি বলেছেন, যার নাম সূত্র তার নামই ব্যাকরণ। তবে তার ব্যাখ্যা বিস্তৃত হয়। বোধ হয় এই বচন অনুসারে— 'ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে, সমাসব্যাস ভাষণং।'

৫

ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন কী, এ প্রশ্ন সেকালের লোকও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার উত্তরে পতঞ্জলি বলেছেন— বেদরক্ষা অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্ররক্ষা। পাণিনি অবশ্য বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ লেখেননি; লিখেছিলেন ভাষা ব্যাকরণ। সুতরাং সে ব্যাকরণ কী করে বেদরক্ষা করবে?— আমার বিশ্বাস, বৈদিক ভাষা যখন লোকের মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়ে চোখের বিষয় হয়েছে অর্থাৎ যখন বৈদিক ভাষা লিখিত ভাষা হয়েছে, ও মৌখিক ভাষাই 'ভাষা' হয়েছে, সেই সময়েই মৌখিক ভাষাকে বিধিবদ্ধ করবার জন্য তিনি ব্যাকরণ রচনা করেন।

৬

এই কারণেই উচ্চারণতত্ত্ব হচ্ছে ব্যাকরণের মূল তত্ত্ব। পতঞ্জলি বলেছেন যে, অসুররা যে সুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে হেরে গিয়েছিল, তার কারণ তারা 'অরয় অরয়' না বলে 'অলয় অলয়' বলে শত্রুদের সম্বোধন করেছিল। 'র'র স্থানে আজও অনেকে 'ল' বলে। জুতোর দাম জিজ্ঞাসা করলে চীনেরা three rupees না বলে অনেকে 'থ্রিলি লুপি' বলে। অপর পক্ষে জাপানিরা 'ল'কে 'র' বলে। সম্ভবত এই কারণে জাপানিরা যুদ্ধে চীনেদের হারাচ্ছে। আমরা যদি 'র' স্থানে 'ল' বলি, তা হলে 'রাজ' পাব না— শুধু 'লাজ'ই পাব।

৭

এ উত্তরে সেকালের সামাজিক লোক সন্তুষ্ট হননি; তাঁরা বলেছিলেন যে, ভাষা ব্যবহার করতে-করতে আমরা ভাষা শিখব— ব্যাকরণের কী প্রয়োজন? উত্তরে

পতঞ্জলি বলেন, তোমাদের কথা ঠিক। তোমাদের ভাষা যাতে অশুদ্ধ না হয়, তার জন্য ভাষা প্রয়োগের নিয়ম শেখা কর্তব্য। আমরা ক্ষিধে পেলে খাই, কিন্তু কুকুরের মাংস খাইনে; কেননা ধর্মশাস্ত্রে তার নিষেধ আছে। সেই রূপ শব্দের কোন্‌টি শুদ্ধ কোন্‌টি অশুদ্ধ, তা জানতে হলেও ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

৮

ছেলেবেলায় লোহারাম শিরোরত্নের শিশুবোধ ব্যাকরণে পড়েছি :

'যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, বঙ্গভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে ও কহিতে পারা যায়— সেই শাস্ত্রের নাম ব্যাকরণ।' এ কথা পতঞ্জলির কথার পুনরুক্তি মাত্র। এই সব শিশুবোধ ব্যাকরণই সাধু ভাষার পৃষ্ঠপোষক। এই definition যদি ঠিক হয়, তা হলে ভাষা সম্বন্ধে শুদ্ধিবাতিকগ্রস্ত লোকদের শুদ্ধ ভাষার জাত বাঁচাবার জন্য ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন আছে— এ কথা অবশ্যস্বীকার্য।

৯

আমরা যে-অর্থে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ শব্দ বুঝি, পতঞ্জলি অবশ্য সে অর্থে ব্যবহার করেননি। পাণিনি লিখেছিলেন ভাষার ব্যাকরণ। পতঞ্জলি তার ব্যাখ্যা করেছেন। এ ভাষা কোন্ ভাষা। বৈদিক নয়— লৌকিক ভাষা; যে-ভাষাকে হনুমান বলেছেন সংস্কৃত। রামায়ণেই বোধ হয় সংস্কৃত শব্দ সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। সে যা-ই হোক, এ বিষয়ে আমি বাচালতা করতে প্রস্তুত নই। আমি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নই, মহাভাষ্যের শুধু এখানে-ওখানে পল্লবগ্রহণ করেছি, বাঙ্গলা অনুবাদের সাহায্যে।

১০

কোন বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেছেন বলে আমি জানিনে; সুতরাং আমরা মুখ খুললেই যে তার ভিতর থেকে সূত্র বেরোয়, দত্ত মহাশয়ের এ মত আমি গ্রাহ্য করতে পারিনে।

একখানি মাত্র সংস্কৃত ব্যাকরণ বাঙ্গলায় আছে, যেটি বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের লেখা। অনন্তপার শব্দ-শাস্ত্র মন্থন করে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি অমূল্য রত্ন উদ্ধার করেছেন— সে রত্নের নাম 'উপক্রমণিকা'। এটি হচ্ছে ব্যাকরণশাস্ত্রের শিরোমণি। এর জুড়ি বই ভারতবর্ষের অপর কোন ভাষাতেই নেই। আমি একমাত্র উপক্রমণিকার উল্লেখ করলুম, কারণ সেটি হচ্ছে ব্যাকরণ শাস্ত্রের বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ; আর ব্যাকরণকৌমুদী হচ্ছে দ্বিতীয় ভাগ।

১১

আমাদের ״״তর একটি বদনাম আছে। আমরা বাঙ্গালিরা নাকি বেশি কথা কই, আমরা dumb millions নই। হতে পারে ভারতবর্ষের অপর জাতিরা সব কাজের লোক— শুধু আমরা বাক্যবাগীশ। আমরা কথা কই বেশি বলে অবশ্য লিখিও বেশি। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষেরা কখনও বাঙ্গলা ব্যাকরণ লেখেনও নি, পড়েনও নি। তা সত্ত্বেও চণ্ডীদাস থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত অনেকেই কাব্য ও পদাবলি লিখেছেন। আর ভারতচন্দ্র চমৎকার বাঙ্গলা লিখেছেন। এর কারণ শ্রেষ্ঠ লেখকরাই ভাষা গড়ে তোলেন, বৈয়াকরণরা নয়। যদি কেউ বলে যে ভারতচন্দ্র বাঙ্গলা ব্যাকরণ না পড়ুন, সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়েছিলেন; তা হলে স্বীকার করতেই হয় যে কলাপ অথবা মুগ্ধবোধ পড়ে চমৎকার বাঙ্গলা লেখা যায়। রচনারীতি আয়ত্ত করতে হলে বাঙ্গলা ব্যাকরণের কোন প্রয়োজন নেই।

১২

ইংরেজরা এ দেশে শুভাগমন করবার পর তাঁরাই বাঙ্গলা ব্যাকরণ সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ সেই শাস্ত্র, 'যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, বঙ্গভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে ও কহিতে পারা যায়।' কিন্তু ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য রূপ।

সর্বপ্রথমে বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন হালহেড নামক সাহেব; কী উদ্দেশ্যে, তা তিনি নিজেই বলেছেন। তাঁর কথা এই—

"বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনাম
উপকারার্থং ক্রিয়তে হালহেদংগ্রেজি।"

তারপর বঙ্গবটুনামং উপকারার্থ আমরা দেদার বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করছি— পাণিনির ও ইংরাজির পরিভাষা মিশিয়ে।

১৩

হালহেডের ব্যাকরণ আমি দেখিনি, কিন্তু এর পরই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'যুবক সাহেবজাতের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার জন্য' সংক্ষিপ্ত বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করেন। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কুসুম দ্রষ্টব্য।

যুবক সাহেব-জাতগণ এ সব কুসুম আঘ্রাণ করে কী শিক্ষা লাভ করেছিলেন, বলতে পারিনে। কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকলে এ কুসুমগুলিতে দন্তস্ফুট করা যায় না। ফুলে অবশ্য দাঁত বসানো হয় না। এ mixed metaphor তাই অচল, তবে কী বলতে চাই তা বুঝতে পারছেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় text book রচনা করেননি, কতকগুলি lecture notes তৈরি করেছিলেন, যার ব্যাখ্যা তিনি নিজে মুখে করতেন। তাঁর ব্যাকরণ এক রকম সূত্র মাত্র।

১৪

ভগবান পতঞ্জলি বলেছেন যে, ব্যাকরণের চারটি শিং, যথা— নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত; তিন চরণ— ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান; দুটি মস্তক— নিত্য ও কার্য; সাতটি হস্ত— অর্থাৎ সাতটি বিভক্তি; উপরন্তু ত্রিভাগে বদ্ধ— অর্থাৎ বক্ষোদেশে, শিরোদেশে ও কণ্ঠদেশে, এই তিন অংশে বদ্ধ অর্থাৎ এই তিন স্থান অবলম্বন করে শব্দসমূহ উৎপন্ন হয়। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের উক্ত তিন-চার পাতার ভিতর ব্যাকরণের এই চতুরঙ্গ আছে। তা ছাড়া কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্য ভাববাচ্য প্রভৃতির ব্যাখ্যা আছে। আরও আছে যৌগিক যোগরূঢ় রূঢ়ী শব্দের ব্যাখ্যা— সেই সঙ্গে কৃৎ, তদ্ধিত, তিঙন্ত ও সুবন্ত শব্দের পরিচয়। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ যে বাঙ্গলা ব্যাকরণ নয়, এ জ্ঞান তাঁর ছিল।

১৫

'প্রবোধ চন্দ্রিকা' বোধ হয় রচিত হয়েছিল ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে; কিন্তু প্রথম ছাপা হয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুর পর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে। ইতিমধ্যে আর একখানি সংক্ষিপ্ত বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচিত হয়। রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ'। পতঞ্জলি যেমন জানতেন যে, সংস্কৃত ভাষা মৌখিক ভাষা, বৈদিক ভাষা নয়, রামমোহন রায়ও তেমনি জানতেন যে, বাঙ্গলা ভাষা লৌকিক ভাষা, সংস্কৃত ভাষা নয়। তাঁর এ জ্ঞান ছিল যে, ব্যাকরণ-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, পদ ও বাক্যের গঠনের নিয়ম, বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি নির্ধারণ করা অর্থাৎ structure-এর জ্ঞান লাভ করা। এই কথাই বৈজ্ঞানিক কথা।

১৬

অনেক বাঙ্গলা শব্দ যেমন তদ্ভব, তৎসম নয়; 'গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ'ও তেমনি তদ্ভব ব্যাকরণ, যা তৎসম ব্যাকরণ থেকেই উদ্ভূত। সুতরাং বাঙ্গলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণেরই উত্তরাধিকারী। এর ফলে বাঙ্গলা ব্যাকরণ কতকটা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মের অধীন হতে বাধ্য। বাঙ্গলা ব্যাকরণ মাত্রেই সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে ঢালাই হয়ে থাকে। এ হিসেবে রামমোহন রায়ের ব্যাকরণও সংস্কৃত ব্যাকরণ, তবে অনেক প্রভেদও আছে; আর সেই প্রভেদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমাদের বৈয়াকরণদের কর্তব্য। এই 'গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ'ই নূতন করে edit করলে ছাত্রদের যথার্থ উপযোগী ব্যাকরণ হয়। কারণ এর রচয়িতা হচ্ছেন অসাধারণ প্রতিভাবান। ছাত্রদের অধ্যয়নের জন্য এই ব্যাকরণই যথেষ্ট, তবে অধ্যাপকদের অধ্যাপনার জন্য encyclopaedia-কল্প ব্যাকরণ দরকার হতে পারে।

ফ্রা ন্সে র ন ব ম নো ভা ব

আমি সম্প্রতি New Era নামক মাদ্রাজ হতে প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রে ইংরাজি ভাষায় একটি প্রবন্ধ লিখি। সে প্রবন্ধের নাম Future of Civilization. বলা বাহুল্য যে এ নাম আমার দত্ত নয়— এ নাম দিয়েছেন New Era-র সম্পাদক। ভবিষ্যদ্বাণী করা আমার পেশা নয়। তবে সম্পাদক মহাশয় যদি উক্ত প্রবন্ধের নাম দিতেন Future of over-Civilization, এবং তার পরে একটি প্রমাণসই জিজ্ঞাসা-চিহ্ন বসিয়ে দিতেন, তা হলে আমার আপত্তির বিশেষ কোন কারণ থাকত না। বাঙলায় একটা কথা আছে—'ভাবতে পারিনে পরের ভাবনা লো সই'— ইউরোপ সম্বন্ধে আমার মনোভাব কতকটা ঐ গোছের।

উক্ত প্রবন্ধে আর পাঁচ কথার মধ্যে আমি এই কথা বলি যে,

We Indians to-day hanker after a To-morrow which would be a facsimile copy of Europe's Today... Situated as we are we cannot conceive of any other future. In the result, we fail to realise that Europe's Today will be its Yesterday by the time we reach the desired goal.

আমাদের আদর্শ আগামীকল্য ইউরোপের গতকল্য হবে। কথাটা কতকটা বীরবলী গোছের শোনায়। অর্থাৎ ওর ভিতর যা আছে তার নাম শ্লেষ, আর নেই কোন সত্য। আমি কিন্তু কথাটা রসিকতাচ্ছলে বলিনি, কেননা আমার ধারণা যে ইউরোপীয় সভ্যতার ঘড়ির কাঁটা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তারিখে থেমে যায়নি। এখনও তা চলছে এবং পুরোদমে চলছে। যে-জাতির অন্তরে জীবনীশক্তি আছে সে জাত যুগে-যুগে জীবনে ও মনে নব কলেবর ধারণ করবে। এক মৃত ছাড়া কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আর ইউরোপ যে জীবন্ত তার প্রমাণ আমরা হাড়ে-মাসে পাচ্ছি। ইউরোপের মনের কাঁটা যে টলমল করছে, এর স্পষ্ট পরিচয় পাই আধুনিক ফরাসি সাহিত্যে। কী উপন্যাস, কী কবিতা, সকলেরই ভিতর একটা প্রচ্ছন্ন সুর কানে পড়ে, আর সে সুর হচ্ছে সন্দেহের সুর, উনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত অকাট্য সত্যের প্রতি অসন্তোষ ও অবজ্ঞার সুর। যেমন ফ্রান্সের লোক এ বিষয়ে সচেতন হয়েছে যে নব সভ্যতার সোজা ও বাঁধা পথে তেড়ে চলতে গিয়ে, তারা

মনুষ্যত্বের কোন-কোন অংশ হারিয়ে বসেছে। এবং তার ফলে সভ্য মানবের চিত্ত দীন ও চরিত্রহীন হয়ে পড়েছে। ইউরোপে যে ধনরত্ন প্রভূত পরিমাণে আছে, তা আমরা সকলেই জানি। বাঙলায় একটা মতবাদ আছে যে 'নিজের বুদ্ধি ও পরের ধন পৃথিবীতে কেউ কম দেখে না।' সম্ভবত সেই কারণে আমরা ইউরোপের ঐশ্বর্য একটু বড় করে দেখি। এবং সে ঐশ্বর্যলাভের লোভই হচ্ছে আমাদের নব ideality। সে যা-ই হোক, ইউরোপীয়েরা বলে যে তাদের সুখও নেই, শান্তিও নেই। এই কারণে তারা যে বর্তমানে শান্তির জন্য লালায়িত, তা তো সকলেই জানেন। এখন মনের সুখ কী করে তারা ফিরে পাবে, তার সন্ধানও অনেকে করছে। অনেকের ধারণা, যে-সব সত্য তারা হারিয়ে ফেলেছে তার পুনরুদ্ধার করতে পারলেই তারা আবার জীবনে ও মনে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠবে। যে-মনোভাবকে মানুষে একবার মিথ্যে বলে পরিহার করেছে; সেই মনোভাবকে আবার সার সত্য বলে অঙ্গীকার করার নাম বোধ হয় reaction। কিন্তু ও-নামে ভয় পাবার কোন কারণ নেই, কারণ re-action-ও এক রকম action, অপর পক্ষে in-action-ই মানবজাতির নাশের মূল; সে মানসিক in-action-এর নাম ইভলিউ-শনই দেও আর progress-ই দেও, তাতে কিছু আসে যায় না। মানবসমাজ রেলের গাড়ি নয় যে একরোখে একটানা গিয়ে সভ্যতার terminus-এ পৌঁছবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যে-জাতির প্রাণ আছে তারা এগুতে জানে, পিছুতেও জানে। ইউরোপের মন এখন কোন্ স্রোতের বিরুদ্ধে উজিয়ে চলতে চেষ্টা করছে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। আমি আজকে বিশেষ করে নব ফরাসি মনের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেব। কারণ এ সমিতির সকলেই ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। অতএব যদি বলি যে ফরাসি সাহিত্যের প্রধান গুণ হচ্ছে তার তার স্পষ্টভাষিতা, তা হলে কেউ তার প্রতিবাদ করবেন না। ফরাসি জাতির মনের ভাবও স্পষ্ট, তাদের মুখের কথাও স্পষ্ট এবং মনোরাজ্যে তারা সম্পূর্ণ নির্ভীক। সুতরাং ও-জাতির মনের ও মতের যখন যা পরিবর্তন হয়, তখন তা তাদের সাহিত্যে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। ফরাসি জাতি আধ-আধ ভাষী নয়। এর ফলে, ইউ-রোপে যখন যে-ভাব জন্মগ্রহণ করে তা স্পষ্ট রূপ লাভ করে ফরাসি সাহিত্যে।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে অতি স্বল্প পরিচয়ের ফলে আমার পক্ষে ফরাসি জাতির নব মনোভাবের পরিচয় দিতে যাওয়া এক হিসেবে ঔদ্ধত্য মাত্র। পৃথিবীর কোন দেশেই সকল লোকের দেহের চেহারাও এক নয়, মনের চেহারাও এক নয়। ফলে সকলের মন ঠিক [করে] দিলেও তার ফলে এক মত বেরয় না। মনোজগতে তিল কুড়িয়ে তাল করা যায় না। সত্য কথা বলতে গেলে, অধিকাংশ লোকের নিজস্ব মত বলে কোন পদার্থ নেই। যে-সকল মতামত পরের কাছে থেকে পড়ে পাওয়া, তাই তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার জন্য

যথেষ্ট। বেশির ভাগ লোক যদি মেষ জাতীয় না হত তো সমাজ বলে কোন জিনিস জন্মাত না। আর যে-স্বল্পসংখ্যক লোকের নিজস্ব মতামত আছে, তাদের মতামত বিভিন্ন হতে বাধ্য। কারণ অতি বুদ্ধিমান ও বিদ্বান লোকেরাও নিজের চরিত্র ও নৈসর্গিক প্রবৃত্তি অনুসারে নিজস্ব মত গড়ে তোলেন। অবশ্য পৃথিবীতে দু'-শ্রেণীর লোক আছে, যারা সকলকেই নিজ মতাবলম্বী করা তাঁদের কর্তব্য মনে করেন। এক দল হচ্ছেন ধর্মাচার্য, আর-এক দল হচ্ছেন বিজ্ঞানাচার্য। কারণ উভয়েরই বিশ্বাস যে, জগতের মূল সত্য তাদের করায়ত্ত। এবং তাদের কথা বেদবাক্য বলে মানলেই মানবজাতি উদ্ধার হয়ে যাবে। ইউরোপের অধিবাসীরা সেকালে এই ধর্মযাজকদের বশীভূত ছিল এবং এ কালে এই বিজ্ঞানাচার্যদের বশীভূত হয়েছে। এই উভয় শ্রেণীর লোকই সর্বজ্ঞতার দাবি করে। এবং যে-হেতু বিজ্ঞান এ কালে সর্বশক্তিমান, সে কারণ বৈজ্ঞানিকদেরও সর্বজ্ঞ বলে মানা অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে যে-স্বল্প সংখ্যক লোক মনোজগতে স্বাধীনতা চায়, তারাই কলমের জোরে জাতির মনের মোড় ফেরায়। সুতরাং স্বল্প সংখ্যক সাহিত্যিকের মতামত উপেক্ষণীয় নয়। এই শ্রেণীর লোকের মনোভাবকে আমি ফ্রান্সের নব মনোভাব আখ্যা দিয়েছি। এই স্বল্প সংখ্যক লোকের যে-মনোভাবের পরিচয় সাহিত্যে পাওয়া যায়, তার থেকে এ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে ফরাসি জাতির ভাবের পরিবর্তন ঘটেছে।

সম্প্রতি La Renaissance Religieuse নামক একখানি ফরাসি পুস্তক আমার হস্তগত হয়েছে। সেই পুস্তকের সাহায্যেই এই নূতন মনোভাবটি যে কী, তার সন্ধান নেবার চেষ্টা করব। এই বইখানিতে প্রায় বিশ জন লেখকের বিশটি প্রবন্ধ আছে। এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই দার্শনিক হিসেবে, নভেলিস্ট হিসেবে, প্রবন্ধকার হিসেবে খ্যাতনামা লেখক। এঁদের অবশ্য সকলের ধর্মমত এক নয়, কেননা এঁদের মধ্যে কেউ Catholic, কেউ Protestant, কেউ ইহুদি, কেউ আবার Orientalist। কিন্তু এক বিষয়ে সকলের মনের গতি একই দিকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দিকে সকলেই পিঠ ফিরিয়েছেন। Laicisme-এর বিরুদ্ধে সকলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। Laicisme-এর ভালো বাঙলা কী? ঐহিকতা? কিন্তু ঐহিকতার অর্থ কী? আমার বিশ্বাস, সর্বদর্শন সংগ্রহের বক্ষ্যমান কথা ক'টির ভিতর তার পুরো অর্থ পাওয়া যায়। "যাঁহারা লৌকিক বাক্যের বশবর্তী হইয়া নীতি ও কাম শাস্ত্রানুসারে কাম ও অর্থকেই পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, পারলৌকিক অর্থ স্বীকার করেন না, সেই সকল চার্বাক মতানুবর্তীরাই এইরূপ অনুভব করিয়া থাকেন, এই নিমিত্তই চার্বাকের মতের 'লোকায়ত', এই অপর নামটি সার্থক হইয়াছে।"

বর্তমান ইউরোপের লোকায়ত মত যে একই মত, একটি ফরাসি লেখকের কথা থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি laicisme-এর বক্ষ্যমান পরিচয় দিয়েছেন—

Laicisme হচ্ছে একটি বিশেষ systeme doctrinal et conceptual, de plus en plus repandue chez toutes les nations de l'ancien et du nouveau monde. আর এ নতুন doctrine কী? La religion de la science, la religion du progress, la mystique des droits du proletariat, la mystique de s'emancipation des peuples, et en general la religion de l'humanite. বলা বাহুল্য, এ সবই হচ্ছে নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের, politics এবং economics সাধনার মন্ত্রতন্ত্র।

ফ্রান্সের এই নব চিন্তার ধারার দুটি মুখ আছে। প্রথমত ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি অনাস্থা, দ্বিতীয়ত ধর্মের সত্যের প্রতি আস্থা। প্রথম মনোভাবটি negative, দ্বিতীয়টি positive, আজকে আমি এই negative মনোভাবেরই পরিচয় দেব; কারণ positive দিকটির পরিচয় দিতে হলে intuition, mysticism প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বের বিচার করতে হয়। সে বিচার সকলের সহ্য হবে না, বিশেষত অবৈজ্ঞানিক এবং অদার্শনিক বক্তার মুখে শুনলে।

আমি পূর্বেই বলেছি ধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখকেরা সকলে একমত নন। একমত যে নন, তাতেই প্রমাণ হয় যে বহু লোকে ধর্মের বিষয় চিন্তা করতে আরম্ভ করছেন, এবং সে চিন্তা স্বাধীন চিন্তা, কোন বাঁধাধবা মতের পুনরুল্লেখ মাত্র নয়। খ্যাতনামা নভেলিস্ট Ramon Fernandez intution শব্দের যে-ব্যাখ্যা করছেন, Bergson-র intuition-এর অর্থ অবশ্য তা নয়। Fernandez-এর মতে intellect জানে আর intuition চেনে। এ দু'য়ের প্রভেদ যে কী, তা বুঝলেন? কিন্তু উভয়ের মিল এই জায়গায় যে, উভয়ের মতেই intellect সত্যের জ্ঞানলাভের একমাত্র যন্ত্র নয়। অপর পক্ষে তাঁদের negative মনোভাবের যথেষ্ট মিল আছে। সকলেই একই কথা বলছেন, অবশ্য বিভিন্ন ভাষায়। সুতরাং তাঁদের একজনের মতামত আপনাদের শোনাব-- তার থেকেই আপনারা এই নূতন মনোভাবের সন্ধান পাবেন। আমি এমন একটি লেখকের কথা আপনাদের শোনাতে চাই, যাঁর কথা অতি স্পষ্ট এবং যাঁর মনে কোন কিন্তু-কিন্তু নেই। এ-ও হয়, ও-ও হয়, এমন কথা বলায় সম্ভবত সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয়, কিন্তু সে কথার পিছনে লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। এবং যে-লেখার অন্তর থেকে লেখক ফুটে না ওঠেন, সে কথা লোকের মনে বসে না।

আমি এ স্থানে যাঁর মতের পরিচয় দেব, তাঁর নাম Pant Archambaut। ইনি কে আমি জানিনে, কিন্তু লেখা পড়ে মনে হয়, লেখক একজন অধ্যাপক; এবং সম্ভবত দর্শনশাস্ত্রের। তিনি লিখেছেন, "গত দশ-বিশ বৎসরের মধ্যে ধর্মমনোভাব scientisme নামক মনোভাবে স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং অতি শীঘ্রই যে তা sociologisme নামক শাস্ত্রেরও মূল উচ্ছেদ করবে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই সব মত যে আসলে অমূলক তাই প্রমাণ করা আমাদের দেশের নব চিন্তার negative অংশ।

"Scientisme একদম বাতিল হয়ে গিয়েছে। Scientisme বলতে কী বোঝায়? সেই মত, যে-মতানুসারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই মানুষের একমাত্র জ্ঞান, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকরা যে-সকল postulates এবং hypotheses-এর উপর বিজ্ঞানশাস্ত্র গড়ে তুলেছেন, postulate-এর hypothesis-কে ধ্রুব সত্য বলে বিশ্বাস করা, আর যে-সত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জানা না যায়, সে সত্যকে মিথ্যা জ্ঞানে পরিহার করা, এবং যা বিজ্ঞানের বহির্ভূত তাকেই অলীক সাব্যস্ত করা, ফলে quality, personality, liberty, morality প্রভৃতি মানবধর্মকে অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা।

"সকলেই মানেন এই মত Renan, Taine এবং Berthelot-এর প্রসঙ্গে গত শতাব্দীতে লোকের মনের উপর কী রূপ একাধিপত্য লাভ করেছিল। কিন্তু উক্ত মতের গোড়া আলগা করে দিয়েছে ধর্মযাজকেরা নয়, পরবর্তী দার্শনিকরা ও বৈজ্ঞানিকরা। এক দিকে Boutroux এবং Bergson-র ন্যায় দার্শনিক, অপর পক্ষে, Poincarè, Duhem, Milhand, Le Roy প্রভৃতি গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞানের জগৎপূজ্য গুরুরা।"

Archambaut-এর এ কথা যদি সত্য হয়— আর এ কথা যে সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই অন্তত তার মনে যিনি Bergson-র Creative Evolution এবং Poincarè-র Science et Hypothesis নামক গ্রন্থদ্বয়ের সঙ্গে সুপরিচিত— তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, scientisme-এর সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে সমাজের মনকে মুক্তি দিয়েছে Science। Religion, science-এর সঙ্গে কিছু দিন লড়েছিল বটে, কিন্তু সে যুদ্ধে religion-এর সম্পূর্ণ হার হয়েছিল। খ্রিস্টধর্মের পুরোহিতের দলের পক্ষে বাইবেল হাতে বিজ্ঞানের সঙ্গে লড়াই ইংরাজের বিরুদ্ধে তিতু মিয়ার লড়াইয়ের মতো হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু সম্প্রতি Einstein দেশের মধ্যে কাল ঢুকিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের সাজানো তাস যে-রকম ভেস্তে দিয়েছেন, তাতে করে সে তাসের সাহায্যে আর ধর্মকে হেলায় বাজিমাত করা চলে না।

Bergson এবং Poincarè প্রভৃতির দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতামত যে আমাদের মতো অবৈজ্ঞানিক ও অদার্শনিক লোকের নিকট সত্য বলে গ্রাহ্য হয়েছে শুধু তাই নয়। ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক মহলেও এঁদের মতামত বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামি নষ্ট করেছে। এ বিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার একমাত্র চাবি যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়, এ জ্ঞান বহু বৈজ্ঞানিকেরও হয়েছে। সম্প্রতি ফ্রান্সের Figaro নামক দৈনিক পত্রে Academie des Science-এর সভ্যবৃন্দ এ বিষয়ে তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন। তার থেকে দেখা যায় এ যুগের বৈজ্ঞানিকরা প্রায় সকলেই একমত যে science এবং religion উভয়েই সমান সত্য, কারণ সত্যে পৌঁছবার মনোজগতে দুটি পথ আছে, একটি বিজ্ঞানের পথ, অপরটি ধর্মের পথ। এর একটির দোহাই দিয়ে অপরটি বন্ধ করবার চেষ্টাই আহম্মকি। আমাদের দেশের ভাষায়, ব্যবহারিক সত্যের দোহাই

দিয়ে অনুভব-নিবদ্ধ সত্যকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই scientisme-এর বাধামুক্ত হয়ে ফরাসি মন আবার ধর্মের পথে মনকে অগ্রসর করবার জন্য ব্রতী হয়েছে। এ ব্রত যার খুশি সে-ই উদ্‌যাপন করতে পারে। কেউ তাকে আর মূর্খ বলবে না। এর থেকে কেউ যেন মনে করেন না যে ফ্রান্সের লোক এখন পাঁচবক্ত নমাজ করতে বসে গিয়েছে। মানুষের প্রকৃতি এ নয়, চিন্তার ধারার সঙ্গে-সঙ্গেই তার জীবনের ধারা বদলে যায়। বিশেষত সেই সকল লোকের, scietisme যাদের মগ্ন চৈতন্যে থিতিয়ে বসেছে। পৃথিবীর আজকের দিনে যে-political ও economic অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে করে ইউরোপের কোন জাতির পক্ষেই মধ্য যুগে ফিরে যাওয়া একেবারে অসাধ্য। বিজ্ঞান ইউরোপের হাতে যে-আলাদিনের প্রদীপ দিয়েছে সে প্রদীপ যে তারা ছুঁড়ে ফেলে দেবে, ইউরোপের লোক এত দূর কাণ্ডজ্ঞানহীন নয়। এবং সে প্রদীপের আলোয় তাদের জীবনের সুপথ দেখাবে। Scientisme বাতিল হতে পারে, কিন্তু science-এর উত্তরোত্তর উন্নতি হবে। Science যেমন মানুষের অশেষ উপকার করেছে, তেমনি তার ঐকান্তিক চর্চার কতকগুলো কুফলও ফলেছে— যথা সামাজিক জীবনে industrialism-এর আতিশয্য ও ধনীর নব feudalism ইত্যাদি এবং মানসিক জীবনে ঐহিকতা। Science রক্ষা করে তার এই সব কুফল কী করে দূর করা যায়— এই হচ্ছে ইউরোপের এ কালের প্রধান সমস্যা। তাই কেউ সমাজকে ঢেলে সাজাতে চান. কেউ আবার মনকে মুক্তি দিতে চান। জীবন মনকে তৈরি করে কিম্বা মন জীবনকে তৈরি করে, তা আমি বলতে পারিনে। তবে এ কথা সত্য যে কোন জাতির মন যখন বদলায় তখন তার সত্যতা যে নব রূপ ধারণ করবে, এ রূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এই কারণেই আমি আপনাদের কাছে ফ্রান্সের নব মনোভাবের পরিচয় দিতে উদ্যত হয়েছি। ইউরোপীয় সভ্যতা যে ঠিক কী রূপ ধারণ করবে বলা অসম্ভব, কিন্তু তার বর্তমান রূপ যে থাকবে না, এ কথা সাহস করে বলা যায়।

যদি বলেন যে, জন-কতক লেখকের মন থেকে জাতীয় মনের সন্ধান পাওয়া যায় না, তা হলে আমার উত্তর, এ কথা ঠিক। Conservatism মানুষের মজ্জাগত। Religious conservatism গত শতাব্দীতেও চলে যায়নি এবং scientific conservatives বর্তমান ফ্রান্সে প্রবল পক্ষ নয়। কোন ফরাসি Bertrand Russell-এর ন্যায় die-hard লেখকের সাক্ষাৎ আমি এ যুগের ফরাসি সাহিত্যে পাইনি।

আমরা যাকে নতুন মনোভাব বলি, তা অবশ্য পুরনো মনোভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অথবা বিভিন্ন নয়। ক্ষণিক বিজ্ঞান যেমন মনের ধর্ম নয়, ক্ষণিক জীবনও তেমনি প্রাণের ধর্ম নয়। মানুষ দেহমনে ক্ষণে মরে ক্ষণে বাঁচে, এমন কথা পাগলের প্রলাপ মাত্র। মানুষের দেহ যেমন যুগে-যুগে নূতন রূপ ধারণ করে

অথচ চিরজীবন তার একটা পুরনো কাঠামো থেকে যায়, মানুষের মনও তেমনি যুগে-যুগে নূতন রূপ ধারণ করে কিন্তু তার অন্তরে একটা বিশিষ্ট কাঠামো থেকে যায়। আমরা বিশ্বাস করতে ভালোবাসি যে মানুষ মাত্রেই স্বভাবতই কতক বিষয়ে সমধর্মী। এ বিশ্বাস যাঁর নেই, তাঁর মুখে 'মানবজাতি' কথাটা নিরর্থক।

তেমনি আবার বিভিন্ন জাতির ও মনেরও অল্পবিস্তর প্রভেদ আছে। সব জাতির মন একই পথে একই চালে চলে না। এ জাতিগত বৈচিত্র্যের জন্য প্রতি জাতির ইতিহাস দায়ী। মানুষের মন একেবারে সাদা কাগজ নয় যে যার যা খুশি সে-ই তার উপরে নূতন রচনা করবে। ও-কাগজের উপরে জাতির ইতিহাস অনেক কথা নিয়ে নিয়েছে যা একেবারে মুছে ফেলা যায় না। এই সত্যটি উপেক্ষা করেই গত শতাব্দী ইউরোপের মনের নব রচনা করতে বসেছিল। ফলে আজকার ইউরোপের মনে যে তার যুগসঞ্চিত ধর্মভাব মাথাঝাড়া দিয়ে উঠবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। সে মনোভাব জাতির অন্তরে কখনওই মরেনি, শুধু ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল, এখন হয়তো আবার পুনর্জীবিত হয়ে উঠছে। আমাদের দেশেও পুরাকালে নানা রকম বাহ্য ধর্ম বৈদিক ধর্মকে আচ্ছন্ন করেছিল, এবং সে ধর্মের পুনরুত্থানের সময় মেধাতিথি বলে গিয়েছেন যে— "বাহ্যধর্মাস্ত সর্বে মূর্খদুঃশীল-পুরুষ-প্রবর্তিতাঃ কিয়ন্তং কালং লব্ধাবসরাম্বপি পুনরস্তধায়ন্তে। নহি ব্যামোহো যুগ সহস্রানুবর্তী ভবন্তি।" অবশ্য ইউরোপে আজকের দিনে কেউ মেধাতিথির মতো কটু কথা বলবেন না। তাঁরা এই পর্যন্ত বলতে প্রস্তুত— নহি ব্যামোহো যুগ-সহস্রানুবর্তী ভবন্তি। Scientisme-এর ব্যামোহ কাটিয়ে উঠলে ফরাসি মন, ফরাসি মনই থাকবে, জর্মান মন হবে না।

পুরাকালে ভারতবর্ষে বাহ্য ধর্মের বিরুদ্ধে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন, তাঁদের হাতে বৈদিক ধর্ম যেমন বৈদান্তিক ধর্ম হয়ে উঠেছিল, আমার বিশ্বাস ইউরোপের এই নব-ধার্মিকদের হাতে খ্রিস্টান ধর্মও নব-রূপ ধারণ করবে। বৈদান্তিক দর্শনের বিশেষত্ব এই যে, তার অন্তরে গোটা বৌদ্ধ দর্শন গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। আর আমার বিশ্বাস, ফ্রান্সের এই নূতন ধর্ম-মনোভাব, science-এর সকল সত্যই অঙ্গীকার করবে। এ অনুমানের কারণ কী, তা বলছি।

Jacques Chevalier নামক জনৈক যুগপৎ দার্শনিক এবং নিষ্ঠাবান Catholic বলেছেন যে, St. Thomas-এর দর্শনে আমাদের পক্ষে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। তার প্রথম কারণ তিনি science-এর কিছুই জানতেন না, দ্বিতীয়ত গত ছ'-শ বৎসরের ভিতর ইউরোপে যে-দার্শনিক চিন্তার স্রোত বয়ে গিয়েছে তা উপেক্ষা করা শুধু মূর্খতা নয়, অসম্ভব। ইউরোপের এই নিকট-অতীত আমাদের মনের এত পরিবর্তন ঘটিয়েছে যে সে পরিবর্তন অস্বীকার করে আমরা কোন সত্যেরই সাক্ষাৎ লাভ করব না। St. Thomas যদি আজকের দিনে সশরীরে উপস্থিত থাকতেন এবং বর্ত-

মানের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর নূতন দর্শন গড়ে তুলতেন তা হলেই তাঁর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও তার মীমাংসা আমাদের কাছে গ্রাহ্য হত। আমাদের নূতন ধর্মভাব কোন অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রয়ে প্রাণ ধারণ করতে পারবে না। ভগবানে বিশ্বাস তখন আমাদের অটল হবে— যখন আমরা লজিকের ভিত্তির উপর সে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। এ হচ্ছে খাঁটি ফরাসি মনের কথা, কারণ ফরাসিরা হচ্ছে মূলত নৈয়ায়িকের জাত। বাণভট্ট আমাদের দেশের নৈয়ায়িকদের ঠাট্টা করে বলেছেন যে তারা সব ঈশ্বর-প্রামাণিক। সুতরাং ফরাসি জাতের ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত হলে তারাও যে ঈশ্বর-প্রামাণিক হয়ে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্য কী? তবে বৈদান্তিকরা এ কথা শুনে হেসে বলবে, বহুত আচ্ছা। তোমরাও ফরাসিদের দলের লোক। তবে কথা হচ্ছে এই যে— ঈশ্বর প্রমাণের বিষয় নন। যা স্বতঃসিদ্ধ, তার আবার প্রমাণ কী? আর বৈদান্তিক সকল দেশেই এসেছে, কেননা বেদান্ত একটা শাস্ত্র নয়, ও এক রকম বিদ্যা। আমি পূর্বে বলেছি যে, প্রতি জাতির মনের একটা বিশেষ দিকে ঝোঁক আছে। ফরাসি জাতির মনকে Descartes যে-পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথেই ফরাসি মন অদ্যাবধি চলে আসছে এবং সে পথেই সহজে চলতে পারে। সে পথ হচ্ছে আলোর পথ। ছায়ার পথে ফরাসি মন যুক্তি করে অগ্রসর হতে পারে না! এই কারণেই ফরাসি পদ্য-সাহিত্য এত দরিদ্র এবং ফরাসি গদ্য-সাহিত্য এত ঐশ্বর্যবান। আমরা যাকে scientific philosophy বলি, তার প্রবর্তক Descartes, Newton নন। Descartes বলেছিলেন, "Give me matter and motion and I will build the universe." যাকে scientific philosophy বলে, তা এই বিশ্ব গড়ে তোলবার নব-দর্শন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে এই নূতন দর্শন সর্বাঙ্গ-সুন্দর ভাবে গড়ে উঠেছিল, সে-ও ফরাসিদেরই হাতে। Scientisme-এর খণ্ডন যে ফ্রান্সের গ্রাহ্য হয়েছে, তার কারণ নূতন science-ই তার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। অপর পক্ষে এক দলের লেখক যে St. Thomas-এর দর্শনের দিকে ঝুঁকেছে, তার কারণ St. Thomas আর কিছু না হন, চমৎকার logician। তিনি religion-কে science-এ পরিণত করেছিলেন।

কী করে religion ও science উভয়ই রক্ষা করা যায়, এই হচ্ছে বর্তমান ফরাসি মনের সমস্যা। এ ক্ষেত্রে অনেকে Pascal-এর মীমাংসার উপরই নির্ভর করছেন। Pascal বলেছেন, যে কেবলমাত্র reason-এর উপর নির্ভর করে সকল সত্যের সে সাক্ষাৎ পায় না; অপর পক্ষে যে কেবলমাত্র unreason-এর উপর নির্ভর করে সে সকল মিথ্যারই সাক্ষাৎ লাভ করে।

ফলে ফরাসি মন unreason-কে বরণ করতে প্রস্তুত নয়, reason-এর নাগালের বাইরেও যে-সত্য আছে সেই সত্যেরই তারা সন্ধান করছে।

Science-এর কোন ভিত্তি নেই, বৈজ্ঞানিক জগৎ যে গণিতশাস্ত্রীদের মন-গড়া

একটা কল্পপুরী, এ কথায় ফরাসি মন সায় দেয় না। Descartes, geometry-কে algebra-য় রূপান্তরিত করেছিলেন। গণিতশাস্ত্রে তাঁর এ কীর্তি 'অপূর্ব', সুতরাং যে-গণিত Descartes গড়েছেন সে গণিতের সাহায্যে science যে ভানুমতীর বাজি দেখিয়েছে, তার অন্তরে যে কোন reality নেই, এ কথা ফ্রান্সের বিশ্বস্ত Catholic-ও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। তাই Archambaut বলেছেন— Science-এর মূলে যে কতকগুলি postulate মাত্র আছে, এ কথা শুনে অনেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে science একটা ঐন্দ্রজালিকের ভেল্কি মাত্র। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। Meyerson দেখিয়ে দিয়েছেন যে science-এর অন্তরেও ধ্রুবসত্য আছে। Meyerson হচ্ছেন একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। তাঁর দর্শনের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, থাকলেও তাঁর কথা বোঝা আমার সাধ্যের অতীত। তবে তাঁর শিষ্য Andre Metz নাকি এক কথায় Meyerson-এর সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে দিয়েছেন। Metz লিখেছেন, Meyerson-এর সিদ্ধান্তের সঙ্গে Pascal-এর সিদ্ধান্তের কোন প্রভেদ নেই। মানুষ সৃষ্টির গোড়ার কথাও জানে না, শেষ কথাও জানে না, জানে শুধু ইতিমধ্যের কথা। এ সব কি গীতার একটি শ্লোকের অক্ষরে-অক্ষরে অনুবাদ নয়?

"অব্যক্তাদীনী ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত
অব্যক্তনিধনান্বেব এব কা পরিদেবনা।"

মানবমনের যে-শক্তি এ ব্যক্তমধ্যের জ্ঞান লাভ করে সেই শক্তিই বৈজ্ঞানিক মনের একমাত্র শক্তি, এবং যে-শক্তির সাহায্যে অব্যক্তের সন্ধান পায় সেই শক্তির উপরই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। অতএব science, religion-এর হন্তারক নয়।

বর্তমান ফরাসি মনীষীদের এ সব কথা শুনে মনে হয় যে— তাঁদের নূতন মনোভাব আসলে তাঁদের পূর্ব মনোভাব। অর্থাৎ Descartes-এর আশ্রয় ছাড়লে তাঁরা Pascal-এর ক্রোড়ে আশ্রয় নেন। আর Descartes এবং Pascal মনোজগতে একই জাতের লোক, এ দুয়ের কেউ unreason-কে আসন দিতে প্রস্তুত নন।

আমি এ প্রবন্ধে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইউরোপীয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতামতের উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছি। আমি যে স্বেচ্ছায় ও-গুরুতর বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইনি, তার কারণ আমি জানি যে সে আলোচনা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা। তবে যে দর্শন-বিজ্ঞানের একেবারে পাশ কাটিয়ে যেতে পারিনি, তার কারণ ফ্রান্সের মন গত তিন শত বৎসরের দর্শন-বিজ্ঞানই গড়ে তুলেছে। ফ্রান্সের নতুন মনোভাব এই বিজ্ঞানশাসিত মন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। বিজ্ঞানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কোন সত্যের সন্ধান করা ফরাসি মনের পক্ষে অসম্ভব। ধর্ম-বিশ্বাসকে মনে যদি স্থান দিতে হয় তো তা করতে হবে বিজ্ঞানের অবিরোধে— এই হচ্ছে ফরাসি মনের আসল কথা। অর্থাৎ স্বর্গে যেতে হলে বিজ্ঞানের সিঁড়ি ভাঙতে হবে। ইংরাজিতে একটি কথা আছে যে, Where ignorance is bliss it is

folly to be wise. আমাদের দেশে বহু ধার্মিক লোক এ কথায় সায় দেবেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস ফরাসি দেশে যাঁরা মনের কারবার করেন, তাঁরা এ মতকে প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা করবেন না।

আর-এক কথা। একটি বিশেষ মনোভাবকে আমি এ প্রবন্ধে বরাবর religious বলছি। কিন্তু যে-পুস্তক অবলম্বনে আমি এ প্রবন্ধ রচনা করছি, সে পুস্তকে কোন-কোন লোক বলেছেন যে যদি religious শব্দের পরিবর্তে spiritual শব্দ ব্যবহার করা যায় তা হলেই বর্তমান মনোভাবের স্বরূপ ঠিক বোঝা যায়। যথার্থ religious লোক যে spiritual নন, এমন কথা কেউ বলেন না। কিন্তু বহু লোক spiritual হয়েও, religious না হতে পারে। কারণ religious শব্দের সকল দেশেই একটি সঙ্কীর্ণ অর্থ আছে এবং সে অর্থে religious হওয়া অনেকের পক্ষে সম্ভব। এ ক্ষেত্রে 'আমি বিশ্বাস করি' আর 'আমি অবিশ্বাস করিনে', এই দুই উক্তিই সমান মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। কারণ এ বিশ্বাস, অবিশ্বাস দুইটি spiritual স্বাধীনতার পরিচায়ক। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে মনকে ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলিয়ে রাখা নাকি কাপুরুষের ধর্ম। ফ্রান্সের এই নূতন মনোভাবের ফরাসি জীবনের উপর কোন প্রভাব হয়েছে কি না জানিনে, কিন্তু আধুনিক ফরাসি সাহিত্য এ প্রভাবমুক্ত নয়।

যদি চল্লিশ বৎসর পিছু হটে যাওয়া যায় তো দেখা যাবে যে, সে কালের সাহিত্যের উপর scientisme-এর প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। Zola প্রমুখ naturalist লেখকেরা religion of science-এর গোঁড়া ভক্ত; আর Anatole France হচ্ছেন scientific scepticism এর পূর্ণ অবতার।

কিন্তু সে দেশের হাল সাহিত্যের ভিতরে একটি নূতন সুর কানে পড়ে। এ সুরের নাম spiritual ছাড়া আর কী দেব জানিনে। এ সুর অবশ্য অতি ক্ষীণ; তবুও কান এড়িয়ে যায় না। ফ্রান্সে যাঁদের neo-romantics বলে, তাঁদের রচিত সাহিত্যে এই spiritual সুর অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। কিন্তু Proust-এর মতো লেখক, যাঁর লেখায় কোন রকম ফিলজফির সন্ধান পাওয়া যায় না, তাঁর লেখা পড়তে আমার মনে হয় যে তাঁর লেখার ভিতর থেকে Bergson উঁকিঝুঁকি মারছে, এমনকী তাঁর প্রাকৃতিক বর্ণনাতেও। আর তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর নভেলে যে-ক'টি অপূর্ব সুন্দর কথা বলেছেন, তা যে intuition-লব্ধ সে বিষয়ে তিল মাত্র সন্দেহ নেই। Intuition মানলেই mysticism মানতে হয়। Mysticism কথার বাঙলা প্রতিশব্দ আমি জানিনে। সনৎকুমার নারদকে বলেছিলেন যে, "তুমি অতিবাদী হও আর লোকে যদি বলে তুমি অতিবাদী, তার উত্তরে বলো যে হাঁ আমি অতিবাদী।" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ) এই 'অতি' বস্তুটির সাক্ষাৎ science তার গণ্ডির মধ্যে পায় না, অতএব তার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে science ন্যায়ত বাধ্য। আমার মনে হয় যে Bergson এই অতিবাদকে মুক্তি দিয়েছেন। কথাটা খুব স্পষ্ট হল না, কেননা 'অতি'কে পূর্ণ

আলোকে আনা যায় না, অথচ অনেকের মন তার সাক্ষাৎ পায়। ফ্রান্সের নব মনোভাবের অন্তরে আছে মনোজগতে নূতন মুক্তির আনন্দ। অবশ্য এর উল্টো মনোভাবও সে দেশের সাহিত্যে যথেষ্টর চাইতেও বেশি আছে, কিন্তু সে চলতি মনোভাব— তার অন্তরে কিছু মাত্র নূতনত্ব নেই। ইউরোপের মনের গতি নূতন দিকে যাচ্ছে, আমার এ অনুমান যদি সঙ্গত হয়, তা হলে ভবিষ্যতে আমাদের সভ্যতাব To-morrow যে ইউরোপীয় সভ্যতার Yester-day হয়ে যাবে, এ আশঙ্কা সহজেই মনে উদয় হয়। না ভেবেচিন্তে ইউরোপীয় সভ্যতার পিছনে ছুটলে আমাদের হয়তো যুগে-যুগে মনকে ডিগবাজি খাওয়াতে হবে। আর মনের ঘুঁটি বার-বার কাঁচলে সভ্যতার খেলায় বেশি এগোনো যায় না।

আমি বিশেষ করে ফ্রান্সের নবভাবের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু সত্য কথা এই যে, সমগ্র ইউরোপে এ চিন্তার ধারা এখন উজান ভাবে বইছে। Whitehead, Eddington, Haldane, Macdougal প্রভৃতি বিলাতের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকরা একই সুর ভাঁজছেন, কেউ মিঠে সুরে, কেউ আবার চড়া আওয়াজে। বৈজ্ঞানিক সতর্কতার হাত থেকে প্রায় সকলেই মুক্তিলাভ করেছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই রকম পাঁচ জন বৈজ্ঞানিক মিলে ইংলন্ডের লোকের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বদ্ধ মনের দুয়োর খুলে দিচ্ছে।

যদি কেউ বলেন যে আমি যে-নব মনোভাবের কথা বলছি, সে গতযুদ্ধের shell-shock ধাক্কায় ইউরোপের মনের সাময়িক বিকার মাত্র, তা হলে তাঁর কথার কোন প্রতিবাদ করব না। কারণ যাঁদের ধারণা যে পৃথিবীর সকল প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং মানবসভ্যতার মধ্যে ইউরোপীয় সভ্যতা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা সর্বশ্রেষ্ঠ, অতএব ঐ সব সভ্যতা অনুসরণ করা আমাদের চরম আদর্শ; তাঁদের এবম্ভূত ধর্মজ্ঞানের উপর হস্তক্ষেপ করা আমার সাধ্যাতীত। আর তা ছাড়া বিলেতি সভ্যতার মহোৎসবের চিরকাল দর্শক হয়ে থাকা আমাদের কারও মনোমতো নয়। তবে ও-আদর্শ কায়-মনোবাক্যে অনুসরণ করে আমাদের মনের চেহারা আমরা সম্পূর্ণ বদলে দেখতে পারব কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমার বিশ্বাস, গত এক শ' বৎসরের শিক্ষাদীক্ষার ফলে, আমাদের দেহেরও রঙ ফিরে যায়নি, মনেরও নয়, যা বদলে গিয়েছে, সে হচ্ছে আমাদের বাক্য। আমরা সবাই আজ ইউরোপীয় চলতি বুলি বলতে শিখেছি। আমাদের সাহিত্য ও সংবাদপত্র আমাদের সামাজিক জীবন ও আমাদের মানসিক জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়। এর কারণ ইউরোপীয় ভাবের স্পর্শে আমাদের মন গরম হয় বটে, কিন্তু তাতে বলক ওঠে না।

আমি পূর্বে বলেছি যে— La Renaissance Religieuse নামক পুস্তকের লেখকদের মধ্যে দুই-এক জন Orientalist আছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন

Paul-Masson Oursel। এখন তাঁর দু'-চারটি মন্তব্য উল্লেখ করে আমি এ প্রবন্ধ শেষ করব। তাঁর মতে, ইউরোপের সভ্যতা এশিয়ার স্কন্ধে ভর করে কোন সুফল-প্রসূ হয়নি। "কারণ আমরা যে সে দেশে শুধু রেলের গাড়ি ও টেলিফোন রপ্তানি করেছি তাই নয়, কতকগুলি মারাত্মক ism-ও রপ্তানি করেছি, যথা— Capitalism, industrialism, alcoholisme, nationalisme এবং সেই সঙ্গে আমাদের spiritual দৈন্য এবং moral বিশৃঙ্খলতা"— এর ফলে নাকি এশিয়াবাসীর মনে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিই প্রবল হয়েছে। Oursel আরও বলেন যে, "আমরা Orientalist-রা এশিয়ার অতীতকে উদ্ধার করেছি এবং সে অতীতের সঙ্গে বর্তমান এশিয়াবাসীদের পরিচিত করিয়ে দিয়েছি; কিন্তু সে অতীতের প্রতি আমাদের যে কোন রূপ ভক্তি নেই সে সত্য এশিয়াবাসীরা ধরে ফেলেছে।" ফলে এ বিষয়ে তারা আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়। ইউরোপীয় সভ্যতা একটা Asiatic problem-এর সৃষ্টি করেছে মাত্র। Oursel বলেন, ইউরোপ এশিয়াতে তার science পাঠাক, কিন্তু তার মনোভাবের যেন আর রপ্তানি না করে। কিন্তু কী করে তা সম্ভব হতে পারে সে বিষয়ে তিনি নীরব। তিনি আশা করেন যে, relativity যখন বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়েছে তখন জীবনেও স্বীকৃত হবে। সকল সভ্যতাই তার স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা রক্ষা করবে. কেউ অপর সভ্যতার মনের অধীন হবে না। অর্থাৎ মনোজগতেও ঐ Einstein-ই আমাদের আক্কেল দেবে। আমাদের সাহেব হওয়াটা Orientalist-ও বিপজ্জনক মনে করেন।

নি য় তি বা দে র ন ব্য প্র তি বা দ

১

Science,— বাঙলায় আমরা যাকে বলি বিজ্ঞান, সে বিদ্যার যে ইউরোপে জন্ম, তা আমরা সকলেই জানি। আর উনবিংশ শতাব্দীতে এ বিদ্যা যে অপূর্ব ঐশ্বর্য লাভ করেছে, তার প্রমাণ আমরা নব-নব যন্ত্রপাতির প্রসাদে নিত্য প্রত্যক্ষ করছি ও চমৎকৃত হচ্ছি।

এই যন্ত্রারূঢ় বিজ্ঞানকে আর্থিক বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কারণ টাকা করাই যন্ত্রনির্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্য; দেশকালকে সংক্ষিপ্ত করা উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের উপায় মাত্র।

এই আর্থিক বিজ্ঞানের পিছনে আছে পারমার্থিক বিজ্ঞান— ইংরাজরা যাকে বলেন Theoretical Science। কারণ এ বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মিথ্যা জ্ঞান নষ্ট করা। একটি উদাহরণ দেই। পৃথিবী ত্রিকোণ, এ হচ্ছে অবিদ্যার কথা; আর সেটি গোলাকার, এই হচ্ছে বিদ্যার কথা।

যন্ত্রপাতি সব পারমার্থিক বিজ্ঞান থেকে উদ্ভূত হয়ছে, কিম্বা পারমার্থিক বিজ্ঞান যন্ত্র থেকে আবির্ভূত হয়েছে; সংক্ষেপে জ্ঞানের মূল ক্রিয়া, অথবা ক্রিয়ার মূল জ্ঞান, সে আলোচনা বৃথা। আমার ধারণা, machine এবং mechanics শ্রুতিস্মৃতির মতো 'ব্যতিষঙ্গাৎ পরস্পরম্।' তা হলেও আমাদের শাস্ত্রকাররা শ্রুতিকেই মূল বিদ্যা বলে স্বীকার করেছেন। সেই নজিরের বলে আমিও Newton-এর Principia-কে বিজ্ঞানের মূল বলেই গ্রাহ্য করছি। গত যুগের এঞ্জিনীয়াররা তাঁদের আঁকজোখ সব Newton-এর আবিষ্কৃত তত্ত্ববিদ্যার উপরেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে Newton-এর revealed ধর্মই বৈজ্ঞানিকদের সনাতন ধর্ম হয়ে উঠেছিল।

২

উনবিংশ শতাব্দীর এই সনাতন ফিজিক্স এখন নব্য ফিজিক্স হয়ে উঠেছে; যেমন এ দেশে ন্যায়, নব্যন্যায়, অলঙ্কার নব্য অলঙ্কার হয়ে উঠেছিল। আমি 'উঠেছে' বলছি এই জন্য যে, দাঁড়িয়েছে বলা যায় না। নব ফিজিক্সের কোন দাঁড়াবার স্থান

নেই। দেশকালাবচ্ছিন্ন atom-ই ছিল সনাতন ফিজিক্সের অখণ্ড ও নিরেট ভিত্তি। এখন Eddington-লিখিত সুসমাচার শুনুন—

"As for the external objects remorselessly dissected by science, they are studied and measured, but they are never known. Our pursuit of them has led from solid matter to molecules, from molecules to sparsely-scattered electric charges, from electric charges to waves of probatility" (New Pathways in Science, pp 322-323)

এর অর্থ কী বুঝলেন? অর্থ এই—

'ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দু-ধারে।' এ উক্তি কবির কবিত্ব নয়, চরম বিজ্ঞান। এখন জিজ্ঞাস্য— কীসের ঢেউ? ক্ষিত্যপতেজমরুৎব্যোমের নয়— 'সম্ভবে'র। এর নির্গলিতার্থ হচ্ছে, এ বিশ্বে সৎ বস্তু নেই, অসৎ বস্তুও নেই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।।
(গীতা, ২য় অধ্যায়, ১৬শ শ্লোক)

এর থেকে আন্দাজ করছি, ফিজিক্সের সনাতন তত্ত্বদর্শীরা সব সদ্‌বাদী ছিলেন, নব্যেরা হয়েছেন স্যাৎ-বাদী। স্যাৎবাদ এ দেশেও পাষণ্ড মত বলে নিন্দিত ছিল। কারণ ও-মত হচ্ছে বেদবাহ্য জৈন ধর্মের মতো। সে যা-ই হোক, এই নব্য স্যাৎবাদীরা আমাদের নব বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন। এ বিশ্বকে বোধ হয় ধূমজ্যোতির সন্নিপাত বলা যায়। এখন এই স্যাৎ বিশ্বরূপ এক নজর দেখে নেওয়া যাক।

৩

নব-বিজ্ঞানের হাতে পড়ে বিশ্ব বর্তমানে তার স্থূল দেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করেছে। সাদা কথায় বহির্জগতের এখন আর কায়া নেই, আছে শুধু ছায়া (shadows)। অর্থাৎ যা ছিল বাস্তব, এখন তা হয়েছে শুধু সিনেমার ছবি। অভিনয় অবশ্য পুরোদমে সমানই চলছে। শুধু এ অভিনয় atom-এর পুতুলনাচ নয়— প্রতীকের (symbols) ছায়াবাজি।

এ বস্তুশূন্য বিদ্যুৎ-কণাগর্ভ বিশ্বের আকারও বদলে গিয়েছে। এ জড় বিশ্ব অনন্ত বটে, কিন্তু অসীম নয়— সসীম। পটাকাশ এখন ঘটাকাশ হয়ে গিয়েছে। আর তার সীমারেখাও সোজা নয়, বাঁকা। তারপর এই ফাঁকা ও ফাঁপা বিশ্ব নাকি ক্রমে আরও ফেঁপে উঠছে (expanding universe)। নব ফিজিক্সের আদি গুরু Einstein বিশ্বের এই স্ফীতিধর্মে বিশ্বাস করেন না।

আমরাও বলি, 'অলমতি বিস্তারেণ'। এই সসীম বিশ্ব তো অসীম হতে পারবে

না। সরল রেখারই তো ধর্ম প্রসারণ, বক্ররেখার আকুঞ্চন। সে যা-ই হোক, সনাতন ফিজিক্সের উপর একটা বৈজ্ঞানিক দর্শনও গড়ে উঠেছিল, যা অতি সহজ-বোধ্য, অতএব লোকায়ত। কারণ ও-দর্শন আসলে স্পর্শন। Matter এবং motion দু-ই আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য— প্রথমটি ত্বকের, দ্বিতীয়টি পেশীর। এ দর্শন আমাদের common sense, ভাষান্তরে লৌকিক ন্যায়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু নব্য ফিজিক্স common sense-এর সঙ্গে scientific spirit-এর যোগসূত্র ছিন্ন করেছে। কাজেই আমরা নব ফিজিক্সের মধ্যে দিশেহারা হয়ে যাই। বিশ্বের এ অবস্থায় সনাতন বৈজ্ঞানিক দর্শনও অনবস্থা দোষে দুষ্ট হয়েছে। ফলে গত শতাব্দীর সর্বাস্তিবাদ এখন বিজ্ঞানবাদে পরিণত হয়েছে। শূন্যবাদের পরিণাম যে বিজ্ঞানবাদ, তার প্রমাণ নাগার্জুনের উত্তরাধিকারী হচ্ছেন অসঙ্গ। বৌদ্ধ দর্শনের ক্রমবিকাশের ধারাও এই। এখন নব্য ফিজিক্স ও সনাতন ফিজিক্সের সাম্প্রদায়িক কলহের আর-এক কথা শুনুন।

৪

নব্য ফিজিক্স নিয়তিবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে। ইংরাজিতে যাকে determinism বলে, তার 'দেশি নাম বোধ হয় নিয়তিবাদ। Eddington বলেন যে, determinisim-এর অর্থ এই :

> "Yea the first morning of creation wrote
> What the last Dawn of reckoning shall read."
> (Omar Khayyam)

অর্থাৎ উক্ত পারসিক কবির বিশ্বাস ছিল যে, বিশ্বগ্রন্থ ফারসি হরফে লেখা। আমরা এ গ্রন্থের যেটি শেষ পাতা বলে ভুল করি, সেইটেই তার প্রথম পাতা। এ মতের নাম কি নিয়তিবাদ নয়?— ভাষায় যাকে বলে কপালের লেখা। এখন Eddington-এর বক্তব্য শোনা যাক—

"Physical Science is no longer based on determinism. Determinism is often called the law of causality. Nothing is left of the old scheme of causal law." (New Pathways in Science, pp 77-78)

অর্থাৎ আ-মহৎ অণু পর্যন্ত অখিল বিশ্ব যে কার্যকারণের শৃঙ্খলে বাঁধা, তার কোন প্রমাণ নেই। পরমাণুর ভগ্নাংশ অণুগুলি— যাদের চরমাণু বলা যেতে পারে— তারা নেহাত বেপরোয়া ও খামখেয়ালি; আর তাদের লীলাখেলা হচ্ছে লুকোচুরি খেলা। 'ঈশ্বরাসিদ্ধ প্রমাণাভাবাৎ', এ কথা শুনলে ভগবদ্ভক্তের দল যে-রকম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, সনাতনীর দল এ নাস্তিক মত শুনে তেমনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন; বিশেষত তাঁরা যখন তাঁদের আস্তিক মত প্রমাণ করতে পারছেন না, শুধু

করবেন বলে শাসাচ্ছেন। নব্য ফিজিক্সের এ মত সাচ্চা কি ঝুটো, তা আমি বলতে পারিনে, পারেন আমার বন্ধু— শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু। আমি এই পর্যন্ত জানি যে, তর্কটা সেকেলে।

৫

আমাদের দেশেও একমাত্র বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে 'ত্রৈলোক্যং কার্য্যকারণাত্মকং' (বিজ্ঞানভিক্ষু, যোগবার্ত্তিক)। এই সাংখ্য মতই হচ্ছে এ দেশের সনাতন determinism।

তারপর গীতায় পাই বেদান্তজারিত সাংখ্য মত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

"কার্য্যকরণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।।"
(গীতা, ১৩শ অধ্যায়, ২১ শ্লোক)

এই দু'-মুখো মতের ইংরাজি নাম semi-determinism, যা অল্পবিস্তর আমাদের অনেকেরই মত। অর্থাৎ প্রকৃতি কার্যকারণের শৃঙ্খলাবদ্ধ, কিন্তু পুরুষ চিৎশক্তি-বিশিষ্ট বলে মুক্ত।

সনাতন বৈজ্ঞানিকরা অবশ্য এ মত গ্রাহ্য করতে পারেননি, কারণ তাঁরা চেতন-অচেতন সকল বস্তুকেই এক সূত্রে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, আর সে সূত্র হচ্ছে কার্যকারণের সূত্র। কাজেই তাঁরা প্রকৃতির ধর্ম পুরুষে আরোপ করেছিলেন। পুরুষ চিরকালই এ অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু সে প্রতিবাদ লৌকিক— বড়-জোর দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক নয়। কারণ এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের উপরই বিজ্ঞান দাঁড়িয়েছিল। নব্য ফিজিক্স এ অতিদেশ প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ নব-বৈজ্ঞানিকরা পরমাণুর বুক চিরে বেচারাকে খণ্ডবিখণ্ড করে প্রকৃতির অন্তরে এ ধর্মের সাক্ষাৎ পাননি। ফলে বিশ্বের ধ্রুবপদ এখন খেয়ালে পরিণত হয়েছে।

নব্য বিজ্ঞানের এই ফতোয়া শুনে জনৈক পলিটিসিয়ান Sir Herbert Samuel ভীত হয়েছেন। তিনি বলেন যে, এ বৈনাশিক মত যদি গ্রাহ্য হয়, তা হলে লোকযাত্রা বিনষ্ট হবে। কিন্তু এ ভয় তাঁর অমূলক। Electron ও মানুষ স্বাধীন বটে, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ পরমাণু ও সমাজবদ্ধ লোক উভয়েই আচারের অধীন; আর সে আচারের নাম 'গড়পড়তার নিয়ম' বা statistical law— যার উপর জীবন-বিমা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং প্রকৃতি কার্যকারণাত্মক না হলেও আচারভ্রষ্ট নয়। বলা বাহুল্য, অঙ্কজ সূক্ষ্ম প্রকৃতি কার্যকারণের বশীভূত না হলেও, ইন্দ্রিয়গোচর স্থূল প্রকৃতি উক্ত নিয়মের অধীন।

নব্যদের বৈজ্ঞানিক মত যদি সত্য হয়, তা হলে এ বিশ্ব এখন একটা mysterious universe হয়ে উঠেছে। কিন্তু যা কিছু mysterious, আমরা তারই রহস্য ভেদ

করতে চাই। তাই Jeans এখন নব বিজ্ঞানের new background পত্তন করেছেন ও Eddington তার new pathways-এর পরিচয় দিচ্ছেন। অর্থাৎ নব বিজ্ঞানের প্রস্থান-ভূমিও নতুন, আর মার্গও নতুন। এর থেকে বোঝা গেল, সনাতন বিজ্ঞানের জমির জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান। আর এই নব্য পথ হচ্ছে 'মহাজনো যেন গতঃ' সে পথ নয়, এ হচ্ছে 'অতিগণিতে'র (super mathematics-এর) মার্গ। অতিগণিতের প্রসাদে যা পাওয়া যায় তা অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অর্থাৎ অবিজ্ঞেয়। এই সব কথা শুনে একটি কথা মনে হয়। এই নব বিজ্ঞানবাদ ব্রহ্মবাদের গা ঘেঁষে যাচ্ছে। তার কারণ ছায়াবাদ, মায়াবাদের মাসতুতো ভাই। এতে আমাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হবার কথা নয়। কারণ মায়াবাদ তো আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া সনাতন বিজ্ঞানের পূর্বমীমাংসা যখন অপদস্থ হয়েছে, তখন তার উত্তর-মীমাংসাও আবির্ভূত হতে বাধ্য। আর এ মীমাংসার মূল সূত্র হচ্ছে— অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।

যাক— এ সব বিচারবিতর্কে আমাদের ভয় পাবার কোন কথা নেই। বিজ্ঞানের মন্ত্রভাগ উড়ে গেলেও তো তার যন্ত্রভাগ থাকবে। সোভানাল্লা। পৃথিবীর সার বস্তু হচ্ছে যন্ত্রণা,— মন্ত্রণা নয়। আর যন্ত্রমন্ত্র সবই এই যন্ত্রণা লাঘবের জন্য আমাদের মন-গড়া ও হাত-গড়া ফিকির মাত্র।

মার্কস-এর ডায়ালেকটিক

কল্যাণীয়েষু,

তুমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছ যে রুশিয়ার Communism-এর পিছনে একটি ফিলজফি আছে— যা ইতালির Fascism-এর পিছনে নেই।

এ ফিলজফির নাম Dialectical Materialism। এ ফিলজফি যে কী, তা তুমি আমাকে সহজ বাংলায় বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করেছ। আমি তোমার সে অনুরোধ রক্ষা করতে চেষ্টা করব। যদিচ আমি ঐ জোড়ানামের দর্শন নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। তবে আমি যখন একজন সাহিত্যিক, তখন জানি আর না জানি, সব বিষয়েই কথা কইবার আমার অধিকার আছে। যদি ভালো করে বোঝাতে না পারি, তা হলে তার জন্য লজ্জিত হব না, কেননা আমি দর্শনের অধ্যাপক নই।

Dialectical Materialism-এর সন্ধান তুমি বোধ হয় Moscow Dialogues নামক পুস্তকের অন্তরে পেয়েছ। এ বই পড়ে তুমি এ দর্শনের মর্ম উদ্ধার করতে পারনি। আমিও সে বইয়ের পাতা উলটেছি, কিন্তু তার ফলে কোন জ্ঞান লাভ করিনি। গ্রন্থকার নিজে Socratov অর্থাৎ Socrates সেজে Plato-র Dialogues অনুকরণ করেছেন। ও-বই পড়ে আমি এই মাত্র বুঝেছি যে উক্ত ভদ্রলোক মহাদার্শনিক হতে পারেন, কিন্তু লেখক হিসেবে আর্টিস্ট নন। আর Moscow, Athens থেকে বহু দূরে— কালের হিসেবে ও দেশের হিসেবে। উক্ত লেখক শুনতে পাই, জাতিতে রুশীয় ও মানুষ হয়েছেন আমেরিকায়; এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের প্রফেসারি করছেন। বইখানি লিখেছেন বোধ হয় আমেরিকান পাঠকদের জন্য, তাই তাঁর লেখার গায়ে সাহিত্যিক গুণ নেই।

২

আলোচ্য দর্শনের জন্ম জর্মানিতে, আর জন্মদাতা হেগেল। পরে Marx তার নাম বদলেছেন— আর সঙ্গে-সঙ্গে রূপ। আমি আগে সংক্ষেপে এই পুরনো হেগেল-দর্শনের, আর পরে Marx কর্তৃক তার বিকারের পরিচয় দেব। কিন্তু প্রথমেই দুটি কথা বলে রাখি। রুশিয়ার Communism এ দর্শন থেকে উদ্ভূতও নয়, তার উপর

প্রতিষ্ঠিতও নয়। কোন নূতন সামাজিক ব্যবস্থা কোন পুরনো idea-র কথায়-কথায় অনুবাদ হয় না। এই নব Communism-এর সঙ্গে Dialectical Materialism-এর সম্পর্ক হচ্ছে দেহের সঙ্গে বেশের যে-সম্পর্ক, সেই জাতীয়।

Marx-এর গুণগ্রাহী জনৈক খ্যাতনামা দার্শনিক Croce বলেছেন যে, 'Quella bizzarra proposizione di storia della filosofia, che il proletariato sia l'erede della filosofia classica tedesca.' (Materialismo Storica, p. 116)। উপরি-উক্ত কথা ক'টি ইতালীয়, কিন্তু যিনি ইংরাজি জানেন তিনিই এর মানে বুঝতে পারবেন। এই কথা ক'টিকে ভুল বানানের ইংরাজি মনে করতে পার। দুটি শব্দের অর্থ বলে দিচ্ছি। Erede = উত্তরাধিকারী, আর tedesca = জর্মান। এখন হেকার সাহেব এই bizarre proposition-ই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। সুতরাং Communism-এর পাশ কাটিয়ে দর্শনের পরিচয় দেব।

আর-একটি কথা মনে রেখো। বিলেতি দর্শনকে বাঙলা করা অতি কঠিন। ভাষার সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। কারণ এক-একটা বিশেষ দর্শন তার রূপধারণ করে, কতকটা জাতীয় মনের চরিত্র ও কতকটা জাতীয় ভাষার চরিত্র অনুসারে। সুতরাং কোন একটি বিশেষ দর্শনের ভাষা মুখ্য কিম্বা ভাব মুখ্য, তা বলা কঠিন। তারপর দার্শনিক ভাষা মাত্রেই এখানে-ওখানে দানা বাঁধে, আর এই দানাগুলোর নাম পারিভাষিক শব্দ। এক ভাষার পারিভাষিক শব্দ অপর ভাষার পারিভাষিক শব্দে ঠিক অনুবাদ করা যায় না। যায় শুধু ব্যাখ্যা করা, তা-ও অনেক কথায়। মোদ্দা কথা, dialectical শব্দের বাঙলা আমি জানিনে।

৩

হেগেল-দর্শন dialectical idealism বলে পরিচিত। আর এই idealism-এর স্থলে materialism বসিয়ে দিয়েই Marx তাঁর নব-দর্শন খাড়া করেন। তাই হেগেল-দর্শনের পরিচয় প্রথমে দেব। আমার মতো অদার্শনিক সাহিত্যিকের পক্ষে হেগেল-দর্শনের আলোচনা করা দুঃসাহসের কাজ। কিন্তু যে-কাজ এক বার করা যায়, সে কাজ দ্বিতীয় বার করতে ভয় হয় না। আমি যৌবনে এক বার হেগেলের মত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে বাধ্য হয়েছিলুম, বিপিনচন্দ্র পালের কোন লেখার প্রতিবাদ-সূত্রে। সেকালে অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় আমাকে বলেছিলেন যে, আমার কথা মোটামুটি ঠিক। তাই সেই প্রবন্ধ থেকে আমার কথা তুলে দিচ্ছি :

"তিনি (বিপিনবাবু) এমন এক সত্য উদ্ধার করেছেন, যার সাহায্যে সকল বিরোধের সমন্বয় করা যায়। হেগেলের thesis, antithesis ও synthesis, এই ত্রিপদের ভিতর যখন ত্রিলোক ধরা পড়ে, তখন তার অন্তর্ভুক্ত সকল লোক যে ধরা পড়বে, তাতে আর আশ্চর্য কী? হেগেলের মতে লজিকের নিয়ম এই যে,

ভাব (being) ও অভাব (non-being), এ দুটি পরস্পরবিরোধী, আর এ দুটির সমন্বয়ে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে স্বভাব (becoming)। মানুষের মনের সকল মনন-ক্রিয়া এই নিয়মের অধীন, সুতরাং সৃষ্টিপ্রকরণও এই একই নিয়মের অধীন, কারণ এ জগৎ চৈতন্যের লীলা।" (নানা কথা, পৃ. ১৮৮)

অর্থাৎ 'আছে' কথাও নিরর্থক, 'নেই' কথাও নিরর্থক; 'হচ্ছে' এই কথাই সত্য কথা। এই 'হচ্ছে'ই progress-এর মূল। এবং progress করতে আমরা বাধ্য, কারণ তাই হচ্ছে আমাদের কপালের লেখা। আমি অবশ্য এ কথা মানিনে, কারণ কপালের পুঁথি যে-হরফে লেখা, সে অক্ষরের বর্ণপরিচয় আমার হয়নি। তিনের মায়া মানুষে কাটাতে পারে না, কী ধর্মে কী দর্শনে। বোধ হয় triangle হচ্ছে আমাদের মনের প্রকৃতি-দত্ত কাঠামো, যার ভিতর আমাদের সকল জ্ঞান পুরতে হবে। এ হচ্ছে এক রকম বিলেতি সাংখ্যদর্শন।

৪

পূর্বোক্ত প্রবন্ধে হেগেল সম্বন্ধে আরও দু'-চার কথা বলেছি, অবশ্য ভক্তিভরে নয়। সে সব কথা আর এখানে তুলে দিলুম না, পাছে পুঁথি বেড়ে যায়, এই ভয়ে। আর কী বলেছি যদি জানতে চাও তো উক্ত প্রবন্ধ পড়ে দেখো। Dialectical Materialism-এর কুলের খবর দিতে গেলে এর চেয়ে বেশি হেগেল-দর্শনের আলোচনার প্রয়োজন নেই। হেগেল একজন মহাদার্শনিক, কিন্তু তিনি আমার গুরু নন। সুতরাং তাঁর কথা বেশি বলতে গেলে অনেক বাজে কথা বলব।

হেগেলের আবিষ্কৃত এই ত্রিপদী লজিক এবং progress-এর idea সেকালে বহু দার্শনিককে চমৎকৃত করেছিল। কারণ এ লজিক Aristotle-এর লজিককে অতিক্রম করে। আর progress-এর এই অনিবার্যতা progress-কামী বহু লোকের মনে বিরাট আশার সঞ্চার করে।

তবে হেগেল তাঁর লজিকের যে-সব উদাহরণ দিয়েছেন— তা হজম করা কঠিন। ফুল thesis, পাতা antithesis, আর ফল synthesis। আর এর থেকে বোঝা যায় হেগেল contradiction-এর সঙ্গে distinction ঘুলিয়ে ফেলেছেন। আর এই ক্রমবিকশিত এবং ক্রমবর্ধমান progress রাষ্ট্রক্ষেত্রে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল জানো? Croce বলেন— 'But an example fitting our case better is that of the supreme philosopher of the age of which we are speaking, Hegel. More profoundly than any other man, he thought about and treated of dialectics and history. Defining spirit in terms of liberty and liberty in terms of spirit. Yet because of certain of his political tendencies and theories, he deserved to be called servile rather than liberal. (History of the Nineteenth Century, p. 10)

গত বৎসর Croce যে-কথা বলেছেন, আমি প্রায় বিশ বৎসর আগে সেই কথাই বলি, যথা : "হেগেলের ব্রহ্ম শুধু অপরব্রহ্ম নন, তিনি ঐতিহাসিক ব্রহ্ম— অর্থাৎ ইতিহাসের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ক্রমবিকাশ হচ্ছে। হেগেলের মতে তাঁর সমসাময়িক ব্রহ্ম প্রুশিয়া রাজ্যে বিগ্রহবাণ হয়েছিলেন।" (নানা কথা, পৃ. ১৯১)

৫

১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে হেগেল তাঁর এই নূতন মত প্রচার করেন। আর এই Dialectical Idealism-কে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে Marx Dialectical Materialism-এ রূপান্তরিত করেন।

এ materialism-এর মানে কী? আমরা বাঙলায় materialism-কে জড়বাদ বলি। এ অনুবাদ ঠিক নয়। সে যা-ই হোক, materialism শব্দ বিলেতি দর্শনশাস্ত্রে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার আনুপূর্বিক বিচার Lange-এর materialism-এর ইতিহাস নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু সে গ্রন্থে dialectical materialism-এর উল্লেখ পর্যন্ত নেই। এর কারণ বোধ হয় এ materialism— metaphysical materialism নয়। তা হবারও কোন কারণ নেই, কারণ Marx metaphysics লেখেননি, শুধু সমাজের হ্রাসবৃদ্ধি ও বিপর্যয়ের বিচার করেছেন।

যাকে mechanistic materialism বলে, অর্থাৎ এ সৃষ্টি matter এবং motion-এর লীলা— এই মতই আমাদের কাছে সুপরিচিত ও সহজবোধ্য। আর বর্তমানে এ মত শিক্ষিত সমাজের মন অল্পবিস্তর দখল করেছে। প্রমাণ, যখন দার্শনিকরা এ মতের প্রতিবাদ করতেন, তখন আমরা বলতুম যে তাঁরা অনধিকারচর্চা করেছেন— কেননা তাঁরা বৈজ্ঞানিক নন। এবং এ যুগে যখন কোন-কোন বৈজ্ঞানিক উক্ত মতের প্রতিবাদ করেন, তখন আমরা বলি তাঁরা দার্শনিক নন।

Marx-এর materialism— mechanistic materialism নয়। তবে তা কী?— এ যুগে দার্শনিক মহলে তা economic materialism বলেই পরিচিত। Economic materialism যে কী, তা যিনি Marxism-এর ক-খ জানেন তিনিই বুঝবেন।

৬

তবে তা dialectical নামে পরিচিত কেন?— এই জন্যে যে, হেগেলের বিশ্ব-লজিকের সাহায্যেই সিদ্ধ বলে এ মতের মর্যাদা আছে, অন্তত দার্শনিকদের কাছে। হেগেলের মতে, idea-র দ্বারা facts নিয়ন্ত্রিত (determined)। Marx বলেন, তা নয়— facts দ্বারাই idea নিয়ন্ত্রিত। এ একটা মস্ত বদল। এ দুই মতবাদের ভিতর আসমান-জমিন ফারক্। তবে এর থেকে মনে করো না যে, এ মত হেগেলের মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

হেগেলের মৃত্যুর পর হেগেলপন্থী দার্শনিকরা দু'-দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।

এক দক্ষিণমার্গী হেগেলিয়ান, আর-এক বামমার্গী হেগেলিয়ান। এ মার্গভেদ যে হয়েছিল, তার কারণ হেগেল নিজেই নানা উলটাপালটা কথা বলছেন, সুতরাং হেগেল-দর্শনের এই দুই ভাষ্যেরই অবসর আছে। এই বামাচারী হেগেলিয়ানদের মধ্যে Marx অগ্রগণ্য। সে যুগে জর্মানিতে idea-র চাষ অনেক হয়েছিল এবং মনোজগতে দেদার আকাশকুসুম ফুটেছিল। কিন্তু সে ফুল আকাশেই ঝুলে ছিল, মানুষের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনকে তিল মাত্র পরিবর্তিত করতে পারেনি। সুতরাং বহু জর্মান যুবকের মতে উক্ত idealism নিতান্ত ক্লীব দর্শন, অর্থাৎ নিষ্ফল দর্শন।

Marx বলেছেন যে. দর্শনের উদ্দেশ্য বিশ্ব বোঝা নয়, জীবন পরিবর্তন করা। তাই যে-দর্শন হেগেল মাথার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই দর্শনকে তিনি পায়ের উপর খাড়া করলেন। পা চলতে পারে, কারণ তার চলৎশক্তি আছে। এ দেশের ভাষায় বলতে হলে হেগেলের জ্ঞানকাণ্ড তিনি কর্মকাণ্ডে রূপান্তরিত করেন।

৭

Marx চেয়েছিলেন জীবনকে পরিবর্তিত করতে আর সে পরিবর্তন সাধনের উপায় হচ্ছে কর্ম অর্থাৎ action। কারণ শক্তি উদ্বুদ্ধ করা যায় একমাত্র কর্মের দ্বারা। আর তিনি dialectical পদ্ধতিকেই সে কর্মের, একমাত্র পদ্ধতি বলে ধরে নিয়েছিলেন।

ইতিহাস কীসের পরিচয় দেয়?— এই dialectical নিয়মের। ইতিহাসের অন্তরে তিনি যে-dialectics আবিষ্কার করেন, তাকে তিনি materialistic history বলেন। ধনসৃষ্টিই হচ্ছে মানুষের প্রধান কর্ম; আর এ যুগে যখন প্রচুর ধনসৃষ্টি হচ্ছে, তখন এ সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই মানুষের মনও বদলে যাচ্ছে। ইংরাজিতে যাকে বলে production, তারই ফলাফল হচ্ছে Marx-এর প্রধান বিচার্য বস্তু।

ইউরোপে প্রথম ছিল feudalism (thesis), তারপর এল তার antithesis capitalism, আর এই negation-এর negation হচ্ছে socialism। সুতরাং সমাজ socialist হতে বাধ্য। প্রকৃতির এই নিয়ম অনুসারে মানুষের এ যুগে হাতে-কলমে socialistic সমাজ গঠন করা কর্তব্য। আমি এ পত্রে যত দূর সম্ভব সংক্ষেপে ও সহজে dialectical materialism-এর জন্মকথা বলতে চেষ্টা করেছি। এবং সেই সূত্রে হেগেল-দর্শনের হালচালের কথাও বলেছি। তোমার প্রশ্নের আমার উত্তর যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। তার কারণ, কী হেগেল-দর্শন কী Marx-এর সমাজ-দর্শন সহজে ও সংক্ষেপে বলা অসম্ভব। তার প্রমাণ. এ দুই মতবাদ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। আমি এই উভয় দর্শনের শুধু কঙ্কালের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু হেগেল-দর্শন ও Marx-দর্শন কঙ্কালসার নয়। এ উভয় দর্শনেরই বিশাল রক্তমাংসের দেহ, আর উপরন্তু Marx-দর্শনের বুকে muscle আছে।

কোন দার্শনিক মতবাদ বোঝবার আর-এক উপায় আছে, তার criticism পড়া। অবশ্য সে criticism যদি কোন বিশেষজ্ঞ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি লেখকের হয়। Criticism করতে হলে, পূর্বপক্ষের মতের আগে স্থাপন করতে হয়, তারপর তার খণ্ডন করতে হয়।

আধুনিক দার্শনিকরা কেউ dialectical materialism-এর অনুকূল, কেউ প্রতি-কূল, অতএব তার অনেক সমালোচনা করেছেন। তার দু'-একটি পড়লেই উক্ত মতবাদ যে কী, তা অনেকটা বুঝতে পারবে। অবশ্য critic-এর সঙ্গে একমত হবার প্রয়োজন নেই।

এ criticism শাস্ত্র বিপুল, তার মধ্যে একখানি গ্রন্থের এক অধ্যায় তোমাকে পড়তে অনুরোধ করি। সে বই হচ্ছে Bertrand Russell-এর সম্প্রতি প্রকাশিত Freedom and Organisation.

এ বইয়ের প্রধান গুণ হচ্ছে যে এ খানি ইংরাজি ভাষায় লিখিত— যে-ভাষা আমরা লিখতে না পারি, পড়তে পারি। তারপর Bertrand Russell হচ্ছেন অসাধারণ বুদ্ধিমান লেখক। তিনি মনোজগতে কোন্ দলের লোক তা বলা কঠিন, তবে তিনি যে capitalism-এর Advocate General নন, সে কথা নিঃসন্দেহ। উক্ত গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে তিনি dialectical materialism বিচার করেছেন। উক্ত সমালোচনা যে চূড়ান্ত, এমন কথা আমি বলতে চাইনে; তবে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। সেকালে ভারতবর্ষের সভ্যতার শেষ কথা ছিল শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ— আর এ কালে ইউরোপের সভ্যতার গোড়াকার কথা হচ্ছে অশান্তিঃ অশান্তিঃ অশান্তিঃ— মনোজগতেও, সামাজিক জীবনেও। এর কারণ বোধ হয় বিলেতি সভ্যতা হিন্দু সভ্যতার antithesis, আর এ দুই সভ্যতার synthesis হবে পরকালে।

মার্কস-এর ডায়ালেকটিক : কৈফিয়ত

আমি শ্রাবণ মাসের পরিচয়-এ যে-পত্রাকার প্রবন্ধ অথবা প্রবন্ধাকার পত্র প্রকাশিত করি, সেটি যথার্থই পত্র, প্রবন্ধ নয়।

পত্রের সঙ্গে প্রবন্ধের মোটা প্রভেদ এই যে, আমরা পত্র একটি বিশেষ ব্যক্তিকে লিখি আর প্রবন্ধ লিখি তাঁদের জন্য. যাঁরা সে প্রবন্ধ পড়বেন। কে যে অনুগ্রহ করে পড়বেন, তা আগে থাকতে বলা যায় না। তা ছাড়া এই অজানা পাঠকের বিদ্যাবুদ্ধি, মনের চরিত্র লেখকের কাছে সম্পূর্ণ অবিদিত; তিনি পণ্ডিতও হতে পারেন, অপণ্ডিতও হতে পারেন, সমজদারও হতে পারেন, সমালোচকও হতে পারেন— সুতরাং সে পাঠকের মনোমতো লেখা আমরা ইচ্ছে করলেও লিখতে অপারগ। যদি কোন পাঠক আমাদের লেখা প্রবন্ধ পাঠ্য মনে করেন তো সেই অপরিচিত পাঠককে আমরা মনে-মনে বলি, 'গুণী গুণাং বেত্তি।'

তবে এ প্রশ্ন লোকে করতে পারেন যে, পত্রখানি যদি কোন বিশেষ ব্যক্তিকে লেখা হয় তো মাসিক পত্রে সেখানি কেন প্রকাশ করা হল? এর প্রথম কারণ, আমার হস্তাক্ষরের চাইতে ছাপার অক্ষর ঢের বেশি সুখপাঠ্য; আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, হেগেলের dialectics এবং তার মন্ত্রশিষ্য Marx কর্তৃক তার বিচারসাধন সম্বন্ধে আরও পাঁচ জনের কৌতূহল থাকতে পারে— বিশেষত এ মতামত নিয়ে মারামারি-কাটাকাটির যুগে। আজকের দিনে Spain-এ যে-ব্যাপার ঘটছে, তা নাকি Fascism-এর সঙ্গে Communism-এর লড়াই। অবশ্য এ শাস্ত্রবিচার অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে করা হচ্ছে।

উক্ত পত্রাকার প্রবন্ধের একটি স্পষ্ট দোষ ছিল। সে দোষ এই যে, Dialectic Materialism যে কী মত, তা আমি স্পষ্ট করে বোঝাতে পারিনি। পারিনি যে, তার কারণ দু'-কথায় তা বোঝানো যায় না।

উক্ত পত্র আর কেউ পড়েছেন কি-না জানিনে— কিন্তু আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান দেবকুমার চৌধুরী এটি শুধু পড়েননি, critically পড়েছেন। তিনি বলেছেন যে, "তুমি Hegelian logic-এর অল্প কথায় যা ব্যাখ্যা দিয়েছ, তা অতি চমৎকার হয়েছে।" এ কথা শুনে মহা খুশি হয়েছি; কারণ আমি লেখক, কারও মুখে

প্রশংসা শুনলে আমার পক্ষে খুশি হওয়া তো স্বাভাবিক। তবে অপর কোন পাঠক যে শ্রীমানের মতের সঙ্গে একমত হবেন, এ আশা আমি করতে পারিনে।

Dialectics কথাটা ইউরোপের দর্শনের একটা খুব বড় কথা। সমগ্র ইউরোপীয় দর্শনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় না থাকলে, ও-কথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। Croce নামক বিখ্যাত ইতালীয় দার্শনিকের ধারণাও তা-ই। তিনি হেগেল সম্বন্ধে যে-বই লিখেছেন, তার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'Chiarimento circa la Storia della Dialettica.' অর্থাৎ Dialectics কথার ইতিহাস। এই বইয়ের শুনতে পাই ইংরাজি অনুবাদ আছে। যদি কেউ লজিকের এ পদ্ধতি পরিষ্কাব করে বুঝতে চান তো উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়টি পাঠ করবেন। Socrates থেকে আরম্ভ করে হেগেল পর্যন্ত নানা দার্শনিক dialectics কী ভাবে বুঝেছেন, তার ইতিহাস উক্ত দ্বিতীয় অধ্যায়েই আছে। এ কারণ হেগেলের logic-এব মৎকৃত ব্যাখ্যা যে সন্তোষজনক নয়, তা আমি জানি। সে যা-ই হোক, যাঁর জন্য ও-পত্র লেখা, তিনি যখন আমার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েছেন, তখন পত্র হিসেবে আমার লেখা সার্থক হয়েছে।

আমি উক্ত প্রবন্ধে বলি— "রুশিয়ার Communism এ দর্শন থেকে উদ্ভূতও নয়, তার উপর প্রতিষ্ঠিতও নয়।" আমার এ মতের বিরুদ্ধে অনেকে যে আপত্তি করবেন, তা আমি জানতুম। কেননা যাঁরা রুশীয় Communist-দের কাছ থেকে ইউরোপীয় দর্শন শিখেছেন, তাঁদের পক্ষে আমাকে 'কিং স্বাতন্ত্র্যং অবলম্বসে' বলে ধমক দেওয়া স্বাভাবিক। এ কথা জানা সত্ত্বেও আমি এ ক্ষেত্রে কেন স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করেছি, তার কৈফিয়ত দিচ্ছি। কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে যে নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়া হয় না, এই হচ্ছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। Hegel হচ্ছেন একজন মহামহোপাধ্যায় দার্শনিক, আর তাঁর মন্ত্রশিষ্য Marx-ও বামাচারী হেগেলিয়ানদের অগ্রগণ্য। আমাদের শাস্ত্রকাররা বলেন যে বিধিনিষেধ-সম্বলিত হিন্দু ধর্ম 'বেদমূলং', আর Communist শাস্ত্রীরা আজ বলছেন যে রুশীয় Communism 'হেগেলমূলং'। ও-দুটি কথাবই মূল্য এক। যারা নিজের জোরে একটা মত খাড়া করতে পারে না, তারা আবহমান কাল একটি-না-একটি authority-র দোহাই দেয়। রুশীয় Communist-রা যদি হেগেল, Marx-এর দোহাই না দিয়ে বাইবেলের দোহাই দিতেন, তা হলে আর ইউরোপীয়রা এই নব Communism-এর এতটা প্রতিকূল হত না। আর সে দোহাই যে দেওয়া যায়, তা যিনি যিশুখ্রিস্টের বচনের সঙ্গে পরিচিত, তিনিই স্বীকার করবেন। বিশেষত যখন আদি খ্রিস্টান সম্প্রদায় ছিল আদি Communist সম্প্রদায়। তাঁরা যে কেন বাইবেলের দোহাই দেননি, তার সন্ধান পাওয়া যাবে ইতিহাসের অন্তরে, কোন দর্শনের অন্তরে নয়। আমরা এ যুগের শিক্ষিত লোকেরা যে authority মানিনে, এমন কথা বলবার স্পর্ধা আমার নেই। শিক্ষা মানেই পূর্বাচার্যদের বই পড়ে শিক্ষা, অর্থাৎ পরের মুখে শুনে শেখা।

তাই বলে বিলেতি রাম-শ্যাম-যদু-হরি যে-বই লেখে, তাকেই আমরা authority বলে ধরে নিতে পারিনে। আমি জানি যে, এ কালে আমাদের authority একমূল নয়— শতমূল। এর ফলে আমাদের মনের প্রবণতা scepticism-এর দিকে, dogmatism-এর দিকে নয়। এই দুটি কথা বলে আমার কৈফিয়ত শুরু করছি।

শ্রীমান দেবকুমার যাঁদের authority দেখিয়েছেন, তাঁদেরও আমি very pleased to meet you বলেছি, অর্থাৎ তাঁদের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। MacMurray Moscow Dialogues-এর মুখপত্র লিখেছেন, আর লিখেছেন Communist (Bolshevik?) Philosophy নামক পুস্তিকা, যে-পুস্তক থেকে শ্রীমান তাঁর authority উদ্ধৃত করেছেন। এখন শ্রীমানকে জিজ্ঞাসা করি, MacMurray সাহেব কি Communism-এ বিশ্বাস করেন?— তা যে তিনি করেন না, তার প্রমাণ তাঁর সদ্যপ্রকাশিত পুস্তকে স্পষ্ট পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে তিনি এই মত broadcast করেছেন যে— Bolshevism and Fascism are the two ideals, which rest upon the deification of organised society. Both of them believe that social service is the true moral ideal, that a man's whole goodness consists in being a good citizen. In repudiating social morality as a false morality– I am repudiating Bolshevism and Fascism equally. (Freedom in the Modern World)

MacMurray সাহেব অবশ্য ও-কথার পিঠ-পিঠ বলেছেন যে— If I had to choose between the two, I should I confess, choose Bolshevism; because it repudiates the belief in mere wealth. But I don't want either. অর্থাৎ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপকের মতে Bolshevism এবং Fascism, উভয়ই একই বৃন্তে দুটি ফুল। যদি তিনি বাধ্য হতেন, তা হলে তিনি এ দুয়ের মধ্যে লাল ফুলটি তুলতেন, কালোটি নয়। এ মত রুশীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের সপক্ষে, না বিপক্ষে।

আমি যে-বিষয়ে আলোচনা করেছি, সে হচ্ছে এই নব communism-এর সঙ্গে Hegel-এর dialectics-এর কী সম্বন্ধ। আমার বক্তব্য ছিল এই যে, communism-এর সঙ্গে একটি ফিলজফি আছে,— Fascism ফিলজফি-ছুট। আর সেই ফিলজফিটি যে কী, তাই বলবার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপার হচ্ছে এক রকম শাস্ত্র-বিচার। এ বিচারের বিশেষ কোন সার্থকতা নেই; নিজের idea একটু পরিষ্কার করা ছাড়া।

এ বিচার আমার পক্ষে সত্য-সত্যই অনধিকারচর্চা। হেগেল-দর্শন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ভাসা-ভাসা, আর Marx-দর্শন সম্বন্ধে আমি বরাবরই সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এর ফলে আমি দু'-একজন বিশেষজ্ঞের শরণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। Croce-ই আমার প্রধান authority। Marx-এর মতামতের পরিচয় আমি প্রথম Croce-এর লেখাতেই পাই।

Croce যে এ যুগের একজন প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক, তা অনেকেই জানেন, কিন্তু তিনি যে Marxism-এর জনৈক আদি প্রচারক, তা হয়তো সকলে জানেন না। তিনি ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৬ পর্যন্ত Marx-এর দর্শনের critical আলোচনা করেন এবং ১৮৯৬ সালে তাঁর এ বিষয়ে লেখাগুলি একত্র করে Materialismo Storico নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের মুখপত্রে তিনি লিখেছেন যে, তাঁকে লোকে orthodox মার্ক্সিস্ট বলে গণ্য করে; যদিচ তিনি প্রথম থেকেই Marx-এর মতামতের কোন্‌টি গ্রাহ্য আর কোন্‌টি অগ্রাহ্য, তার বিচার করেছেন। উক্ত গ্রন্থে শুধু Marx নয়, মার্ক্সপন্থী বহু জর্মান, ইটালিয়ান ও ফরাসি দার্শনিকেরও মতের বিচার আছে। তিনি যে Marx-কে কত দূর শ্রদ্ধা করতেন তার নিদর্শন, তিনি Marx-এর funeral-এ যোগদান করবার জন্য ইতালি থেকে ইংলন্ডে যান। আর আজও যে তিনি Fascist হননি— তার প্রমাণ Mussolini তাঁকে নজরবন্দি করে রেখেছেন। সুতরাং Croce-র পদানুসরণ করে আমি সম্ভবত বিপথে যাইনি। আর Croce-র মত হচ্ছে যে, রুশীয় Communism-এর সঙ্গে হেগেলের Dialectics-এর সম্বন্ধ হচ্ছে, দেহের সঙ্গে বেশের সম্বন্ধ। তাঁর বৃদ্ধ বয়সের লেখা History of Europe in the Nineteenth Century নামক পুস্তকে Communism-এর বিচার ছড়ানো আছে। Croce অবশ্য Communism গ্রাহ্য করেন না, কিন্তু Fascism-ও প্রত্যাখ্যান করেন। তবে তিনি কোন্ ism-এ বিশ্বাস করেন?— এ দুই ছাড়া কি পৃথিবীতে অপর কোন ism নেই, বা থাকতে পারে না? এ দুই ism হচ্ছে dogmatism। আমি পূর্বে বলেছি, এ যুগে কোন রূপ dogmatism গ্রাহ্য করতে পারিনে; পেয়াদায় না করালে।

আমি পূর্ব-প্রবন্ধে Croce ব্যতীত আর-এক জনের দোহাই দিয়েছি, তাঁর নাম Bertrand Russell. আমি অবশ্য তাঁর চেলা নই। তা যে নই, তার প্রমাণ আমার পূর্ব-পূর্ব প্রবন্ধে পাঠকরা পাবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, তাঁর তুল্য বুদ্ধিমান লোক, অন্তত লেখক ইংলন্ডে আর দ্বিতীয় নেই। আর তাঁর লেখা খোলা তলওয়ারের মতো যুগপৎ উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ।

Croce হেগেল সম্বন্ধে যে-বইখানি লিখেছেন, তার নাম Cio Che E Vivo, Cio Che E Morto, della Filosofia di Hegel. অর্থাৎ হেগেল-দর্শনের কোন অংশ জীবিত ও কোন অংশ মৃত। Bertrand Russell Marx সম্বন্ধে যে-চারটি অধ্যায় লিখেছেন, তারও নাম দেওয়া যেতে পারে— Marx-মতের কোন অংশ মৃত ও কোন অংশ জীবিত। Russell বিদ্রূপে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু এ লেখায় বিদ্রূপ নেই, আছে শুধু বিচার। যাঁরা Marx-দর্শন সম্বন্ধে কিছু জানতে চান, তাঁদের আমি এই বই পড়তে অনুরোধ করেছিলাম। এ অনুরোধ অন্যায় নয়, কারণ যাঁদের ইচ্ছা কোন-কিছু পড়ব না, অথচ সবই জানব— আমি তাঁদের দলভুক্ত নই। তবে শাস্ত্র-

মার্গে ক্লেশ করা অনেকের পক্ষে যে নরকভোগ মাত্র, তা আমি জানি। তাই উক্ত গ্রন্থ থেকে ক'টি ছত্র আমি নিচে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

১. The communist doctrine must be regarded as a relic of Victorianism.

২. Marx's dialectics is no more revolutionary than that of Hegel.

৩. The belief that metaphysics has any bearing upon practical affairs, is to my mind a proof of logical incapacity.

৪. Whenever metaphysics is really useful in reaching a conclusion, that is because the conclusion cannot be reached by scientific means, i.e. because there is no good reason to suppose it true.

৫. The efforts of Communists may be stimulated by the belief that there is a God called Dialectic Materialism.

রুশীয় Communism-এর সঙ্গে Dialectical Materialism-এর যে প্রাণের যোগ নেই, এমন কথা বলায় আমি যদি এই নবধর্ম সম্বন্ধে কোন পাষণ্ড মত প্রচার করে থাকি তো তার কারণ আমি 'মহাজনো যেন গতাঃ সৈব পন্থা' এই কথা মেনে নিয়েছি। এর কারণ আমার বিশ্বাস যে, আমার মতো খুদ্র সাহিত্যিকের পক্ষে নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহ্য়নায়। আমি পূর্ব পত্রে বলেছি যে, আমি এ বিচারে Communism-এর পাশ কাটিয়ে গিয়েছি। কারণ Communism-এর ইতিহাস— that's another story. আর সে ইতিহাস লিখতে হলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লিখতে হয়;— যা লেখবার ধৈর্য আমার নেই, আর তা পড়বার ধৈর্যও কারও নেই।

From Hegel to Marx

গত মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায় 'Hegel to Marx' নামক পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা পড়ে আমি তাদৃশ মুগ্ধ হইনি। একটি কারণ উক্ত প্রবন্ধে আমার প্রতি কতকগুলি অপ্রিয় কথা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। যে-ক'টি কথা না বললেও Marx-এর দার্শনিক মাহাত্ম্য কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। কথা ক'টি এই : "সুতরাং এ সমস্ত বইয়ের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত না হয়ে মার্কসীয় বস্তুবাদ সম্বন্ধে সমালোচনা করা চিন্তাহীন পল্লবগ্রাহিতা মাত্র।" তথাস্তু। উপরন্তু তিনি লিখেছেন— "বাঙ্গলায় এ বিষয়ে দু-একটি লেখা অনতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে অগভীর চিন্তা ও অসার রসিকতা ভিন্ন আর কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায় না। এটা বাঙ্গালী লেখক ও পাঠকদের লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়।"

এ স্থলে আমার নাম উল্লেখ না করলেও, লেখকের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। আমার লেখা যে অগভীর ও অসার রসিকতাপূর্ণ, এ অভিযোগ পূর্বেও শুনেছি। এ অপবাদ আমার এক রকম অঙ্গের ভূষণ হয়ে পড়েছে। সুতরাং এ অপবাদ সম্বন্ধে আমার পাঠক সমাজের কাছে কোন রূপ জবাবদিহি নেই। কিন্তু আমার লেখা কী কারণে যে পাঠকদের লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়, তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমার লেখার জন্য যদি কারও লজ্জিত হতে হয়, তা হলে সে ব্যক্তি হচ্ছে স্বয়ং আমি। কিন্তু আমার চিন্তাহীনতার জন্য পাঠক কেন লজ্জিত হবেন এবং পরিতাপ করবেন, তার লজিকও বুঝতে পারলুম না। কারণ উক্ত পাঠক সম্প্রদায়ের ভিতর তো 'পরিচয়ে'র লেখকদের মতো গুরুগম্ভীর পাঠকও আছেন যিনি গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়ে স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করতে পারেন।

উক্ত পুস্তক-পরিচায়ক মহাশয় আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে সুবিচার করেছেন কিম্বা অবিচার করেছেন, সেটা একটি তুচ্ছ কথা। তিনি যে-পুস্তকখানির সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের পরিচিত করতে চেয়েছেন— সেই পুস্তকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব, কারণ লেখক মহাশয় উক্ত অতি-গভীর গ্রন্থের অতি-গভীর বক্তব্যের বিশেষ কোন পরিচয় দেননি। আমার পূর্ব-প্রবন্ধ পড়ে যাঁরা লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিই। আমি আমার প্রবন্ধে Marxism সম্বন্ধে দুটি ইউ-

রোপীয় লেখকের বক্তব্য উল্লেখ করি; তাঁদের একজনের নাম হচ্ছে Bertrand Russell, অপরের Benedetto Croce। এ উভয়ের কেউই চিন্তাহীন পল্লবগ্রাহী লেখক বলে ইউরোপে নিন্দিত নন। সুতরাং তাঁদের লেখা থেকে দুটি-একটি কথা আবার উদ্ধৃত করে দেব। বাঙালি বিশেষজ্ঞদের মতে এ রকম কথা বলায় যদি কেহ নিন্দার ভাগী হন, তা হলে, হবেন Croce এবং Russell। অবশ্য এঁদের এ বিষয়ে জ্ঞান 'From Hegel to Marx' নামক পুস্তকের দ্বারা আলোকিত হয়নি, কেননা এ পুস্তক মার্কিন দেশে ভূমিষ্ঠ হয়েছে গত বৎসর। Hook সাহেবের পূর্ব-গ্রন্থের সঙ্গে কিন্তু Russell সাহেবের পরিচয় আছে। এখন প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাক।

Hook সাহেব লিখেছেন Marx-এর intellectual biography অর্থাৎ অপর neo-Hegelian-দের সঙ্গে তাঁর মানসিক সম্বন্ধ বিচার করেছেন।

Russell বলেন যে— "By the time his doctrine was completed, it combined elements of value from three countries, Germany made him a system-builder, France made him a revolutionary and England made him learned." (Freedom and Organisation, p 205)

এখন Croce-এর কথা শুনুন—

"Philosophy, particularly in the Hegelian school of the left, took up the concepts of Saint Simon and Fourier, and endeavoured to translate them into speculative and dialectical terms." (History of Europe in the Nineteenth Century, p. 147)

অতএব দাঁড়াল এই যে, Hook সাহেব এই neo-Hegelian মতামতেরই পরিচয় দিতে চেয়েছেন। বাঙালি পাঠকেরা কি neo-Hegelian মতামত জানবার জন্য এতই উৎসুক যে, এই অতি-গভীর ও দুর্বোধ্য দর্শনের ভিতর হাবুডুবু খেতে রাজি হবেন?

যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, 'পরিচয়ে'র পাঠকদের মধ্যে এমন দুঃসাহসিক পাঠক আছেন, যাঁদের motto হচ্ছে, 'ডুবেছি না ডুবতে আছি, দেখি পাতাল কত দূর,' তা হলে বলি যে, গোস্বামী মহাশয়ের উক্ত গভীর ও দুর্বোধ্য প্রবন্ধ তাঁদের মনস্কামনা সিদ্ধ করতে পারবে না। কারণ গোস্বামী মহাশয় Neo-Hegelism-এর ইন্দ্রচন্দ্রবায়ুবরুণদের শুধু নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের কোন পরিচয় দেননি। সে নামগুলি এই— স্ট্রাউস, ব্রুনো বাউয়ার, মার্কস স্টার্নার, মোজেস হেস। এদের দর্শনের তিনি যে পরিচয় দেননি, তার কারণ 'ফয়েরবাখের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিত প্রস্তাবে তার দার্শনিক প্রকাশ সম্ভব হয়।' এ কথার অর্থ কী? উক্ত 'হয়'কে 'নয়' করে কি এর পাঠ উদ্ধার করতে হবে। এমনও হতে পারে যে, গোস্বামী মহাশয় From Hegel to Marx নামক পুস্তকখানি আরবি কেতাবের মতো শেষ

অধ্যায় থেকে পড়তে আরম্ভ করেছেন, এখনও এর প্রথম দিকটেতে পৌঁছতে পারেননি। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। উক্ত শেষ অধ্যায়ে বর্ণিত ফয়েরবাখের একাদশ সূত্রে তিনি এমন জড়িয়ে পড়েছেন যে তিনি আর এগুতে পারেননি— সুমুখে কিম্বা পিছনে।

সে যা-ই হোক, আমি দু'-কথায় উক্ত মহা দার্শনিকদের পরিচয় দিচ্ছি, তার থেকেই আপনারা তাদের মনের রূপগুণের কিঞ্চিৎ আভাস পাবেন।

১. Strauss— একখানি বই লেখেন যার নাম হচ্ছে 'Leben Jesus', George Elfit বহু কাল পূর্বে তার ইংরাজি অনুবাদ করেন। এ বইয়ের মোদ্দা কথা হল এই যে, বাইবেলের কথা যখন উলটোপালটা, তখন খ্রিস্টধর্ম অগ্রাহ্য। এ বইখানি খ্রিস্ট-লজির আদি গ্রন্থ— Communism-এর নয়।

২. Bruno Bauer— স্ট্রাউসের উপর এককাঠি বাড়েন। তিনি শুধু যিশুখ্রিস্টকে উড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, নিজেকে নাস্তিক বলে জাহির করেন এবং একটি নাস্তিক সম্প্রদায় গড়বার চেষ্টা করেন। মার্কস প্রথমে এ সম্প্রদায়ের মেম্বর হন, পরে নিজের নাম কাটিয়ে নেন। এঁর ফিলজফির সারমর্ম হচ্ছে— Criticise everything, do nothing.

৩. Stirner— ছিলেন কোন বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আর তাঁর মত হচ্ছে— Freedom-এর অর্থ হচ্ছে 'Freedom to do', অর্থাৎ যথেচ্ছাচারই হচ্ছে স্বাধীনতা। স্ট্রাউস যেমন ধর্ম উড়িয়ে দিয়েছিলেন, ইনি তেমনি morality উড়িয়ে দেন। এঁর মত philosophical anarchism বলেই পরিচিত, অর্থাৎ Communism-এর সম্পূর্ণ বিরোধী।

৪. Hess হচ্ছেন Engels-এর দীক্ষাগুরু এবং সম্ভবত মার্কসেরও। মার্কসের প্রসিদ্ধ পুস্তক— German Ideology-র অনেক অংশ— Hess-এর লেখা। ইনি ছিলেন ইহুদি এবং communistic মৌলবি বলেই পরিচিত। পরে মার্কস এই মৌলবি সাহেবকে Communist manifesto-তে ঘোরতর আক্রমণ করেন। Hook বলেন, এ আক্রমণ অযথা এবং অন্যায়। Hess-এর অপরাধ এই যে, তাঁর মত আগে moral revolution, পরে social revolution।

গোস্বামী মহাশয় মার্কসের আর-একটি সহকর্মীর নাম উল্লেখ করেননি। এবং Ruge-র বিষয় আমিও নীরব থাকব।

ফয়েরবাখের বিষয়ও আমি উচ্চবাচ্য করব না, কেননা গোস্বামী মহাশয় শাসিয়েছেন যে উক্ত দার্শনিকের এগারো সূত্রের তিনি পরে গভীর আলোচনা করবেন। শুধু একটি কথা বলে রাখি যে, মার্কসের doctrine-এর গভীর পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক, কারণ মার্কস বহু বার বলেছেন যে তিনি যা প্রচার করেছেন— তা doctrine নয়— movement মাত্র।

রচনানির্দেশ ও প্রাসঙ্গিক টীকা

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য। প্রথম প্রকাশ : 'কল্লোল', বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, বৈশাখ ১৩৩২, পৃ. ৮২-৮৮। বীরবল ছদ্মনামে প্রকাশিত।

বীরবলী ভাষা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী অন্যত্র বলেছেন, "...বীরবলী বলে কোনও বিশেষ ভাষা নেই। বীরবলের লেখার ভিতর যদি কোনও বিশেষত্ব থাকে ত সে ভাষার নয়, ভঙ্গীর। আর যদি মুখের ভাষা সাহিত্যে প্রমোশন পেলে তার নাম হয় 'বীরবলী', তা হলে সে ভাষা স্কুলে আজ কেউ পড়াবে না, তবে স্কুলে ছেলেরা যদি সাধু ভাষা পড়ে তাহলে তারা বীরবলী ভাষাতেই লিখবে। আমাদের সাহিত্যগগনে 'সততসঞ্চারমান নবজলধরপটল'— আর দেখা দেবে না।" দ্র. "বীরবলের পত্র", 'শঙ্খ', ২৬ আষাঢ় ১৩২৯, পৃ. ২১৪।

Faust . "Infinite Nauture, where shall I grasp thee" · এই লাইনটি গ্যয়টে-র 'Tragedy of Faust' নাটক থেকে নেওয়া। লাইনটি হল : "Where shall I grasp thee, infinite nature, where?' (Part I Night)

বস্তুতন্ত্রতা : বাংলা সাহিত্যে 'বস্তুতন্ত্রত' কথাটি প্রথম তোলেন বিপিনচন্দ্র পাল। 'বঙ্গদর্শন' (চৈত্র ১৩১৮)-এ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে তিনি বস্তুতন্ত্রতাহীন বলেছিলেন। ড. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ও কিছু দিন পর ঐ একই কথা তোলেন। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের ("সাহিত্যে বাস্তবতা", 'সবুজ পত্র', ১৩২১, পৃ. ৬৯৮-৭১০) প্রতিবাদে প্রমথ চৌধুরী 'সবুজ পত্র'-এ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দ্র. "বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি?" 'সবুজ পত্র', বর্ষ ১, সংখ্যা ১০, মাঘ ১৩২১, পৃ. ৭১১-৭২৮।

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' (কাব্য) ও 'ঘরে বাইরে' (উপন্যাস) প্রকাশিত হয় ১৯১৬-য়।

ধ্বন্যালোক : সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র, লেখক কাশ্মীরের আনন্দবর্ধনাচার্য। প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় : ধ্বনি-ই কাব্যের প্রাণ। যাঁরা ধ্বন্যালোক-এর সমর্থক, তাদের বলা হয় ধ্বনি বা ধ্বনিক সম্প্রদায়।

সমালোচনা। প্রথম প্রকাশ : 'কল্লোল', বর্ষ ৪, সংখ্যা ৬, আশ্বিন ১৩৩৩, পৃ. ৩৪৫-৩৪৭।

বিদ্যাসুন্দর : ভারতচন্দ্র রায়ের রচিত বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়কাহিনী নিয়ে বাংলা কাব্য। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন প্রমুখ 'বিদ্যাসুন্দরকাব্য' লেখেন।

গুণী গুণং বেত্তি : শ্লোকটি হল— গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণো/ বলী বলং বেত্তি ন

বেত্তি নির্বলঃ।/ পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ/ করী চ সিংহস্য বলং ন মূষিকঃ।। বঙ্গার্থ : গুণী ব্যক্তি গুণবানের গুণ বুঝতে পারে, কিন্তু নির্গুণ তা বুঝতে পারে না। বলবান ব্যক্তিই বলীর বল বুঝতে পারে, দুর্বল পারে না। কোকিলই বসন্তের গুণ বুঝতে পারে, কাক পারে না। সিংহ হাতির শক্তি বুঝতে পারে, ইঁদুর তা পারে না।

মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদা : মৌমাছি মধুই চায়।

Bertrand Russell-এর উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে 'On Education Especially in Early Childhood' (London : George Allen, 1926) নামক বইটি থেকে।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (৫.১০.১৮৯৪-৫.১২.১৯৬১) : লেখক ও গায়ক। 'সবুজ পত্র' গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : অন্তঃশীলা, আমরা ও তাঁহারা, আবর্ত, মনে এলো, Basic Concept of Sociology, On Indian History ইত্যাদি।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সমালোচনাটি বেরয় 'কল্লোল' (বর্ষ ৪, সংখ্যা ৫, ভাদ্র ১৩৩৩, পৃ. ২৬১-২৬৮)-এ। লেখাটির নাম "বর্ত্তমান গদ্য সাহিত্যে তিন খানি ভালো বই"। বই তিনটি হল সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'ঐন্দ্রজালিক', পরশুরামের 'গড্ডলিকা' আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'অতসী'।

প্রমথ চৌধুরী পরশুরামের 'গড্ডলিকা'র প্রশংসা করেন 'সবুজ পত্র' (বর্ষ ৯, সংখ্যা ৪, অগ্রহায়ণ ১৩৩২, পৃ. ২৮১-২৮৪)-য়।

অভিভাষণ। [দিল্লী প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত]। প্রকাশ : 'সবুজ পত্র', বর্ষ ১০, সংখ্যা ৫, মাঘ ১৩৩৩, পৃ. ২৬৭-৩০১; 'মাসিক বসুমতী', বর্ষ ৫, খণ্ড ২, সংখ্যা ৩, পৌষ ১৩৩৫; পৃ. ৩৫৪-৩৬৬; 'আত্মশক্তি' [নবপর্যায়], বর্ষ ১, সংখ্যা ৩৬, ১৬ পৌষ ১৩৩৩ এবং বর্ষ ১, সংখ্যা ৩৭, ২৩ পৌষ ১৩৩৩।

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী... বামনঃ। ('রঘুবংশম'। প্রথমঃ সর্গঃ শ্লোক ৩)। বঙ্গার্থ : উন্নত তরুস্থিত কোনও ফল উন্নত শরীরধারী পুরুষই পাড়িতে পারে, লোভবশতঃ কোনও বামন যদি তাহা পাড়িবার জন্য বাহু উত্তোলন করে, তবে লোক-সমাজে সে উপ-হাসাস্পদই হয়। তদ্রূপ নির্ব্বোধ আমি যে অমর কবিদিগের যশঃস্পৃহা করিতেছি, ইহাতে আমিও উপহাসিত হইব— সন্দেহ নাই।। ৩।। ('কালিদাসের গ্রন্থাবলী'। [বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ] প্রথম ভাগ, সম্পা. পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, দশম সংস্করণ, ১৩৫৬ [চতুর্থ সংস্করণ হতে পুনর্মুদ্রিত]।

পুরাণমিত্যেব ন... পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ। ('মালবিকাগ্নিমিত্রম', শ্লোক ৬)। বঙ্গার্থ : "যাহা কিছু পুরাতন, সেই সবই ভালো আর যাহা কিছু নূতন, তাহাই নিন্দার্হ,— এমন একটা সাধারণ নিয়ম হইতেই পারে না। যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া ভালোমন্দ ঠিক করেন, যাহারা মূঢ় অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত, তাহারাই পরের মুখে ঝাল খাইয়া থাকে।" ('কালিদাসের গ্রন্থাবলী')।

দিলীপ রায় (১৮৯৭-৬.১.১৯৮০) : গায়ক, কবি ও সুরকার। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর পুত্র। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকা (কলকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৩৩৩) ও আবার ভ্রাম্যমাণ (মিত্রালয়, ১৩৫১), দোলা, দ্বিচারিণী, ভূস্বর্গ চঞ্চল ও সুরবিহার। 'ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকা'র ভূমিকা লেখেন প্রমথ চৌধুরী। পরে এটির তিনি সমালোচনাও করে ছিলেন।

Vanity of vanities . King Jame's Version of Ecclesiastes 1.2 says . Vanity of vanities, saith the preacher, vanity of vanities, all is vanity. বাইবেলের এই কথাটি প্রমথ চৌধুরী প্রায়শই ব্যবহার করতেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চলমান জীবন' (প্রথম পর্ব)-এ এ কথা জানা যায় : "...কিছু দিন ধরে ঠিক মত লিখে উঠতে পারছিনে। লেখার হাত ক্রমশ গুটিয়ে নিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের লেখাও পাচ্ছিনে তেমন; কিসের উপর নির্ভর করে চলব? "...আমি আজ পাঁচ বছর ধরে আমার প্রকৃতির অপ্রবৃত্তির সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে আসছি। ফলে একেবারে শ্রান্ত ক্লান্ত বিষণ্ণ অবসন্ন হয়ে পড়েছি। আলস্য যখন দেহকে আর অবসাদ যখন মনকে একসঙ্গে পেয়ে বসে তখন লেখক মাত্রেরই অন্তত কিছু দিনের জন্য ছুটি নেওয়া দরকার। তাতে শুধু লেখকের নয়, সাহিত্যেরও উপকার হয়। আমার কি মনে হচ্ছে জান, পবিত্র? Vanity of vanities; all is vanity"

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন হয়েছিল ১৩২১ (১৯১৪)-এ। প্রসঙ্গত, এ সময়ে 'সবুজ পত্র'য় চলিত গদ্যর জন্য সওয়াল করলেও আয়োজকদের অনুরোধে প্রমথ চৌধুরী অভিভাষণটি সাধু ভাষায় লিখেছিলেন।

১৯২৩-২৬-এর মধ্যে ভারতবর্ষে নানা স্থানে (যেমন গুলবার্গা, কোহাট, লক্ষ্ণৌ, সাজাহান-পুর) হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে-দাঙ্গা ও হানাহানি হয়, তার কথাই এখানে ব্যক্ত।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (২৬.১১.১৮৯০-২৯.৫.১৯৭৭): লেখক, ভাষাতত্ত্ববিদ্। 'সবুজ পত্র' গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন। উল্লেখযোগ্য রচনা : দ্বীপময় ভারত, The Origin and Development of the Bengali Language (1926)।

অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল : কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের তৃতীয় খণ্ড থেকে উদ্ধৃত। 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, পৃ. ৩৭৬।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন... কাব্যরস লয়ে। : দ্র. 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী', পৃ. ৩৭৭।

ভোজরাজ : সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রী। ইনি প্রাচীন আলঙ্কারিক দলের (যেমন ভামহ, দণ্ডী, রুদ্রক প্রমুখ) মতাবলম্বী ছিলেন।

দণ্ডী : আলঙ্কারিক (খ্রি. ৬ষ্ঠ শতক)। বিখ্যাত গ্রন্থ : কাব্যাদর্শ, দশকুমারচরিত।

প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে কর্তা ও ভোক্তার বিষয়টি উল্লেখ করে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন (২৩.৪.১৯১৭) হারীতকৃষ্ণ দেব-কে। দ্র. 'সবুজ পাতার ডাক', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৯৭, পৃ. ১৩০-১৩২।

Gibbon, Edward (1737-1794) : ইংরেজ ইতিহাসবিদ ও পার্লামেন্টের সদস্য। বিখ্যাত বই : The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776-1788, 6 vols)।

Mommsen, Theodor (1817-1903) : প্রখ্যাত জার্মান ইতিহাসবিদ, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ্। ১৯০২-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। বিখ্যাত বই : History of Rome (1854, 1855, 1856, 3 vols), Corpus Inscriptionum Latinarum (1861), The Provinces of the Roman Empire for Cæsar to Diocletian (1885)।

Machiavelli, Niccolo (1469-1527) : ইতালীয় লেখক ও রাজনীতিবিদ্। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : The Prince [Il principe] (1613), Discorsi (1531)।

Rousseau, J. Jacques (1712-1778) : ফরাসি দার্শনিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : The Social Contract [Du Contrat Social, 1762], Emile (1762)।

Freud, Sigmund (1856-1939) : মনোবিজ্ঞানী ও মনোবিশ্লেষণের প্রবক্তা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : The Interpretation of Dreams (1900), Totem and Taboo (1913), The Future of an Illusion (1927)।

Bacon, Francis (1561-1626) : ইংরেজ লেখক, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Essays or Counsels, Civil and Moral (1597), The Advancement of Learning (1605), Novum Organum Scientiarum (1620)।

রামপ্রসাদ সেন (আনু. ১৭২০-১৭৮১) : সুপ্রসিদ্ধ কালীসাধক, তান্ত্রিক উপাসক, শ্যামা-সঙ্গীত রচয়িতা ও গায়ক। তিনিও একটি 'বিদ্যাসুন্দরকাব্য' রচনা করেন ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেন।

নব-সাহিত্যের আগমন। প্রকাশ : 'মাসিক বসুমতী', বর্ষ ৬, খণ্ড ২, সংখ্যা ৬, চৈত্র ১৩৩৪, পৃ. ৯৩৩-৯৩৬। বীরবল ছদ্মনামে প্রকাশিত।

নয়ী আয়ী পুরানীকে দূর করো রে। : প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আত্মকথা'র দ্বিতীয় খণ্ডে এই গানটির কথা উল্লেখ করেছেন (মনফকিরা সংস্করণ, পৃ. ৮৫-৮৬)। তার আগে গানটি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে লিখেছিলেন 'বাঁশরী' পত্রিকায় : পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে একটি মুসলমান ওস্তাদের মুখে শোনা একটি হিন্দুস্থানী গান আজ আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ও গান আমি শুনি সিমলা পাহাড়ে। ...আমাদের কাতর ভাব দেখে ওস্তাদজি জিজ্ঞাসা করলেন— "কুচ দেশী গান গায়ে গা? ঠুংরী হো, হোরী হো, কাজরি হো, লাউনি হো, মুঝে সব ইয়াদ হ্যায়।" এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা 'লাউনি' ফরমায়েস করলুম। ওস্তাদজি একবার গলা খেঁয়াড় দিয়ে তারস্বরে গান ধরলেন— "নয়ী আয়ি পুরানীকে দূর করো রে।" 'সঙ্গতী' মৃদঙ্গ

ছেড়ে তবলা ধরলেন, কচি মেয়েটি জেগে উঠল। পাঁচ মিনিটে আসর গরম হয়ে উঠল— আমরা সব গায়ের কাপড় ফেলে দিলুম। ভৃত্যবৃন্দ আমাদের বিনা অনুমতিতে ঘরে ঢুকে সব দেওয়ালের পাশে কাতার দিয়ে দাঁড়ালো। হুকো-বরদার হুঁকোয় ছিলিম বদলাতে এসেছিল এবং এক মনে কল্কেয় ফুঁ দিচ্ছিল, তার কল্কে হাতেই রয়ে গেল, এবং ফুঁয়ের অভাবে সে কল্কের গুল আর ধরলো না। বেটা গান শুনছিল একেবারে হাঁ করে। এর কারণ ওস্তাদজি ঐ লাউনিটি গাচ্ছিলেন অতি ফূর্তি করে।... ("একটি হিন্দি গান", 'বাঁশরী', বর্ষ ১, সংখ্যা ৩২, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩০।)

'সাহিত্যের নয়ী' বলতে 'কল্লোল' (১৯২৩), 'কালি-কলম' (১৯২৬), 'প্রগতি' (১৯২৭) প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশ ও তাদের লেখকদের উত্থানের কথা বলা হয়েছে।

কবি ও ক্রিটিক। 'বিচিত্রা', বর্ষ ৫, খণ্ড ১, সংখ্যা ১, শ্রাবণ ১৩৩৮, পৃ. ৭-১০।

সুবোধ সেনগুপ্ত (২৭.৬.১৯০৩-৩.১২ ১৯৯৮) : ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক, সমালোচক ও শেকসপিয়র বিশেষজ্ঞ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : The Art of Bernard Shaw, Aspects of Shakespearean Comedy, A Study of Rabindranath Tagore, ধ্বন্যালোক ও লোচন (অনুবাদ)।

রাজশেখর : সংস্কৃত আলঙ্কারিক। বিখ্যাত গ্রন্থ : কাব্যমীমাংসা। এ বইয়ের পুরোটা অবশ্য পাওয়া যায়নি।

Goethe, J W von (1749-1832) : জার্মান কবি ও দার্শনিক। বিখ্যাত গ্রন্থ : Faust।

Coleridge, Samuel Taylor (1776-1834) : ব্রিটিশ কবি, সমালোচক ও দার্শনিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Lyrical Ballads (1798) [Wordsworth-এর সঙ্গে যুগ্ম ভাবে], Biographia Literaria (1817)।

Arnold, Matthew (1822-1888) : ইংরেজ কবি ও চিন্তাবিদ্। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ Empedocles on Etna (1852), Merope (1858), New Poems (1867), Essays in Criticism (1855, 1888), Culture and Anarchy (1869), Literature and Dogma (1873)।

Swinburne, A C. (1837-1909) : ব্রিটিশ কবি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ Atalanta in Calydon (1865), Poems and Ballads (1866, 1878, 1889), Songs Before Sunrise (1871)।

Shaw, Bernard (1856-1950) : আইরিশ নাট্যকার ও ফ্যাবিয়ান সমাজবাদী লেখক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Quintessence of Ibsenism (1891), Plays Pleasant and Unpleasant (1898), Man and Superman (1903, 1904)।

Bergson, Henri (1859-1941) : ফরাসি দার্শনিক, সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান

১৯২৮-এ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Time and Free Will (1889), Matter and Memory (1896), Creative Evolution (1907)।

ক্রিটিসিজম। 'পূর্বাশা', বর্ষ ২, সংখ্যা ৯, পৌষ ১৩৪০, পৃ. ৫৭৯-৫৮২।

চিত্রাঙ্গদা : সমালোচনাটি বেরয় 'বিচিত্রা'য় (বর্ষ ১, খণ্ড ২, সংখ্যা ৪, চৈত্র ১৩৩৪, পৃ. ৪৯৪-৫০৬)।

মহাপ্রস্থানের পথে : পুস্তক পরিচয়টি বেরয় 'বিচিত্রা'য় (বর্ষ ৭, খণ্ড ১, সংখ্যা ৩, আশ্বিন ১৩৪০, পৃ. ৪০১-৪০২)।

জয়দেব : "জয়দেব" খণ্ডিত আকারে প্রথমে বেরয় 'ভারতী' পত্রিকায় (বর্ষ ১৪, সংখ্যা ২, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭, পৃ.৯৭-১১২)। তখন সম্পাদক ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। পরে সমগ্র প্রবন্ধটি বেরয় 'সবুজ পত্র'য় (বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩, আষাঢ় ১৩২৭, পৃ. ১৫১-১৮০) এতে তিনি একটি ভূমিকাও যোগ করেন (পৃ. ১৫১-১৫৩)।

Renan, Joseph Earnest (1823-1892) : ফরাসি দার্শনিক ও ধর্মের ইতিহাসকার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Life of Jessus, (1863), Souvenirs d'Enfance (1883)।

খিদিরপুর সারস্বত সম্মেলন। 'অলকা', বর্ষ ২, সংখ্যা ৬, ফাল্গুন ১৩৪৬, পৃ. ৫৩৮-৫৩৯।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭.৪.১৮৩৮-২৪.৫.১৯০৩) : কবি, স্বদেশপ্রেমিক। বিখ্যাত কবিতা 'ভারতসঙ্গীত' 'এডুকেশন গেজেট' (১৮৭২)-এ ছাপা হয়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বৃত্রসংহার কাব্য (১৮৭৫-৭৭, ২ খণ্ড), চিন্তাতরঙ্গিণী, আশাকানন, ছায়াময়ী, দশ-মহাবিদ্যা।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৩.৩.১৮৮৭) : কবি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্মদেবী, নীতিকুসুমাঞ্জলি।

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় : চরণটি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' থেকে উদ্ধৃত।

নবীন ভাবুক : পঙ্‌ক্তিটি 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর 'সূচনা' থেকে নেওয়া। (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, পৃ. ১৯)।

বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা]। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৪ [১৩৫১] পৃ. ১-১৭।

রামগতি ন্যায়রত্ন (৪.৭.১৮৩১-৯.১০.১৮৯৮) : সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, ন্যায়রত্ন উপাধি লাভ করেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ : বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। -গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.)। কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারি, ১৯১০।

ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০) : খ্যাতনামা মঙ্গলকাব্য রচয়িতা। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তিনি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করে 'রায়গুণাকর' উপাধি পান। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : রসমঞ্জরী, সত্যপীরের কথা, নাগাষ্টম ইত্যাদি।

কীর্তিলতা : বিদ্যাপতির পদ সংকলন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩৩১-এ বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ সহ 'কীর্তিলতা' সম্পাদনা করেছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-২৮.১২.১৯৪০) : খ্যাতনামা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। 'ফিনিক্স' (করাচি), 'ট্রিবিউন' (লাহোর), 'প্রদীপ' ও 'প্রভাত' পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দ্বারভাঙা মহারাজের অর্থসাহায্যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস-এর পদাবলি সংকলন ও সম্পাদনা তাঁর অমর কীর্তি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : পর্বতবাসিনী, অমর-সিংহ, লীলা, জীবন ও মৃত্যু।

সারদাচরণ মিত্র (১৭.১২.১৮৪৮-১৯১৭) : প্রসিদ্ধ আইনজীবী, গ্রন্থকার ও বিদ্যানুরাগী। ১৯০৮-এ হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতির পদ ত্যাগ করে বাংলা সাহিত্যের সেবায় মন দেন। বিদ্যাপতির পদাবলির সটীক সংস্করণ প্রকাশ তাঁর অন্যতম কীর্তি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ভারতরত্নমালা।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (আনু. ১৫৪৭-?) : 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' (আনু. ১৫৯৪-১৬০০) লিখে কবিকঙ্কন উপাধি লাভ করেন। এই বইয়ে বাংলার প্রাচীন সমাজ জীবনের অনেক কথা জানা যায়।

বৃন্দাবন দাস (১৫০৭-১৫৮৯) : নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় ও কনিষ্ঠ শিষ্য। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কৃষ্ণকর্ণামৃতটীকা, রসকল্পসারস্তব ও চৈতন্যভাগবত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ (আনু. ১৫৩০-১৬১৫) : আড়াই হাজার শ্লোক-সমন্বিত 'চৈতন্য চরিতামৃত'-এর সংকলক। এ ছাড়া লেখেন কৃষ্ণামৃত (টীকা), গোবিন্দ লীলামৃত।

মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী। সম্পা. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৩৪৬। এতে আছে : বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), হিতোপদেশ (১৮০৪), রাজাবলি (১৮০৮) বেদান্ত চন্দ্রিকা (১৮১৭), প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮১৩), An Apology for the Present Hindu Worship।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ : প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধটি বেরয় 'প্রবাসী'তে। ("তৃতীয় পাণিপথ", 'প্রবাসী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, পৃ. ১৫৭-১৫৯।)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-২৩.১.১৮৫৯) : কবি ও সাংবাদিক। ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় সিদ্ধহস্ত। 'সংবাদ প্রভাকর', 'পাষণ্ডপীড়ন', 'সংবাদ রত্নাবলী' সম্পাদনা করেন। রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত, রামমোহন বসু, হরুঠাকুর, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী-র পাঁচালি গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন।

ছুছুন্দরীবধ কাব্য : লেখক হলেন জগদ্বন্ধু ভদ্র (১৮৪২-১৯০৬) : কবি, নাট্যকার। 'মহাজন-পদাবলী সংগ্রহ' নাম দিয়ে বিদ্যাপতির পদাবলি সংকলন করেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪.৫.১৮৪৯-২৩.৩.১৯১১) : কবি, ঔপন্যাসিক, বাংলা সাহিত্যে 'পাঁচু ঠাকুর' বা 'পঞ্চানন্দ' নামে পরিচিত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কল্পতরু (১৮৭৪, উপন্যাস), ভারত-উদ্ধার (১৮৭৮, ব্যঙ্গকাব্য), ক্ষুদিরাম (১৮৭৮, উপন্যাস)। 'ভারত-উদ্ধার' পাঁচটি সর্গে সম্পূর্ণ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা।

Ivanhoe (1819), Sir Walter Scott (1771-1832)-এর উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ ১৮১৯।

Mill, John Stuart (1806-1873) : ইংরেজ দার্শনিক, রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্, অর্থনীতি-বিদ্। বিখ্যাত দার্শনিক ও ঐতিহাসিক James Mill (1773-1836)-এর পুত্র। উভয়েই ছিলেন Utilitarianism-এর প্রবক্তা।

Seeley, Sir John (1834-1895) : প্রাবন্ধিক ও ঐতিহাসিক, John Stuart Mill-এর শিষ্য। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : The Growth of British Policy, Expansion of England (1883)।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৩.৮.১৮৪৮-৩০.১১.১৯০৯) : ঐতিহাসিক, সিভিলিয়ান ও সাহিত্যিক। ১৮৯৯-এ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-এর প্রথম সভাপতি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : মাধবীকঙ্কণ, বঙ্গবিজেতা, সংসার, সমাজ, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, রাজপুত জীবনসন্ধ্যা, Economic History of British India।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) : 'স্বপ্ন প্রয়াণ' (১৮৭৩) কাব্যের রচয়িতা। 'ভারতী', 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদক ছিলেন। মেঘদূত-এর পদ্যানুবাদ করেন।

রাসেলাস : বইটির পুরো নাম হল : The History of Rasselas, Prince of Abyssinia (1759)। উপন্যাসটির লেখক : Dr Samuel Johnson (1709-1784)।

Wandering Jew : ফরাসি উপন্যাসটির আসল নাম 'Juif Errant' (1844), ইংরেজি অনুবাদে : 'The Wandering Jew'। লেখক Eugene Sue (১৮০৪-৫৭)।

'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' ১৮৮৬-১৯০০। ৫ খণ্ড (সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারি, ১৯১০-১৯১১)। লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত।

গীতায় ঈশ্বরবাদ : প্রথম প্রকাশ ১৩৬৫-তে। লেখক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১.৬.১৮৪২-৯.১.১৯২৩) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ, সিভিলিয়ান, লেখক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : স্ত্রীস্বাধীনতা, ভারতবর্ষীয় ইংরাজ, বৌদ্ধধর্ম্ম (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩০৭)।

রামনারায়ণ তর্করত্ন (২৬.১২.১৮২২-১৮৮৬) : নাট্যকার, বাংলা ভাষায় প্রথম বিধিবদ্ধ ভাবে নাটক লিখে 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে খ্যাত হন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : পতিব্রতোপাখ্যান, কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪), রত্নাবলী, কংসবধ, নবনাটক, উভয় সংকট, চক্ষুদান, যেমন কর্ম তেমনি ফল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪.৫.১৮৪৯-৪.৩.১৯২৫): নাট্যকার, সঙ্গীত-সুরকার, অনুবাদক ও সমাজসেবক। সংস্কৃত, ফরাসি ও মরাঠি ভাষায় দক্ষ। বালগঙ্গাধর তিলকের 'গীতা

রহস্য' বংলায় অনুবাদ করেন। তিনিই প্রথম 'মৃচ্ছকটিক' বাংলায় অনুবাদ করেন। অন্যান্য গ্রন্থ : পুরুবিক্রম, স্বপ্নময়ী, সরোজিনী, এমন কর্ম আর করব না।

অনুবাদের কথা। 'প্রবাসী', বর্ষ ২২, খণ্ড ২, সংখ্যা ৩, পৌষ ১৩২৯, পৃ. ৩৭৩-৩৭৭।

অবদান : অবদান মানে শ্রেষ্ঠ কাজ। বৌদ্ধ সাহিত্যে কথাটির অর্থ : নৈতিক বা ধর্ম সম্বন্ধীয় কীর্তি। এর মূল উপদেশ হচ্ছে : যে যেমন কাজ করবে, সে তেমন ফল পাবে। এ জন্য 'জাতক'-এর অপর নাম 'বোধিসত্ত্বাবদানমালা'।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ (১২৬৭-১১.০৭.১৩৪২) : পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা ও দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। বৃদ্ধ বয়সে পালি ভাষা শিখে একক চেষ্টায় ১৬ বছরে বৌদ্ধ জাতক-এর বাংলা অনুবাদ করেন। দ্র. ঈশানচন্দ্র ঘোষ। 'জাতক। অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্ম সমূহের বৃত্তান্ত'। কলিকাতা : নববিভাকর যন্ত্র, ১৩২৩-১৩৩৭ (১-৬ খণ্ড)।

দিব্যাবদান : হীনযানপন্থী গল্পমালা (আনু. ৫ম খ্রি.), যদিও গল্পগুলি বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বকে নমস্কার করে শুরু হয়েছে। এর কাহিনী অনেকটাই 'অবদানশতক'-এর অনুরূপ। কাহিনীতে কোন মৌলিকতা নেই।

ললিত-বিস্তর : মহাযানপন্থী গল্পমালা (আনু. ১ম খ্রি.), বুদ্ধের আবির্ভাব ও লীলাকাহিনী নিয়ে রচিত।

মহাবস্তু : হীনযানী গ্রন্থের অন্যতম, বুদ্ধদেবের জীবনী নিয়ে রচিত।

সৌন্দরানন্দকাব্য : এই কাব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে মূলত বুদ্ধের জীবনী। এখানে প্রমথ চৌধুরী উল্লেখ করেছেন বিমলাচরণ লাহা অনূদিত 'সৌন্দরানন্দকাব্য' (গুরুদাস চট্টো-পাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ১৩২৯)-র কথা। বইটির সমালোচনা করেছিলেন বিধুশেখর ভট্টাচার্য। দ্র. 'প্রবাসী', বর্ষ ২২, খণ্ড ২, সংখ্যা ১, কার্তিক ১৩২৯, পৃ. ৭৪-৭৭।

Kern. John Hendrik Caspar (1833-1917) : ডাচ ভাষাবিদ্ ও প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্। প্রমথ চৌধুরী কার্ন-এর Manual of Indian Buddhism (Delhi. Motilal Banarsidass, 1898) বইটির কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রকাশ কার মম্মট : 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থের রচয়িতা হলেন মম্মটাচার্য (খ্রি. ১১ শতক)। বইটিতে অলঙ্কার ও কাব্যের দোষগুণ বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

Senart, Emile Charles Marie (1847-1928) : ফরাসি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ও বৌদ্ধধর্ম-বিশারদ। তাঁর অনূদিত তিনটি বিখ্যাত বই Le Mahavastu (1882-1897), Dhammapada (1921), La Bhagavad Gita (1922)।

কচ্চায়ন : কাত্যায়ন-এর পালি রূপ। কাত্যায়ন প্রধানত বার্তিক-কার নামে পরিচিত।

সংস্কৃত সাহিত্যের ক্যাটালগ। 'মাসিক বসুমতী', বর্ষ ২৮, খণ্ড ১, সংখ্যা ১, বৈশাখ ১৩৩৫।

Pope, Alexander (1688-1744) : ইংরেজ কবি, ব্যঙ্গকাব্য লেখায় সিদ্ধহস্ত। উল্লেখযোগ্য

গ্রন্থ : Rape of the Lock (1712,1714), Essay on Criticism (1711), The Essay on Man (1733-34)।

Dryden, John (1631-1700) : ইংরেজ কবি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : All for Love (1678), The Medal (1682), Essay on Dramatic Poesy (1668), The Hind and the Panther (1687)।

প্রমথ চৌধুরী 'আত্মকথা'-য় আর "পাবনার কথা" নামে এক পুস্তক পরিচয়ে তাঁর পাবনার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। "পাবনার কথা" বেরোয় 'আত্মশক্তি' (নব-পর্যায়) বর্ষ ১, সংখ্যা ২৪, ১৪ আশ্বিন ১৩৩৩, পৃ. ৮।

Lamb, Charles (1775-1864) : ইংরেজ প্রাবন্ধিক ও রম্য-লেখক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Tales from Shakespeare (1807)। তাঁর প্রবন্ধে হাস্যরস ও করুণ রসের অদ্ভুত সহাবস্থান দেখা যায়।

Voltaire : আসল নাম Francois-Marie Arouet (1694-1778)। ফরাসি কবি, নাট্যকার, ঐতিহাসিক, চিন্তাবিদ্ ও দার্শনিক। আইনের চোখে সমানাধিকার, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে মত প্রকাশ করে ফরাসি বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেন।

Diderot, Denis (1713-1784) : ফরাসি লেখক ও চিন্তাবিদ্। তৎকালীন সমাজচিন্তা ও ফরাসি বিপ্লবে তাঁর প্রভাব পড়েছিল। ফরাসি দীপায়ন (Enlightenment)-এর পথপ্রদর্শক। Encyclopædia সংকলন করা হল তাঁর জীবনের প্রধান কাজ।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি। 'পরিচয়', বর্ষ ৬, খণ্ড ২, সংখ্যা ২, ফাল্গুন ১৩৪৩, পৃ. ১৯৪-১৯৬।

বটকৃষ্ণ ঘোষের "মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি" প্রবন্ধটি বেরোয় 'পরিচয়' (বর্ষ ৬, খণ্ড ১, সংখ্যা ৪, কার্তিক, শারদীয় ১৩৪৩, পৃ. ৩০৯-৩২৪)-এ।

পতঞ্জলি : পাণিনি-র ব্যাকরণ ('অষ্টাধ্যায়ী')-এর ব্যাখ্যাকার। তাঁর গ্রন্থটির নাম : 'ব্যাকরণ মহাভাষ্য'। এটি সংস্কৃত ভাষার এক অমূল্য সম্পদ। এই মহাভাষ্যের উদ্দেশ্য ছিল বার্তিক-কার কাত্যায়ন-এর মত খণ্ডন করা।

ভরত : 'নাট্যশাস্ত্র'-এর রচয়িতা, আনু. খ্রি. ১ম শতক।

যোগীমারা : সুরগুজা স্টেটের (এখনকার মধ্যপ্রদেশ) রামগড় পাহাড়ে যোগীমারা গুহার ছাদে (১০' X ৬') আদি মানুষদের অঙ্কিত ছবি আছে। খ্রি.পূ. ৩০০ অব্দে অঙ্কিত বলে অনুমান। রামগড় পাহাড়ে আসলে দুটি গুহা আছে— যোগীমারা ও সীতা-বেঙ্গরা। এই গুহায় যাওয়ার সুড়ঙ্গপথের দক্ষিণে বাটালি দিয়ে কাটা এক প্রস্তর-ফলক দেখা যায়। ড. ব্লখ ও অন্যান্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মতে এই গুহা-দুটি ভারতের প্রাচীন নাট্যশালার নিদর্শন এবং গ্রিক প্রধান নাট্যমন্দিরের অনুকরণে তৈরি। এ নিয়ে

অবশ্য বিতর্ক আছে। (দ্র. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, "রামগড়ের নাট্যশালা", 'ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা'। কলকাতা : ভারতী লাইব্রেরি, ১৩৭২, পৃ.৬৮৩-৬৯১।)

Keith, A. Berriedale · প্রাচীন ভারততত্ত্ববিদ্‌, সংস্কৃত নাটক নিয়ে গবেষণা করেন। Keith-এর যে-বইটির কথা প্রমথ চৌধুরী এখানে উল্লেখ করেছেন তা হল : The Sanskrit Drama in its Origin, Development, Theory and Practice Oxford: Clarendon Press, (1924)।

ভাসের তারিখ : ভাসের তারিখ নিয়ে ১৯১৩-য় 'Modern Review' পত্রিকায় প্রমথ চৌধুরী একটি প্রবন্ধ লেখেন। দ্র. Pramatha Chowdhury, "The Date of Bahasa", 'Mordern Review', October 1913, XIV, pp. 382-387

হিন্দু ধর্ম যে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের পরিবর্তিত রূপ, এ কথা প্রমথ চৌধুরী তাঁর "কৌল-জ্ঞাননির্ণয়" ('বঙ্গশ্রী', বর্ষ ২, সংখ্যা ২, ভাদ্র ১৩৪১)-এ উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি বলেন, "আজকের দিনে বাঙলাদেশে যাকে আমরা হিন্দুধর্ম বলি, তা মহা-যান বৌদ্ধধর্মেরই রূপান্তর মাত্র। আর যে মনোভাব থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম উদ্ভূত হয়েছে, সে মনোভাব এদেশের লোকের পক্ষে সনাতন। অন্তত আমার ধারণা এইরূপ।"

বৈশ্য সভ্যতা। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বর্ষ ২, সংখ্যা ২, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০, পৃ. ১৬৪-১৬৮।

মনোমোহন বসু (১৪.৭.১৮৩১-৪.২ ১৯১২) : কবি, সাংবাদিক ও নাট্যকার। 'সংবাদ বিভাকর' (১৮৫২) ও 'মধ্যস্থ' (১৮৭২) সম্পাদনা করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : দুলীন (রণজিৎ সিংহের জীবনী অবলম্বনে), পদ্যমালা। "দিনের দিন হবে দীন/ ভারত হয়ে পরাধীন"— এই সংগীতটি তাঁর পদ্যমালা থেকে উদ্ধৃত।

Hauptmann, Gerhart (1862-1946) : জার্মান নাট্যকার, ঔপন্যাসিক। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার, ১৯১২। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Die Weber (1892) [The Weavers], Der Biberpelz (1893), Atlantis (1912), Till Eulenspiege (1927)।

৩. টেকচাঁদ ঠাকুর : আসল নাম প্যারীচাঁদ মিত্র (২২.৭.১৮১৪-২৩.১১.১৮৮৩)। 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) লিখে বিখ্যাত হন। অন্যান্য গ্রন্থ : কৃষি পাঠ (১৮৬১), যৎ কিঞ্চিৎ (১৮৬৫), মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯), অভেদী (১৮৭১), বামাতোষিণী (১৮৮১)।

৪. কিশোরীচাঁদ মিত্র (২২.৫.১৮২২ - ৬.৮.১৮৭৩): প্যারীচাঁদের ভাই, ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম সদস্য, সাংবাদিক, 'সুহৃদ্‌ সভা'র প্রতিষ্ঠাতা। 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' সম্পাদনা করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Hindoo College, The Mutiny, The Government on the People।

"দেশে বিদেশে বিতরিছ অন্ন" : চরণটি নেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী, মা..." গানটি থেকে।

'কুটির শিল্প' : রাজশেখর বসুর এই বইটি বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-এর অন্তর্গত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে ১৩৫০-এ প্রকাশিত হয়।

Priestley, John Boynton (1894-1984) : ইংরেজ ঔপন্যাসিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : The Good Companions (1929) Angel Pavement '(1930), Dangerous Corner (1932)।

মৃচ্ছকটিক কার রচনা। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বর্ষ ২, সংখ্যা ৩, মাঘ-চৈত্র ১৩৫০, পৃ. ২৬২-২৬৭।

কালিদাসের শ্লোকটি হল :

মা তাবৎ, প্রথিতযশসাং ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদিনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য
বর্ত্তমানকরেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কথং বহুমানঃ? ('মালবিকাগ্নিমিত্রম', শ্লোক ৫।)

Pramatha Chowdhury, "The Date of Bahasa", 'Mordern Review', October 1913, XIV, pp 382-387. এ ছাড়া দ্র. "মৃচ্ছকটিক" 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৪, "মৃচ্ছকটিক কার রচনা", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' (মাঘ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০)।

জেকবি : প্রখ্যাত জার্মান প্রাচ্যবিদ্। অলঙ্কারশাস্ত্র ও জৈন ধর্মশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ। এঁর বিখ্যাত গ্রন্থ : Das Ramayana.

অভিনবগুপ্ত : আলঙ্কারিক, আনন্দবর্ধনের ওপর 'লোচন' নামে একটি টীকা লেখেন। এ ছাড়া তাঁর অন্য দুটি টীকা হল 'নাট্যলোচন' ও 'অভিনবভারতী'।

Pater, Walter (1839-1894) : ইংরেজ সমালোচক এবং কলাকৈবল্যবাদ (Art for Art's sake)-এর প্রবর্তক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Studies in the History of the Renaissance (1873), Imaginary Portraits. A New Collection (1887), Appreciations (1889)।

সুশীলকুমার দে (২৯.১.১৮৯০-৩১.১.১৯৬৮) : ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ও গবেষক। মহাভারত-এর প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Studies in the History of Sanskrit Poetics (2 parts), History of Sanskrit Literature, Bengali Literature in the Nineteenth Century।

কথানক : জৈন ধর্মশাস্ত্রের উপদেশমূলক গল্প বা কথা সাহিত্য। সংস্কৃত ও প্রাকৃত দুই ভাষাতেই লেখা।

মৃচ্ছকটিক। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বর্ষ ৫, সংখ্যা ৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৪, পৃ. ২০০-২০২।

১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩১১-এ মৃচ্ছকটিক বাংলায় অনুবাদ করেন। দ্র. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি'। প্রশান্তকুমার পাল সম্পা.। সুবর্ণ-রেখা, ২০০২, পৃ. ৭৩।

২. বাণপতি শাস্ত্রী : সম্ভবত নামটি ভুল। এটি হবে গণপতি শাস্ত্রী। ইনি ভাসের নাটক চক্রের আবিষ্কারক।

রামমোহন রায় ও বাঙ্গলা গদ্য। 'দেশ', বর্ষ ১, সংখ্যা ৭, ২২ পৌষ ১৩৪০, পৃ. ৩৩।

রামমোহন রায় (১৭৭২-১৭.৯.১৮৩৩) : বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত। হিন্দু, ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মে গভীর জ্ঞান ছিল। নিরাকার ব্রহ্মোপাসক ও একেশ্বরবাদী। 'বেদান্তসূত্র' ও 'উপনিষদ' গদ্যে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। ১৮১৫ খ্রি. 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন, যা ১৮২৭ সালে 'ব্রাহ্মসমাজ'-এ রূপান্তরিত হয়। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য ১৮২৯ সালে সতীদাহ নিষিদ্ধকারী আইন প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। দিল্লির বাদশাহ্ তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে ইংল্যান্ডে পাঠান। সেখানে ব্রিস্টল শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (আনু. ১৭৬২-১৮১৯) : ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নবাগত ইংরেজদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতেন। রচিত গ্রন্থ : রাজাবলী (১৮০৮) ও প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮১৩)। এ ছাড়া 'পুরুষ পরীক্ষা' ও 'বত্রিশ সিংহাসন' বাংলায় অনুবাদ করেন। বইগুলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য হয়েছিল।

উর্দু বনাম বাঙ্গলা। 'বুলবুল', বর্ষ ১, সংখ্যা ৩, পৌষ-চৈত্র ১৩৪০; 'নির্বাচিত বুলবুল' (১৪১২), পৃ. ১৪৫।

প্রমথ চৌধুরী এ লেখায় মুহম্মদ হবীবুল্লাহ ও বেগম সামসুন নাহার-এর সম্পাদিত 'বুলবুল' পত্রিকায় প্রকাশিত "উর্দু বাংলা তর্ক ও বাঙ্গালী মুসলমান" (ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, বর্ষ ১, সংখ্যা ২, ১৩৪০) প্রবন্ধটির কথা বলতে চেয়েছেন। প্রবন্ধটির লেখক : আনোয়ার-উল-কাদীর (দ্র. 'নির্বাচিত বুলবুল', বুলবুল পাবলিশিং হাউস (ঢাকা) এবং বিশ্বকোষ পরিষদ, ১৪১২, পৃ. ৯৪-৯৮)।

উর্দু ভাষাটি উত্তর ভারতে জবান-এ-উর্দু-এ-মুয়াল্লা (আদালতের বা শিবিরের ভাষা) নামে পরিচিতি লাভ করে।

অনেকের ধারণা হিন্দি ও উর্দু আসলে একটি ভাষা, যদিও পৃথক লিপিতে লেখা। ("Hindi and Urdu are the same language written in two different scripts.")।

বাঙ্গলা ভাষায় আরবি ফারসি শব্দ। 'নির্বাচিত বুলবুল' (১৪১২), পৃ. ৫৬৬।

নবপর্যায় বুলবুল : 'বুলবুল' প্রথম বেরয় ১৩৪০-এ। তখন এটি ছিল চতুর্মাসিক পত্রিকা,

দ্বিতীয় বর্ষে (১৩৪১) 'বুলবুল' হয় ত্রৈমাসিক। ১৩৪১-এর 'বুলবুল'-এর কথাই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন।

প্রমথ চৌধুরী 'বুলবুল' সম্পাদককে একটি চিঠি লেখেন। তাতে উল্লেখ করেন, "বুলবুলের জন্য কিছু লিখতে আমার সঙ্কোচ হয়। কারণ আমার প্রবন্ধ মাত্রেরই, উদ্দেশ্য না হোক, ফল হচ্ছে emancipation of intellect কিন্তু আমার সাহিত্যিক জীবনের অভিজ্ঞতা এই যে মানুষ সহজে emancipated হতে চায় না।... আমার ইচ্ছে আপনার কাগজে 'উর্দু বানাম বাঙলা'র যে আলোচনা শুরু হয়েছে সেই সম্পর্কে দু কথা লিখি। উর্দু অবশ্য জানিনে. কিন্তু বাঙলা আমি জানি। সুতরাং ও তর্কে যোগ দেবার আমার... অধিকার আছে।" দ্র. 'বুলবুল', বর্ষ ১, সংখ্যা ৩, পৌষ-চৈত্র ১৩৪০; 'নির্বাচিত বুলবুল', পৃ. ২১৩।

বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ নিয়ে প্রমথ চৌধুরী-র "আমাদের ভাষাসংকট" নামে একটি প্রবন্ধ আছে। দ্র. 'প্রবন্ধসংগ্রহ', বিশ্বভারতী সং., পৃ. ২৭৮-২৮২।

বীরবলের কথাটি আসলে ছিল : "মধ্যে থেকে আমাদের মা-সরস্বতী, কাশী কি মক্কা যাই, এই ভেবে আকুল হতেন। এক-একবার মনে হয় ও উভয়সংকট ছিল ভালো, কারণ একেবার পণ্ডিতমণ্ডলীর হাতে পড়ে মার আশু কাশীপ্রপ্তি হবারই অধিক সম্ভাবনা।" ("কথার কথা", 'প্রবন্ধসংগ্রহ', পৃ. ২৫৬)।

সংক্ষিপ্ত বাঙলা ব্যাকরণ। 'অলকা', বর্ষ ২, সংখ্যা ৩, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬, পৃ. ২৮০-২৮৪।

আশুতোষ চৌধুরী (১২.৬.১৮৬০-২৪.৫.১৯২৪) : প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ও কংগ্রেস নেতা, প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজ। বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডারস অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলিকে সাজিয়েছিলেন।

মদনমোহন মালবিয়া (১৮.১২.১৮৬২-১৯৪৬) : রাজনীতিবিদ্, 'হিন্দুস্থানী' নামক দৈনিক পত্রের সম্পাদক। 'হিন্দু-সমাজ' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯০৯-এ লাহোর কংগ্রেসেব সভাপতি হন। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। হিন্দু মহাসভা-র কর্মী, হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন।

বালগঙ্গাধর তিলক (২৩.৭.১৮৫৬-৩১.৭.১৯২০) : আইনের অধ্যাপক, পরে অধ্যাপনা ত্যাগ করে বৈদিক সাহিত্য অনুশীলন করেন। রাজনীতিবিদ্, চরমপন্থী কংগ্রেস নেতা। 'মারাঠা' ও 'কেশরী' নামে দুটি সংবাদপত্র বার করেন। তাঁর উদ্যোগে 'দাক্ষিণাত্য শিক্ষাসমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়, এই সমিতির চেষ্টায় বিখ্যাত Ferguson College স্থাপিত হয়। শিবাজির স্মৃতিরক্ষার জন্য 'শিবাজী উৎসব'-এর আয়োজন করেন। বিখ্যাত গ্রন্থ : The Arctic Home in the Vedas, 'গীতা রহস্য' (মান্দাল জেলে লেখা)।

হালহেডের ব্যাকরণ : বইটির পুরো নাম 'A Grammar of the Bengalee Language' (1778)।

গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ : রামমোহন রায়-এর 'গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ' প্রকাশিত হয় ১৮৩৩।

ফ্রান্সের নব মনোভাব। বিচিত্রা, বর্ষ ৩, খণ্ড ১, সংখ্যা ৪, আশ্বিন ১৩৩৬, পৃ. ৫৭৩-৫৮০।

'New Era' : মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত মাসিক ইংরেজি পত্রিকা। এতে প্রমথ চৌধুরীর 'Future of Civilisation' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও প্রবন্ধটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। কেউ সন্ধান দিলে বাধিত হব।

'La Renaissanee Religieuse' (Paris: Felix Alcan, [1929]) : বইটির ভূমিকা ও উপসংহার লেখেন Georges Guy-grand।

সর্বদর্শন সংগ্রহ : বইটির রচয়িতা সায়ন মাধবাচার্য। এটি চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

Taine, Hippolyte (1828-1893) : ফরাসি ইতিহাসবিদ্‌ এবং সমালোচক। সোসিও-লজিক্যাল পজিটিভিজম-এর সমর্থক।

Berthelot, Marcelin (1827-1907) : ফরাসি রসায়নবিদ্‌, দার্শনিক। পরে বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন।

Boutroux, Etienne Emile (1845-1921) : ফরাসি দার্শনিক। মূলত বিজ্ঞান ও ধর্মের দর্শন নিয়ে চর্চা করেন। বিজ্ঞানে বস্তুবাদের বিরোধী। Bergson-এর আবির্ভাবের ফলে তাঁর প্রভাব খানিক কমে যায়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : The Philosophy of Ficte (1902), Science and Religion in Contemporary Philosophy (1908)।

Poincare, Jules Henri (1854-1912) : ফরাসি গণিতবিদ্‌, বিজ্ঞানের দার্শনিক। বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Foundations of Science (1902), The Value of Science (1905), Science and Method (1908)।

Duhem, Pierre-Marie (1861-1916) : ফরাসি পদার্থবিদ্‌ ও গণিতবিদ্‌। বিজ্ঞানের দর্শন চর্চা করেছিলেন। Poincare-এর মতের সমর্থক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Le Systeme du Monde (1913 1959, 10 vols.)।

Milhand, G : ফরাসি গণিতবিদ্‌।

Le Roy, Edouard (1870-1954) : ফরাসি দার্শনিক ও গণিতবিদ্‌। Poincare ও Duhem-এর সমর্থক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : La Pensee Intuitive (1929), Essai D'Une Philosophie Premiere (1956)।

'Creative Evolution' : Bergson এ বই লেখেন ১৯০৭-এ।

'Scienc et Hypothesis' : Poincare-এর এ বই প্রকাশিত হয় ১৯০৫-এ।

Einstein, Albert (1879-1955) : জার্মান পদার্থবিদ্ ও আপেক্ষিকতাবাদের প্রবক্তা।

মেধাতিথি : 'মনুসংহিতা'র টীকাকার।

Chevalier, Jacques (1882-1952) : ফরাসি দার্শনিক।

Aquinas, St Thomas (ca 1225-1274) : রোমান ক্যাথলিক চার্চের যাজক, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ্।

Descartes, Rene (1596-1650) : ফরাসি চিন্তাবিদ্ ও গণিতবিদ্। অঙ্ক ও বিজ্ঞানের দর্শনে উৎসাহী।

Pascal, Blaise (1623-1662) : ফরাসি গণিতবিদ্ ও পদার্থবিজ্ঞানী। সম্ভাবনা তত্ত্বের আবিষ্কারক। দেকার্ত-এর সমর্থক।

Meyerson, Emile (1859- ?) : ফরাসি দার্শনিক ও রসায়নবিদ্।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি... পরিদেবনা। বঙ্গার্থ : হে ভারত, জীবগণের শরীর উৎপত্তির পূর্বে অপ্রকাশিত, স্থিতিকালে মাত্র প্রকাশিত এবং বিনাশের পরেও অপ্রকাশিত থাকে। তাতে শোকের কি আছে? (গী. শ্লোক ২৮, অধ্যায় ২)।

"Where ignorance is bliss, it is folly to be wise" : লেখক ইংরেজ কবি Thomas Gray (1716-1771)।

Proust, Marcel (1871-1922) : ফরাসি ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, সমালোচক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : A la Recherche du Temps Perdu [Remembrance of Things Past (1927)]।

Whitehead, Alfred North (1851-1947) : ইংরেজ দার্শনিক ও গণিতবিদ্। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Process and Reality (1929), Adventures of Ideas (1933)।

Haldane, J. B. S (1892-1964) : ব্রিটিশ জীবনবিজ্ঞানী, মার্কসবাদের সমর্থক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Marxist Philosophy and the Sciences (1939), Science and Everyday Life (1940), New Paths in Genetics (1941), Adventures of a Biologist (1947)।

নিয়তিবাদের নব্য প্রতিবাদ। 'বিচিত্রা', বর্ষ ৯, খণ্ড ১, সংখ্যা ১, শ্রাবণ ১৩৪২, পৃ. ৫-৭। বীরবল ছদ্মনামে প্রকাশিত।

Newton, Sir Isaac (1642-1727) : ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ : Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1686-87, 3 vols)। বইটি লেখার জন্য তিনি N. Halley-র সাহায্য নেন।

Eddington, Arthur Stanley (1882-1944) . ব্রিটিশ পদার্থবিদ্ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের ব্যাখ্যাকারী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : New Pathways in Science (1935), Expanding Universe (1933).

নাসতো বিদ্যতে... দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। (গীতা, শ্লোক ১৬, অধ্যায় ২) বঙ্গার্থ : প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গোচর হলেও, শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদির উৎপত্তি ও বিনাশ আছে বলে অসৎ। এদের পারমার্থিক অস্তিত্ব (তাত্ত্বিকতা) নেই। কিন্তু আত্মার পারমার্থিক সত্তা অজ্ঞদের অবিজ্ঞাত (অজানা) হলেও আত্মা কখনও অনস্তিত্ব হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ সৎ ও অসৎ উভয়ের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন।

নাগার্জুন : শূন্যবাদের প্রবক্তা, 'মাধ্যমিককারিকা'-র লেখক। 'যুক্তিষষ্টিকা' ও 'শূন্যতাসপ্ততি' তাঁর আরও দুটি গ্রন্থ।

অসঙ্গ : বিজ্ঞানবাদী, মৈত্রেয়নাথের শিষ্য। তাঁর মতে বিজ্ঞান (ভাব) ছাড়া কোন বস্তুর সত্তা নেই, যোগ অভ্যাসের দ্বারা বোধি লাভ করা যায়। এই মতের অপর নাম যোগাচার।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪) : পদার্থবিজ্ঞানী। আইনস্টাইনের সঙ্গে যুগ্ম ভাবে কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর 'বোস-আইনস্টাইন সূত্র' আবিষ্কার করেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। যৌবনে 'সবুজ পত্র'র মজলিশের নিয়মিত সদস্য ছিলেন, যদিও ঐ পত্রিকায় কোন দিন লেখেননি।

কার্য্যকারণ... ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। (গীতা, ১৩ অধ্যায়, ২১ শ্লোক)। বঙ্গার্থ : প্রকৃতি কার্য এবং কারণের উৎপত্তির কারণ এবং পুরুষ (জীব) সুখ ও দুঃখের উপলব্ধি কারণ বলে কথিত হয়।

Samuel, Sir Herbert (1870-1963) : ব্রিটিশ রাজনীতিক ও কূটনীতিবিদ্। পালেস্তাইনের হাইকমিশনার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইহুদি সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

Jeans, James Hopwood (1877-1946) : ইংরেজ পদার্থবিদ্ ও দার্শনিক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : The Universe Arround Us (1929), The Mysterious Universe (1930)।

মার্কস-এর ডায়ালেক্‌টিক। 'পরিচয়', বর্ষ ৬, খণ্ড ১, সংখ্যা ১, শ্রাবণ ১৩৪৩, পৃ. ৪৬-৫২।

'Moscow Dialogues' : বইটি Julius F. Hecker (London· Chapman & Hall, 1933)-এর লেখা।

বিপিনচন্দ্র পাল-এর "নূতনে ও পুরাতনে" ('নারায়ণ', অগ্রহায়ণ ১৩২১) প্রবন্ধটির প্রতিবাদ সূত্রে প্রমথ চৌধুরী তাঁর "নূতন ও পুরাতন" প্রবন্ধটি লেখেন। এখানেই তিনি Hegel নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলেন। দ্র. 'নানাকথা', পৃ. ১৭৮-১৯৭। তাঁর উদ্ধৃতির মধ্যে ভুল আছে। এখানে সেটি আবার উদ্ধৃত হল : "তিনি ইউরোপীয় দর্শন হতে এমন এক সত্য উদ্ধার করেছেন, যার সাহায্যে সকল বিরোধের সমন্বয় হয়। হেগেলের Thesis, Antithesis এবং Synthesis, এই ত্রিপদের ভিতর যখন

ত্রিলোক ধরা পড়ে, তখন তার অন্তর্ভূত সকল লোক যে ধরা পড়বে তার আর আশ্চর্য কি? হেগেলের মতে লজিকের নিয়ম এই যে, 'ভাব' (Being) এবং 'অভাব' (Non-Being) এই দু'টি পরস্পর-বিরোধী,— এবং এই দুয়ের সমন্বয়ে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে 'স্বভাব' (Becoming)। মানুষের মনের সকল ক্রিয়া এই নিয়মের অধীন, সুতরাং সৃষ্টি-প্রকরণও এই একই নিয়মের অধীন, কেননা এ জগৎ চৈতন্যের লীলা।"

অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-এর প্রবন্ধটির নাম "হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব" ('নারায়ণ', অগ্রহায়ণ ১৩২১)।

'Freedom and Organisation' : 1814-1914 (London : Allen & Unwin, 1934)।

মার্কস-এর ডায়ালেক্‌টিক : **কৈফিয়ত**। 'পরিচয়' [শারদীয় সংখ্যা], বর্ষ ৬, খণ্ড ১, সংখ্যা ৪, কার্তিক ১৩৪৩ পৃ. ৪১৭-৪২১।

দ্র. "মার্কস-এর ডায়ালেক্‌টিক", 'পরিচয়', বর্ষ ৬, খণ্ড ১, সংখ্যা ১, শ্রাবণ ১৩৪৩, পৃ. ৪৬-৫২।

Croce হেগেল সম্পর্কে যে-বইটি লিখেছিলেন ইংরেজি অনুবাদে তার নাম হচ্ছে : 'What is Living and What is Dead of Philosophy of Hegel' (tr. D Ainslie, etc. London, 1915)।

বৃদ্ধ বয়সে Croce লেখেন 'History of Europe in the Nineteenth Century'। এর ইংরেজি অনুবাদ করেন Henry First (London, 1934)।

Croce, Benedetto (1866-1952) : ইতালীয় দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ্, ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক। 'La Critica' (1903-1945) 'নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। হেগেল ও মার্কস-এর সমর্থক ছিলেন।

Russell, Bertrand Arthur William (1872-1970) : ব্রিটিশ গণিতবিদ্ ও দার্শনিক। ১৯৫০-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Introduction to Mathematical Philosophy (1919), Marriage and Morals (1929), History of Western Philosophy (1946), New Hope for a Changing World (1961), The Future of Science (1959) ইত্যাদি। তিনি Bolshevism ও Marxism নিয়েও চর্চা করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : The Practice and Theory of Bolshevism (London, 1962, 3rd ed.) আর Freedom and Organisation 1814-1914 (London, 1934)।

From Hegel to Marx, 'পরিচয়', বর্ষ ৬, খণ্ড ২, সংখ্যা ২, ফাল্গুন ১৩৪৩, পৃ. ১৯৬-১৯৮।

Sidney Hook-এর লেখা বইটির পুরো নাম হল 'From Hegel to Marx Studies in the Intelectual Development of Karl Marx' (London: Victor Gollancz, 1946)।

এই পুস্তক পরিচয়টি বেরোয় 'পরিচয়', বর্ষ ৬, খণ্ড ২, সংখ্যা ৩, পৌষ ১৩৪৩, পৃ. ৬২১-৬২৬। আলোচক : সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

Hook সাহেবের আগের বইটি বলতে প্রমথ চৌধুরী ১৯৩৩-এ লেখা তাঁর একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন : 'Towards the Understanding of Karl Marx: a Revolutionary Interpretation' (London : 1933)। হালে আমেরিকা থেকে বইটির এক পরিবর্ধিত সংস্করণ বেরিয়েছে (New York: Prometheus Books, 2002)।

Strauss, D. Friedrich (1804-1874) · Leben Jesus-এর জার্মান থেকে ইংরেজিতে অনূদিত হয় ১৮৪৬-এ। দ্র. 'The Life of Jussus, Critically Examined; from the 4th German ed. London Chapman Brothers, 1846। তিনি রাশিয়া সম্পর্কেও একটি বই লেখেন : 'Soviet Russia Anatomy of a Social History' (London John Lane, 1942)